ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ
আল-গাযালি (র)-এর অমর রচনা

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন

১২

খ্যাতি ও আত্মপ্রবঞ্চনা

ভাষান্তর

মাওলানা ইয়াসীন বিন ইউসুফ

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

খ্যাতি ও আত্মপ্রবঞ্চনা

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১২

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ
ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮ - ১১১১ খ্রি.)

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর

ভাষান্তর
মাওলানা ইয়াসীন বিন ইউসুফ
সাবেক উস্তায, মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম,
শ্যামলী, ঢাকা

দারুত তাকবীর

খ্যাতি ও আত্মপ্রবঞ্চনা

ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১২

ISBN No : 978-984-558-027-4

প্রকাশক
প্রকৌ. মেহেদী হাসান
দারুত তাকবীর
৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা)
ভি আই পি রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

রচনা
ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে
মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮-১১১১ খ্রি.)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ডক্টর এম. শরীফ উল আলম

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
জিলহজ ১৪৪১ হিজরি
শ্রাবণ ১৪২৭ বাংলা

ভাষান্তর
মাওলানা ইয়াসীন বিন ইউসুফ
সাবেক উস্তায, মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম,
শ্যামলী, ঢাকা

প্রচ্ছদ ডিজাইন
দারুত তাকবীর ডিজাইন সেকশন

স্বত্ব : সংরক্ষিত

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ২৯২.০০ (দুইশত বিরানব্বই টাকা মাত্র)

সতর্কীকরণ

প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের যেকোনো অংশ
পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো সম্পূর্ণ বেআইনি

KHETI O ATTOPROBONCHONA. (Ihyau Ulumiddeen Series, V. : 12), Written by Emam Gazali (R), Translated by Mawlana Easin Bin Yusuf, Published by Eng. Mehedi Hasan. Darut Takbeer, Corporate Office : 30/A Sattara center (14th Floor), V.I.P Road, Naya Paltan, Dhaka-1000, Phone : +8809610666006, 01938-855992, 01938-855979, 01991-181204, E-mail : info@daruttakbeer.com, Website : www.daruttakbeer.com, Publishing Date : August 2020, **Price : 292.00** Taka Only.

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য; যিনি মানুষকে সর্বোত্তম রূপ এবং সৃষ্টির সেরা মর্যাদা দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। মানবজাতির মাঝে যিনি আগমন করেছিলেন চিরমুক্তি ও সফলতার বার্তা নিয়ে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর তাঁর আনীত সুমহান দীনকে সমুন্নত রাখতে প্রতি হিজরি শতকেই আল্লাহ তাআলা কিছু ক্ষণজন্মা মনীষী ও সংস্কারক প্রেরণ করেন।

হিজরি পঞ্চম শতকে আবির্ভূত এমনই একজন ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ও ক্ষণজন্মা মনীষী হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)। (জন্ম : ৪৫০ হি; মৃত্যু : ৫০৫ হি।) দার্শনিক হিসেবে তিনি শুধু যুগশ্রেষ্ঠ নয়; বরং জগৎশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভূষিত হন। মুসলিম উম্মার প্রতি তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর কলমের ছোঁয়ায় মুহাম্মদি দীন ও শরিয়ত শুধু নবজীবনই লাভ করেনি, পৃথিবীর তাবৎ মনীষী, জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণকে এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেছে। অসংখ্য মানুষকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করেছে। বিশ্বাসীদের মাঝে আস্থার দ্যুতি ছড়িয়েছে।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' তাঁর একটি অমর গ্রন্থ। বহু শতাব্দী ধরে এটি মুসলিম উম্মার মাঝে প্রাণস্পন্দন এবং প্রেরণার স্ফুরণ ঘটিয়ে আসছে।

মূল আরবি গ্রন্থটি চার খণ্ডে রচিত। কিন্তু পাঠকের ক্রয়ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় অংশটি সংগ্রহ ও বহনের সুবিধার্থে আমরা বইটি সিরিজ আকারে অনুবাদ প্রকাশ করছি।

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজের দ্বাদশতম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন প্রতিভাদীপ্ত তরুণ আলেম মাওলানা ইয়াসীন বিন ইউসুফ। চলমান সিরিজের এই দ্বাদশতম খণ্ডটি বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে তুলে দিতে পেরে দারুত তাকবীর আনন্দিত ও গর্বিত। যদিও বাজারে এর একাধিক অনুবাদ রয়েছে, নতুন করে আমরা আবার কেন অনুবাদ করলাম, তা মনোযোগী পাঠক পড়েই বুঝবেন।

এর যা কিছু ভালো, সবই মহান আল্লাহর। যা কিছু ভুল তা আমাদের অক্ষমতা। আমরা আমাদের ভুলগুলো উত্তরোত্তর সংশোধন ও পরিমার্জনে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে সুহৃদ পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের দুআ-পরামর্শ এবং সার্বিক সহযোগিতা কাম্য।

গ্রন্থটি পড়ে কোনো পাঠক যদি নিজের প্রয়োজনীয় আত্মসংশোধনে ব্রতী হয় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বিধাহীনচিত্তে মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, তাহলেই আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের এই শ্রমটুকু কবুল করে নিন এবং গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন!

প্রকাশক

০১.০৮.২০২০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا هُدَاةً لِّلنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার, যিনি সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং দীন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফিক দিয়েছেন। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রিয়নবী রাসূলে আরাবি (স) এবং তাঁর সাহাবিগণের ওপর।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

অর্থ : আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির : ২৮)

হিজরি ষষ্ঠ শতক ছিল জ্ঞানবিজ্ঞানে আর দর্শনে মুসলমানদের উৎকর্ষ সাধনের যুগ। এ ধরায় যখন মুসলমানরা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, গ্রিক দর্শন তখন ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করছিল। যার অশুভ প্রভাবে দীন ইসলামের সঠিক মর্ম থেকে মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছিল। একদিকে পার্থিব জ্ঞানে তারা যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছিল অপরদিকে ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাবে তারা তলিয়ে যাচ্ছিল ভ্রান্তির অতলগহ্বরে। ফলে মুসলমানদের মাঝে অসংখ্য ভ্রান্ত উপদল ছড়িয়ে পড়েছিল। শাসক গোষ্ঠী থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণ সবাই কোনো না কোনোভাবে ভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। উম্মাহর এহেন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা দয়া করে আবির্ভাব ঘটালেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা উম্মাহর সূর্যসন্তান ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আততুসী আল গাযালি (র)-এর।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি (র)-এর ফিকহ, উসূলে ফিকহ, তাসাউফ, দর্শন ও ইসলামি নীতিশাস্ত্র বিষয়ে রয়েছে অসংখ্য কালজয়ী গ্রন্থ। বক্ষ্যমাণ 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটি তাঁরই রচিত এক অনবদ্য গ্রন্থ।

এতে শরিয়তের মৌলিক বিধিবিধানের সারনির্যাস আলোচনা করার পাশাপাশি খ্যাতি, নফসের ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা ইত্যাদি বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণধর্মী বাস্তবভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরেছেন।

ইমাম গাযালির সময়কাল থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীবাসী বিশেষত মুসলিম সমাজ তাঁর চিন্তা, দর্শন ও গ্রন্থাবলি দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' তাঁর লেখা সর্বাধিক প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে আলী ইবনে আবু বকর সাক্কাফ (র) বলেন, 'কোনো অমুসলিম যদি ইহয়াউ উলূমিদ্দীনের পাতা ওল্টায়, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কারণ, এতে এমন এমন সূক্ষ্ম রহস্য আছে যা অন্তরকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।' এ কথার সত্যতা আজ অবধি মুসলিম জাতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে আসছে।

গ্রন্থটির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই দারুত তাকবীর সিরিজ আকারে এর একটি পূর্ণাঙ্গ বিশুদ্ধ অনুবাদ সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে; যাতে বাংলাভাষাভাষী পাঠকগণ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারেন এবং সহজেই তা সংগ্রহ করতে পারেন।

এ অভিপ্রায়ে তারা গ্রন্থটির কিছু অংশ অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য আমাকে নির্বাচন করে। আমি তাদের এ মহান উদ্যোগের অংশ হতে পেরে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সিরিজের এ অংশে খ্যাতি, নফসের ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা বিষয়ক আলোচনার অনুবাদ করা হয়েছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে।

- মূল গ্রন্থটি আরবি বিধায় সরাসরি আরবি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।
- কুরআনের আয়াত নং ও সূরার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
- হাদিসের মতনগ্রন্থের নাম ও হাদিস নং উল্লেখ করা হয়েছে।
- নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে প্রতিটি কথার সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।
- সংক্ষেপণ না করে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে।
- সর্বস্তরের পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে সহজ ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

বইটিকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে তোলার পেছনে দারুত তাকবীরের এক ঝাঁক তরুণ ও মেধাবী আলেমের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে। তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা না থাকলে আমার একার পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করা সম্ভব হতো না। মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অধীর আগ্রহের পর বইটি এখন প্রকাশের অপেক্ষায়। আশা করি, পাঠকের ভালো লাগবে।

আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। তারপরও আমরা মানুষ; তাই কোথাও কোনো ভুল কিংবা অপূর্ণতা থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পাঠকের কাছে অনুরোধ থাকবে, তাদের চোখে এমন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধনের প্রয়াস অব্যাহত রাখব। ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ আমাদের এই ছোট্ট খেদমতটুকু কবুল করুন এবং এটিকে আমাদের ইহ ও পরকালীন নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন।

ইয়াসীন বিন ইউসুফ
০১.০৮.২০২০ ইং

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের ঈমানের মতো মহান দৌলত দান করেছেন এবং সত্য সহজ সুন্দর দীনের অনুসারী করেছেন। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূল এবং রাসূলের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের ওপর।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটি কুরআন সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের বক্তব্যের আলোকে দীন ইসলামের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে লেখা। চার খণ্ডে রচিত মূল গ্রন্থে শুধু ইবাদত, মুআমালাত, আখলাক, আদব বিষয়ক আলোচনাই স্থান পায়নি, আধ্যাত্মিক এবং আত্মিক বিষয়াদিও আলোচিত হয়েছে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে। ইহ-পরকালীন জীবনের ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো বিশ্লেষণের পাশাপাশি কল্যাণ এবং মুক্তির বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী করে।

এতে শরিয়তের মৌলিক ইবাদতগুলোর সারনির্যাস যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি মনোজগতের বিভিন্ন অবস্থার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যাও প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। তাই গ্রন্থটি রচনার পর থেকে বিগত নয়শ বছর যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণির মুসলিমদের নিকট ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহর পবিত্র কালাম ও রাসূলের পবিত্র হাদিসের পর আর কোনো গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের নিকট ইমাম গাযালি (র)-এর এই গ্রন্থটির মতো সমাদৃত হয়নি। এ গ্রন্থের বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতাই এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে।

দারুত তাকবীর এ মূল্যবান গ্রন্থটি সিরিজ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিরিজের দ্বাদশতম খণ্ড অনুবাদ করেছেন মাওলানা ইয়াসীন বিন ইউসুফ।

আলহামদুলিল্লাহ! গ্রন্থটি আমাদের আগাগোড়া সম্পাদনা এবং নিরীক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে। এতে ইহয়াউ উলূমিদ্দীনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ চলে এসেছে। সেই সাথে প্রতিটি কথার উদ্ধৃতিও তুলে ধরা হয়েছে। এদিক থেকে বইটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। তবে মানবসুলভ ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেক্ষেত্রে আমরা পাঠক সাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সৃজনশীল ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশন দারুত তাকবীরকে স্বাগত জানাই প্রকাশনা জগতে যাত্রার সূচনাতে এমন বৃহৎ একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং উম্মতের সামনে বিশুদ্ধ ও নান্দনিকরূপে গ্রন্থটি পেশ করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি থেকে আমাদের সবাইকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং এর অসিলায় দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব করুন। আমিন!

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে

মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ

০১.০৮.২০২০

সম্পাদনা পরিষদ

- **মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ**
  শিক্ষাসচিব, মারকাযুল কুরআন বাংলাদেশ, ঢাকা

- **মাওলানা শফীকুল ইসলাম**
  শিক্ষাসচিব, কদম রসূলপুর মাহমুদুল উলূম মাদরাসা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
  সাবেক সহসম্পাদক, মাসিক মদীনা ও সাপ্তাহিক মুসলিমজাহান

- **মুফতি মাহদী হাসান**
  উস্তায, মাদরাসা কাসেমিয়া, জামতলা, ময়মনসিংহ

- **মুফতি নূরে আলম**
  মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া, মিরপুর-১২, ঢাকা

- **মাওলানা ইয়াসিন বিন ইউসুফ**
  উস্তায, মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম, শ্যামলী, ঢাকা

জামিয়া মুহাম্মদিয়া ভাষানটেক মাদরাসার শায়খুল হাদিস ও প্রতিষ্ঠাতা
প্রিন্সিপ্যাল হযরত **মাওলানা আব্দুল লতিফ ফারুকী দা.বা.**-এর

দুআ ও অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

ধর্মীয় সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুত তাকবীর থেকে 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' সিরিজের দ্বাদশতম খণ্ড প্রকাশিত হতে চলেছে।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল গাযালি (র) (জন্ম : ৪৫০হি: মৃত্যু : ৫০৫ হি:) রচিত জগদ্বিখ্যাত এক অমর গ্রন্থ। তাঁর রচিত গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে এটি সর্বাধিক সমাদৃত। হিজরি পঞ্চম শতকে তিনি এটি রচনা করেন। প্রকাশকাল থেকেই সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম জনসাধারণ গ্রন্থটি সাদরে গ্রহণ করেছেন। আকীদা, ফিকহ, তাসাওউফ, আখলাক ও তারবিয়াত ইত্যাদির চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে রচিত এ গ্রন্থ। চারটি প্রধান বিষয়কে উপজীব্য করে এর বিন্যাস।

১. ইবাদত সংক্রান্ত বিধিবিধান। ২. জীবনাচার সম্বন্ধীয় বিষয়াদি। ৩. মুহলিকাত তথা ধ্বংসকারী বিষয়াবলি। যেমন, আত্মম্ভরিতা, রিপু ও যবানের বিপদ ইত্যাদি। ৪. মুনজিয়াত তথা মুক্তি প্রদানকারী বিষয়। যেমন, তাওবা, সবর, আল্লাহর ভয় ইত্যাদি। সর্বশেষ মৃত্যুর আলোচনা দিয়ে কিতাব পরিসমাপ্ত হয়।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটি সিরিজ আকারে বাংলাভাষী মানুষের জন্য নতুন সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। দ্বাদশতম খণ্ডের অনূদিত পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ! দারুত তাকবীর সহজ-সাবলীল ভাষায় সুখপাঠ্যরূপে উদ্ধৃতিসহকারে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠক সমাজের সামনে নিয়ে এসেছে। দুআ করি, মহান রাব্বুল আলামীন এ খণ্ডের অনুবাদক মাওলানা ইয়াসীন বিন ইউসুফসহ মহান লেখক ও গুণী সম্পাদক মণ্ডলীর সবার শ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। সৃজনশীল ইসলামি প্রকাশনা দারুত তাকবীরের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করুন। এর খ্যাতি ও পরিধি সুপ্রশস্ত করুন। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উভয় জাহানে কামিয়াব করুন। আমীন। আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল আলামীন।

(আবদুল লতিফ)

সূচিপত্র

বিষয়..... পৃষ্ঠা

খ্যাতি ও লৌকিকতার নিন্দা

প্রথম পরিচ্ছেদ
রিয়ার উৎস ও কিছু কথা [১৭]

অখ্যাতির ফযিলত..... ২০
খ্যাতিপ্রীতির নিন্দা..... ২৪
খ্যাতির অর্থ ও তার মূল প্রকৃতি..... ২৫
প্রকৃতিগতভাবে সম্মান প্রীতির কারণ..... ২৬
তিন দিক থেকে সম্মানী ব্যক্তি সম্পদশালীর ওপর প্রাধান্য পায়..... ২৭
একটি আপত্তি ও তার জবাব..... ২৯
এর পেছনে দুটি কার্যকর কারণ রয়েছে..... ৩০
বাস্তব পূর্ণতা ও ধারণা প্রসূত পূর্ণতার বিবরণ..... ৩৬
আল্লাহর ইলম তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণ..... ৩৭
কুদরতের বিবরণ..... ৪০
স্বাধীনতার বিবরণ..... ৪১
ফেরেশতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য..... ৪১
খ্যাতির আসক্তিতে ভালো ও মন্দ..... ৪৪
আপন প্রশংসায় মন আনন্দিত ও নিন্দায় নিরুৎসাহিত হওয়ার রহস্য..... ৪৬
যশ-খ্যাতির প্রতিকার..... ৪৮
খ্যাতি প্রতিরোধের সবেচেয়ে কার্যকর উপায়..... ৫১
নিন্দাকে অপছন্দ করার উপায়..... ৫৬
প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে লোকদের বিভিন্ন অবস্থান..... ৫৮
প্রশংসা ও নিন্দা সমান হওয়ার কিছু আলামত..... ৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লৌকিকতা ও রিয়া [৬৪]

লৌকিকতার নিন্দা ৬৪
রিয়ার প্রকৃতি ৭৫
ইবাদত বিষয়ে রিয়া ৮৪
রিয়ার বিভিন্ন স্তর ৮৭
জাহির ও বাতিন রিয়ার মধ্যে যেগুলো বাতিল ১০২
রিয়ার প্রতিকার ১১১
রিয়া প্রতিরোধে কর্মভিত্তিক প্রতিষেধক ১১৭
মুখলিস ব্যক্তির রিয়ার শ্রেণি চারটি ১২৩
মানুষের নিন্দার ভয়ে অপরাধ গোপন করার বৈধতা ১৩৮
রিয়ার ভয়ে সৎকাজ ত্যাগ করা ১৪৪
ওয়ায়েজের পরিচয় ১৫৬
অন্যকে দেখে নিজে আমল করার হুকুম ১৬৫
কোনটা রিয়া আর কোনটা রিয়া না তা বোঝার উপায় ১৬৭
ইবাদতের পূর্বাপর ও মাঝখানে মুরীদের কর্তব্য ১৭২

প্রতারণা-প্রবঞ্চনার নিন্দা

বিভ্রান্তির নিন্দা ও প্রকৃতি ১৮৩
ধোঁকা-প্রবঞ্চনার প্রতিকার ১৯৫
চার প্রকার লোক বিভ্রান্ত ২০৭
আমলের প্রবঞ্চনা ২২০
ইলমের প্রবঞ্চনা ২২১
ফকিহদের প্রবঞ্চনা ২৩৫
সংসারবিরাগী ও ইবাদতকারীদের বিভ্রান্তি ২৩৯
সূফীগণের বিভ্রান্তি ২৪৫
ধনীদের বিভ্রান্তি ২৫৪

[দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত]

খ্যাতি ও লৌকিকতার নিন্দা

ইসলামে লৌকিকতা ও খ্যাতির লালসার অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম এবং আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দারা এমন বিপদ থেকে বেঁচে থাকতেন। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন বিপজ্জনক কিছুর আশঙ্কা করেছিলেন তার উম্মতের মাঝে। তাই তিনি এজাতীয় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য উম্মতকে সতর্ক করেছেন। নবী কারীম (স) বলেছেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ.

অর্থাৎ, আমার উম্মতের জন্য আমি যে সকল বিষয়ের ভয় করি, তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো লৌকিকতা ও গোপন লালসা। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১১১৪. হিলয়াতুল আউলিয়া : ৭ : ১২২, আয যুহদুল কাবীর : ৩১৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩২০৫)

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে কঠিন শিলার উপর দিয়ে কালো পিঁপড়া চলাচল করলে যেমন তা অনুভব করা যায় না, তেমনি এ গোপন লালসাও অনুভূত হয় না।

এজন্যই আলেমগণও এর বিপদ সম্পর্কে জানতে পারেন না। সাধারণ আবেদ ও মুত্তাকীদের তো প্রশ্নই আসে না। এটা প্রবৃত্তি বিনাশকারী শক্তি ও গোপন প্রবঞ্চনা। যেসব আলেম ও আবেদ আখেরাতের পথ পার হতে চায় এবং এজন্য খুব সচেষ্ট হয়, তারাও লৌকিকতার পাঁকে আটকে যায়। ফলে, তারা নিজের প্রবৃত্তিকে মুজাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে পরাজিত করে কামনা-বাসনা থেকে পৃথক করে নেয় এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে বাঁচিয়ে নেয়। এরপর নফসকে জোরপূর্বক নানা ধরনের ইবাদতে মশগুল করে। ফলে, তাদের প্রবৃত্তি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কোনো বাহ্যিক পাপ করতে অপারগ হয়ে পড়ে।

নফস যখন মুজাহাদার পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেতে উপায়ান্তর হয় তখন এ পরিশ্রমের বিনিময়ে শান্তি, স্বস্তি ও আরামের প্রত্যাশা করে। দুনিয়ার মানুষ যখন তাদেরকে মানতে এবং তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে শুরু করে, তখন নফস এক প্রকার প্রশান্তি অনুভব করে। এরপর তারা ইলম, আমল ও ইবাদত প্রকাশ করতে উৎসাহী হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা ভালো বলবেন— কেবল এতেই তারা ধৈর্যধারণ করতে পারে না। তারা দেখে, মানুষের মধ্যে প্রখ্যাত হয়ে গেছে অমুক ব্যক্তি, যে কামনা-বাসনা বর্জনকারী, সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষাকারী এবং ইবাদতে কঠোর শ্রম সাধনাকারী।

তারা আরও লক্ষ করে, অনেক মানুষ তাদের প্রশংসা করে, তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখে, তাদের সাক্ষাতকে বরকতময় মনে করে, তাদের কাছ থেকে দুআ নিতে আগ্রহী হয়, দেখামাত্রই সালাম করে, বৈঠকের কেন্দ্রস্থলে আসন পেতে দেয়, সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকে এবং খেদমত ও অন্য কোনো মতলবের কথা বললে তা করতে প্রয়াস চালায়। এ সব দেখে-শুনে তাদের প্রবৃত্তি এমন আনন্দ পায়, যার উপরে আর কোনো আনন্দ নেই। এ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গুনাহ ত্যাগ করা তেমন কঠিন হয় না এবং অব্যাহতভাবে ইবাদত করা সহজ হয়ে যায়। তারা তো মনে করে যে, তাদের জীবন আল্লাহর জন্য এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ইবাদতের জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবন সেসব কামনা-বাসনা ও আনন্দের প্রত্যাশী হয়ে থাকে, যা সুস্থ বিবেক ব্যতীত কেউ জানে না।

মানুষের সম্মান প্রদর্শনের কারণে যে আনন্দ তাদের হাসিল হয়, তার দরুন ইবাদত ও আমলের সমস্ত সওয়াব ধ্বংস হয়ে যায়। মনে মনে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল ভাবে; প্রকৃতপক্ষে তাদের নাম মুনাফেকদের তালিকায় লিখা হয়। সুতরাং এটা নফসের এমন এক ধোঁকা, যা থেকে কেবল সিদ্দীক ও নৈকট্যশীলগণই রক্ষা পেতে পারেন। এজন্য বলা হয়। সিদ্দিকের মন থেকে সর্বশেষ রিয়া বের করে আনা হয়, তা হচ্ছে নেতৃত্বপ্রীতি। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ২৩২)

রিয়া যখন এমন একটি সুপ্ত ব্যাধি এবং শয়তানের প্রতারণা, তখন এর স্বরূপ, স্তর, প্রকারভেদ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি জানা খুবই জরুরি। সেজন্য নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রিয়ার উৎস ও কিছু কথা

মানুষের চতুর্দিকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়াকে বলা হয় 'জাহ' অর্থাৎ প্রভাব-প্রতিপত্তি। এরূপ খ্যাতি খুব কল্যাণকর নয়; বরং অখ্যাত এবং নাম-নিশানাশূন্য থাকা এর চেয়ে অনেক উত্তম। তবে আল্লাহ তাআলা যদি তাঁর দীন প্রচার করার সুখ্যাতি দান করেন এবং এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টা-চরিত্রের কোনো লেশ না থাকে, তবে এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত খ্যাতিতে কোনো সমস্যা নেই। আনাস (রা)-থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (স) বলেন,

حَسَبُ امْرِىءٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يُشِيْرَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِيْ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যাকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন তিনি ব্যতীত, কোনো মানুষের অকল্যাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে মানুষ তাঁর দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা সূরতের দিকে তাকান না। বরং তিনি তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের আমলের দিকে তাকান। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৩১)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যাকে রক্ষা করেন সে ব্যতীত কারও ক্ষতির জন্য এটাই যথেষ্ট যে, মানুষ কারও দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তার দিকে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করবে।

হাসান (রা) এ হাদিসটি বর্ণনা করলে লোকেরা তাঁকে বলল, হে আবু সাঈদ! আপনাকে দেখে লোকেরা আপনার প্রতিও আঙুল তুলে ইশারা করে। তিনি বললেন, এ হাদিসে এ প্রকার ইঙ্গিত বোঝানো হয়নি। বরং উদ্দেশ্য হলো ধর্মে কোনো নতুনত্ব সৃষ্টি করার জন্য যদি কারও প্রতি ইঙ্গিত করা হয় অথবা নতুন পাপাচার আবিষ্কার করার কারণে ইঙ্গিতের পাত্র হয়ে গেলে তা ক্ষতিকর। (প্রাগুক্ত : ৩২)

মোটকথা, হাদিসটির তিনি এমন ব্যাখ্যা দিলেন, যাতে কোনো ত্রুটি নেই।

আলী (রা) বলেন, খরচ করো, খ্যাতি প্রকাশ করো না এবং বাড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করো না– যাতে মানুষ তোমাকে চিনে, জানে এবং স্মরণ করে; বরং নিজেকে গোপন রাখ এবং চুপ থাকো। এতেই মুক্তি নিহিত। ধর্মপরায়ণ লোকেরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং অপরাধীরা জ্বলে-পুড়ে মাটি হবে। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৩৪)

ইবরাহিম ইবনে আদহাম (র) বলেন, যে সুখ্যাতিকে ভালো মনে করে, সে আল্লাহকে চিনে না।

আইয়ুব সাখতিয়ানী (র) বলেন, যে পর্যন্ত কেউ তার বাসগৃহ মানুষের নিকট অজ্ঞাত থাকাকে পছন্দ না করবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ হয় না। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৩৫)

খালিদ ইবনে মি'দান (র)-এর ওয়াযের মাহফিলে যখন বহু লোক সমাগম হতো, তখন তিনি সুখ্যাতির ভয়ে মাহফিল থেকে চলে যেতেন। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৪৬)

আবুল আলিয়ার নিকট তিনজনের অধিক লোক সমাগম হলেই তিনি চলে যেতেন। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৪৭)

তালহা (রা) একবার দেখলেন, তাঁর সাথে প্রায় দশজন লোক হেঁটে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ সমস্ত লোক লোভের মাছি এবং জাহান্নামের ফড়িং। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৫০)

সুলাইমান ইবনে হানযালা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর পেছনে পেছনে চলছিলাম ইত্যবসরে উমর (রা)-এর দৃষ্টি তার উপর গিয়ে পড়ল। তিনি দোররা হাতে তেড়ে এলেন। কা'ব আরয করলেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি করছেন? একটু ভেবে দেখুন তো।

তিনি বললেন, যেরূপ জাঁকজমকসহকারে তুমি যাচ্ছ, সেটা অনুসরণকারীদের জন্য ভ্রষ্টতার পথ এবং তোমার জন্য পরীক্ষা। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৫১)

হাসান (রা) বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ (রা) একদিন বাড়ি থেকে বের হলে অনেক লোক তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগল। তাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, তোমরা আমার পেছনে পেছনে আসছ কেন? আল্লাহর কসম! যে কারণে আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ রাখি, তা যদি তোমাদের জানা হয়ে যায়, তাহলে দুটি লোকও আমার সাথে চলবে না। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৫২)

হাসান (রা) একদিন বাড়ি থেকে বের হলে লোকজন তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগল। তিনি বললেন, আমার নিকট কোনো প্রয়োজন থাকলে বলো, নতুবা এটা কোনো বিস্ময়কর কিছু নয় যে, পেছনে পেছনে চলা মুমিনদের অন্তরে কিছু অবশিষ্ট রাখবে না। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৫৪)

ইতিহাস থেকে জানা গেছে, এক লোক ইবনে মাজরিযের সাথে সফরে গেল। এরপর তার নিকট থেকে চলে আসার সময় সে নিবেদন করল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, সম্ভব হলে এটা করো, তুমি অপরকে চিনবে, কেউ যেন তোমাকে চিনতে না পারে। পথ চলার সময় কোনো লোক যেন তোমার সাথে না থাকে। তুমি অপরকে জিজ্ঞেস করবে, কোনো লোক যেন তোমাকে জিজ্ঞেস না করে। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৫৫)

আবু আইয়ূব সফরে বের হলেন, কিছু লোক তাঁর পিছন পিছন এলো। তখন তিনি বললেন, আমি যদি না জানতাম যে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরের এ বিষয়টি জানেন যে আমি এটি অপছন্দ করি। তাহলে আমি আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির আশঙ্কা করতাম। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৫৯)

মা'মার বলেন, আমি আইয়ুবকে লম্বা জামা পরিধানের কারণে ভর্ৎসনা করলাম। তখন সে বললো অতীতে খ্যাতিলাভ লম্বা জামা পরিধানের মাঝে ছিলো। বর্তমানে তা খাটো জামার মধ্যে চলে এসেছে। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৬১)

কোনো এক মুসলিম মনীষী বলেন, আমি আবু কিলাবের সাথে ছিলাম, এমন সময় এক লোক সুন্দর জামা কাপড় পরে সেখানে এলো। তিনি বললেন, এই বাকশক্তিসম্পন্ন গাধা থেকে দূরে থাকো। অর্থাৎ খ্যাতি অন্বেষণ করো না। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৬৫)

সুফিয়ান সওরী (র) বলেন, অতীতের মুসলিম মনীষীরা দুটি খ্যাতি থেকে বেঁচে থাকতেন– একটি হচ্ছে উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদের খ্যাতি, অপরটি ছিন্ন ও পুরাতন পোশাকের খ্যাতি। কারণ, উভয় পোশাকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৬৪)

এক ব্যক্তি বিশর ইবনে হারেছকে বলল, জ্ঞানীকে নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, অখ্যাত থাকো। উত্তম আহার গ্রহণ করো। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৭০)

হাওশিব (র) কাঁদতেন আর বলতেন, আমার নাম জামে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৭০)

বিশর (র) বলেন, খ্যাতি পছন্দ করেছে এবং দীন ধ্বংস হয়নি এমন লোক আমি দেখেনি। তিনি আরও বলেন, যে খ্যাতি আশা করে, সে পরকালের স্বাদ পায় না । (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৭২)

অখ্যাতির ফযিলত

বারা ইবনে' মালিক ও ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (স) বলেন, অনেক এলোকেশী ধুলোমলিন চাদরওয়ালা লোক রয়েছে, যাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। অথচ যদি তারা আল্লাহর নামে কসম করে কোনো কথা বলে ফেলেন, তাহলে আল্লাহ তা বাস্তবায়িত করে দেন। বারা ইবনে মালেক তাদের অন্তর্ভুক্ত। (জামে তিরমিযী : ৩৮৫৪)

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, অনেক ধুলোমলিন চাদরওয়ালা এমন রয়েছে, যাদের দিকে মানুষ ফিরেও তাকায় না। তারা যদি বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত কামনা করি, তবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতই দিবেন এবং দুনিয়াতে কিছু দেবেন না। (মুসনাদে ফেরদাউসে দুর্বল সনদে; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ২৩৫)

আল্লাহর রাসূল (স) বলেন, আমি কি তোমাদের জান্নাতীদের পরিচয় বলবো? দুর্বল এবং যাদের দুর্বল মনে করা হয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জান্নাতী। যদি তারা আল্লাহর নামে কসম করে কোনো কথা বলে তাহলে তিনি তা পূর্ণ করে দেন আর জাহান্নামী হলো প্রত্যেক অহংকারী অত্যাচারী ব্যক্তি। (সহিহ বুখারী : ৪৯১৮; সহিহ মুসলিম : ২৮৫৩)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তারাই জান্নাতী যাদের বিক্ষিপ্ত চুল এবং পরিধানের কাপড় মাত্র দুটি চাদর। যদি তারা শাসকদের নিকট যেতে চায়, তবে প্রহরী তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে কেউ তাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয় না। তাদের অভাব-অনটন তাদের বুকেই থাকে। কিয়ামতের দিন তাদের নূর বণ্টন করা হলে সমস্ত মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকী : ১০০০৪, ১০০০৫)

আল্লাহর রাসূল (স) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যদি তাদের কেউ তোমাদের কারও কাছে এসে একটি দীনার চায়, তাহলে সে তাকে তা দিবে না। যদি একটি দিরহাম চায়, তাহলে সে তাকে তা দিবে না। যদি একটি পয়সা চায় তাহলেও সে তাকে তা দিবে না। অথচ সে যদি আল্লাহর কাছে জান্নাত চায় তাহলে তিনি তাকে দিয়ে দিবেন। যদি দুনিয়া চায় তাহলে তিনি তাকে তা দিবেন না। আল্লাহ তাকে এ কারণে দুনিয়া দিবেন না যে সে আল্লাহর নিকট তুচ্ছ। এমন ব্যক্তির পরিধানের কাপড় মাত্র দুটি চাদর। তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে বসে তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা বাস্তবায়িত করে দেবেন। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমুল, ইবনু আবিদ দুনয়া : ১; সালেম বিন আবুল জা'দ-এর সূত্রে, হাদিসটি মুরসাল)

বর্ণিত আছে, একবার উমর (রা) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন, মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর রওজার কাছে বসে কাঁদছেন। তিনি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে মুয়ায (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, সামান্য রিয়াও শিরক। আল্লাহ তাআলা এমন নিভৃতচারী মুত্তাকীদের পছন্দ করেন, যারা উধাও হয়ে গেলে কেউ তাদের খোঁজ করে না, আর সামনে এলে কেউ তাদের চিনে না। তারাই হিদায়াতের প্রদীপ।

মুহাম্মদ ইবনে সুয়াইদ (র) বর্ণনা করেন, একবার মদীনা মুনাওয়ারায় খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এক সাধু ব্যক্তি মসজিদে নববীতেই থাকতো এবং দুআ

করতো। একদিন সবাই দুআ করছিল, এমন সময় এক পুরাতন ও ছিন্নবস্ত্র পরিহিত লোক এসে উপস্থিত হলো, সে এসে সংক্ষেপে দু'রাকাত নামায আদায় করল এবং হাত তুলে দুআ করল, প্রভু হে! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি— এই মুহূর্তেই বৃষ্টি দাও। লোকটি দুআ শেষ করে হাত নামানোর পূর্বেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং দেখতে না দেখতেই এত বৃষ্টি হলো যে, মদীনার লোকজন ডুবে যাওয়ার ভয়ে ফরিয়াদ করতে লাগল। এরপর লোকটি আরয করল, প্রভু হে! যদি তুমি মনে কর যে, এই পরিমাণ পানি তাদের জন্য যথেষ্ট, তাহলে বৃষ্টি থামিয়ে দাও। সাথে সাথে বৃষ্টি থেমে গেল। এরপর সাধু লোকটি সেই লোকটির পেছনে পেছনে চলল এবং তার বাড়ির সন্ধান করে সাত সকালে তার খেদমতে গিয়ে বলল, আমি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। তা এই যে, আপনি আমার জন্য বিশেষভাবে দুআ করুন। ছিন্নবস্ত্র পরিহিত লোকটি সাধু ব্যক্তিকে বলল, সুবহানাল্লাহ! আপনি আমাকে দুআ করতে বলছেন? লোকটি বললেন, হ্যাঁ! আপনার অবস্থা তো গতকালই জানতে পেরেছি। এখন বলুন এই মর্যাদা আপনি কী করে লাভ করলেন? সে বলল, আমি আল্লাহ পাকের আদেশ ও নিষেধ মেনে চলেছি। তাই আমি তাঁর নিকট যে দুআ করেছি, তিনি তা কবুল করেছেন। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ৬)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হে লোক সকল! জ্ঞানের প্রস্রবণ এবং হিদায়াতের আলো হও। প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে থাকো। পুরাতন কাপড় পরিধান করো, যাতে আকাশের বাসিন্দারা তোমাদের চিনে এবং পৃথিবীর লোকেরা না চিনে। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اغْبَطَ اَوْلِيَائِيْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْمَحَازِ ذُوْحَظٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهٖ وَاَطَاعَ فِي السِّرِّ وَكَانَ عَامِضًا فِي النَّاسِ لَايُشَارُ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ ثُمَّ صَبَرَ عَلٰى ذٰلِكَ.

অর্থাৎ, 'আমার অলীদের মধ্যে সেই মুমিন বান্দা অধিকতর ঈর্ষার যোগ্য, যে পরিবার-পরিজনের বোঝা নিজের ওপর কম রাখে, নামাযে অংশগ্রহণ করে, আল্লাহর ইবাদত করে এবং গোপনে আনুগত্য করে। সে মানুষের মধ্যে এত খ্যাতিমান নয় যে, মানুষ তার প্রতি আঙুলের ইশারায় দেখাবে। এরপর সে এ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করে।'

তারপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর হাতে টোকা মেরে বললেন, তার মৃত্যুও ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর ওয়ারিশও কম এবং তার শোকে ক্রন্দনকারীণীও।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলার নিকট আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হলো, গুরাবাগণ। জিজ্ঞাসা করা হলো, গুরাবা কারা? তিনি বললেন, দীন নিয়ে পলায়নকারীগণ। কেয়ামতের দিন তারা ঈসা বিন মারইয়াম (আ)-এর নিকট সমবেত হবেন। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ১৬)

ফুযাইল বিন ইয়ায (র) বলেন, আমি জেনেছি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে কোনো কোনো নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, আমি কি তোমাকে নিয়ামত দান করিনি? আমি কি তোমার দোষ গোপন করিনি? আমি কি তোমাকে অখ্যাত রাখিনি? (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ১৭)

খলিল বিন আহমাদ (র) বলেন, হে আল্লাহ, আমাকে আপনার নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান, আমার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং মানুষের নিকট মাঝামাঝি স্তরের করুন। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ২১)

সুফিয়ান সাওরি (র) বলেন, আমি দেখেছি, আমার অন্তর মক্কা-মদিনার গুরাবাদের মোটা ও পশমি কাপড় পরিহিত গুরাবা লোকদের সঙ্গে সুস্থ থাকে। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ২২)

ইবরাহিম বিন আদহাম (র) বলেন, দুনিয়াতে কেবল একবার আমার চক্ষু শীতল হয়েছিল। সিরিয়ার কোনো এক পল্লির মসজিদে আমি এক রাত ছিলাম। আমার পেট ব্যথা ছিল। মুআযযিন আমার পাও ধরে টেনে আমাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। (আত-তাওয়াজু ওয়াল খুমূল ইবনু আবিদ দুনয়া : ২৮)

ফুযাইল (র) বলেন, তোমাকে কেউ চিনে না এমনভাবে যদি থাকতে পারো, তবে তাই করো। তোমাকে কেউ না চিনলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। তোমার কেউ প্রশংসা না করলেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। যদিও তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট ভালো হও এবং মানুষের দৃষ্টিতে খারাপ হও তবে এতেও কোনো অনিষ্ট নেই।

হাদিস ও মনীষীর বাণী থেকে খ্যাতির নিন্দা এবং অখ্যাতির ফযিলত সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। খ্যাতির আসল লক্ষ্য হচ্ছে শানশওকত তথা মানুষের মনে আসন গেড়ে নেওয়া। এটা অনর্থের মূল।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, নবী-রাসূলগণ, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং ইমামরা সর্বাধিক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁদের খ্যাতি থেকে অধিক খ্যাতি আর কী হতে পারে? সুতরাং, তাঁরা কি অখ্যাতির ফযিলত থেকে বঞ্চিত থেকে যান?

জেনে রাখো যে, নিন্দনীয় হলো খ্যাতি তালাশ করা। যদি বান্দার কোনো প্রচেষ্টা ছাড়া আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তা দান করেন, তাহলে তা নিন্দনীয় নয়।

হ্যাঁ, দুর্বল ঈমানদারদের জন্য তাতে পরীক্ষা রয়েছে; সবলদের জন্য নয়। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ডুবন্ত দুর্বল ব্যক্তির মতো, যার সঙ্গে আরও অনেক ডুবন্ত ব্যক্তি রয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ তাকে চিনতে না পারাই উত্তম। তাহলে সবাই গিয়ে তাকে ধরবে। সে অক্ষম হওয়ার কারণে সবাইকে নিয়ে নিজেও ডুবে মরবে। আর শক্তিশালী ব্যক্তিকে সবাই চিনতে পারাটা উত্তম, যাতে সবাই তার ওপর নির্ভর করতে পারে। তাকে ধরে বাঁচতে পারে। সে তখন তাদের উদ্ধার করবে এবং এর বিনিময়ে সাওয়াব লাভ করবে।

খ্যাতিপ্রীতির নিন্দা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا.

আখেরাতের সেই ঘর আমি তাদেরকে দান করব– যারা পৃথিবীতে উচ্চ হওয়ার এবং ফাসাদ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে না। (সূরা কাসাস : ৮৩)

দুটি ইচ্ছাকে এই আয়াতে একত্রিত করা হয়েছে– একটি উচ্চ হওয়ার ইচ্ছা এবং অপরটি গোলমাল সৃষ্টি করার ইচ্ছা। এরপর বলা হয়েছে, আখেরাত তার জন্যই, যে দু'ধরনের ইচ্ছা থেকে মুক্ত। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ.

যে দুনিয়াবী জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তার আমল দুনিয়াতেই পুরাপুরি দিয়ে দেই এবং তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাদের জন্যে আখেরাতে আগুন ছাড়া কিছুই নেই। (সূরা হূদ : ১৫-১৬)

এই আয়াতও তার ব্যাপকতার মধ্যে সুখ্যাতিপ্রীতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেননা, এটা জাগতিক জীবনের সকল আনন্দের চেয়ে বড় এবং সকল সাজসজ্জা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। হাদিসে বলা হয়েছে,

حبُّ الْمَالِ وَالْجَاهِ يُنْبِتَانِ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ.

ধনসম্পদ ও জৌলুসের মোহ অন্তরে এমনভাবে মুনাফেকী উদ্‌গত করে, যেমন বৃষ্টির পানি শাকসবজিকে উৎপন্ন করে।

আরও বলা হয়েছে, দুটি বাঘ বকরির পালে ছেড়ে দিলে অতটুকু ক্ষতি করে না, যতটুকু ক্ষতি করে গৌরব ও ধনসম্পদের লোভ মুসলমান ব্যক্তির ধার্মিকতার। (জামে তিরমিযী : ২৩৭৬)

আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, খেয়াল খুশি ও প্রশংসাপ্রীতির জন্যই মানুষ বরবাদ হয়েছে। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ এই, তিনি আপন কৃপা ও অনুগ্রহে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

খ্যাতির অর্থ ও তার মূল প্রকৃতি

প্রকাশ থাকে যে, ধনদৌলত ও জৌলুস দুনিয়ার দুটি স্তম্ভ। 'মাল' অর্থ উপকারী বস্তুসমূহের অধিকারী হওয়া এবং 'জাহ' বলা হয় সেইসব অন্তরের মালিক হওয়া, যাদের নিকট থেকে সম্মান ও আনুগত্য কামনা করা হয়। মালদার ও ধনী সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে টাকাপয়সা ব্যয় করার ক্ষমতা রাখে এবং এর মাধ্যমে নিজের সকল উদ্দেশ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মানসিক কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে পারে। এমনিভাবে প্রভাবশালী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে মানুষের অন্তরকে এমনভাবে আয়ত্ত করে নেয় যে, তাদের দ্বারা যেকোনো মতলব চাহিদামতো সিদ্ধ করতে পারে। যেমন বিভিন্ন ধরনের পেশা ও কারিগরি দ্বারা ধনসম্পদ হাসিল করা হয়, তেমনি মানুষের অন্তরও নানান ধরনের কাজ-কর্মের মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়। অন্তর যখন এ বিশ্বাস করে যে, অমুক ব্যক্তির মধ্যে অমুক বিষয়ের পরিপূর্ণ গুণ আছে, তখন অন্তর তার আয়ত্তে এসে যায়। এখানে সেই গুণটি বাস্তবেও পরিপূর্ণ গুণ হওয়া শর্ত নয়, বরং ব্যক্তির মতে ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ গুণ হওয়াই যথেষ্ট। মাঝে মধ্যে অন্তর এমন বিষয়কেও পরিপূর্ণ গুণ বলে বিশ্বাস করে, যা বাস্তবে পূর্ণ গুণ নয়। কিন্তু অন্তর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সেটাকে পরিপূর্ণ গুণ বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে। এ কারণেই অন্তর তার বশীভূত হয়ে যায়। কেননা, আনুগত্য হচ্ছে অন্তরের একটি অবস্থা, যা বিশ্বাসের অনুগত হয়ে থাকে। সুতরাং যেমনি বিশ্বাস হবে, তেমনি অবস্থা দেখা দেবে।

যে ব্যক্তি ধনসম্পদের মহব্বত পোষণ করে, সে যেমন চায় যে, তার কাছে অনেক বাঁদি-গোলাম থাকুক, তেমনি যশপ্রিয় ব্যক্তিও চায়, সকল মানুষ তার গোলামি করুক এবং তাদের অন্তরের উপর তার সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হোক; বরং যশপ্রিয় ব্যক্তির মনস্কামনা আরও বেশি। কেননা, সম্পদশালী ব্যক্তি বলপূর্বক বাঁদি-গোলামের মালিক হয়। বাঁদি-গোলামরা মন থেকে কোনো সময় কারও ক্রীতদাস হতে চায় না। কিন্তু যশপ্রিয় ব্যক্তির আনুগত্য মানুষ সানন্দে গ্রহণ করে। স্বাধীন ব্যক্তি নিজের মনের আগ্রহে তার গোলাম হয় এবং তার গোলামি ও আনুগত্য করাকে গর্বের বিষয় মনে করে। এ থেকে জানা গেল যে, 'জাহ' শব্দের অর্থ মানুষের অন্তরে আসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া; অর্থাৎ অন্তরে কোনো ব্যক্তির কোনো পূর্ণতা গুণের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। সুতরাং পূর্ণতার বিশ্বাস যে পরিমাণে হবে, সে পরিমাণেই আনুগত্য হবে এবং যে পরিমাণে আনুগত্য হবে, সে পরিমাণে মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তৃত হবে। ক্ষমতা যত বেশি হবে, আনন্দ ও যশপ্রীতি তত অধিক হবে। এ পর্যন্ত 'জাহ' শব্দের অর্থ বর্ণিত হলো। এখন এর ফলাফল দেখা উচিত।

প্রশংসা হচ্ছে যশ বা খ্যাতির ফল। যে ব্যক্তি কারও পরিপূর্ণ গুণে বিশ্বাস করে, সে তার প্রশংসা থেকে বিরত থাকে না। যশের আরেকটি ফল হলো খেদমত করা ও সাহায্য-সহযোগিতা করা। বিশ্বাসী ব্যক্তি নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেকে বিশ্বস্ত ব্যক্তির খেদমত ও সাহায্যে নিয়োজিত রাখে এবং চাকরের ন্যায় তার অধীন হয়ে থাকে। এছাড়া খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যতম ফলাফল হচ্ছে বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে অগ্রজ মনে করা, তার সাথে ঝগড়া-ফাসাদ না করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং মজলিসে উত্তম জায়গায় বসানো।

প্রকৃতিগতভাবে সম্মান প্রীতির কারণ

জেনে রাখা দরকার যে, যেসব কারণে মানুষ স্বর্ণ রৌপ্যর প্রতি লোভাতুর হয় সেসব কারণেই মানুষের মনে সম্মান প্রীতি বাসা বাধে।

তবে মানুষের মনে রৌপ্যের চাইতে স্বর্ণের চাহিদা বেশি থাকে তেমনি সে স্বর্ণের চাইতে সম্মান অর্জনকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করে।

এর কারণ হলো, স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা মূলগতভাবে উপকার লাভ করা যায় না। কারণ সোনা রূপা খাবার নয়। তাই সেগুলো খাওয়া যায় না। পানীয় নয় তাই পান করা যায় না। পোশাক নয়। তাই পরিধান করা যায় না।

বিপরীত লিঙ্গের কোনো মানুষ নয় তাই সেসবের সাথে বিবাহের বন্ধন সৃষ্টি করা যায় না। আসলে কয়েক টুকরো পাথর ও সোনা রূপা মৌলিকভাবে একই জিনিস। তবে সোনা রূপা দ্বারা যেহেতু উদ্দিষ্ট বস্তু অর্জন করা যায় তাই প্রস্তর খণ্ডকে সবাই ছুড়ে ফেললেও স্বর্ণ রৌপ্যের মতো দ্রব্যকে তারা অর্জন করতে চায়।

এমনিভাবে সম্মানও সবাই অর্জন করতে চায়। কারণ সোনা রূপা, দিনার দিরহাম দিয়ে যেমন প্রার্থিত বস্তু অর্জন করা যায় তেমনি সম্মান থাকলে মানুষের সব চাহিদাই পূরণ হয়।

এই কথা থেকে বোঝা গেলো, স্বর্ণ প্রীতি ও সম্মান প্রীতি উভয়টার কারণ এক। তবে সম্মানের প্রতি মানুষের ঝোঁক বেশি থাকার কারণে একে সম্পদের ঊর্ধ্বে স্থানে দেওয়া হয়েছে।

তিন দিক থেকে সম্মানী ব্যক্তি সম্পদশালীর ওপর প্রাধান্য পায়

এক. সম্পদ দিয়ে সম্মান অর্জন করার চেয়ে সম্মান দিয়ে সম্পদ অর্জন করা অনেক সহজ। একজন জ্ঞানী কিংবা দুনিয়াবিমুখ একজন মানুষ, মানব সমাজে যাকে সবাই সম্মানের চোখে দেখে সে যদি কখনো, কোনো সময় সম্পদ অর্জন করতে চায় সহজেই সে সম্পদশালী হতে পারবে। কারণ যাদের সম্পদ আছে তারা সম্মানী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করে এবং তার গুণগত পূর্ণতার দিকে লক্ষ করে তার অনুগত হয়ে থাকে।

কিন্তু একজন লোক, যার স্বভাব চরিত্র অনেক দিক থেকে মন্দ, সমাজে যাকে কেউ সম্মান করে না, সে যদি অঢেল টাকা ব্যয় করে সম্মান অর্জন (কিংবা উপার্জন) করতে চায়, কাজটি তার জন্য কোনো দিক থেকেই সহজ হবে না। মানুষের মনে সম্মানের আসনে সে উপবিষ্ট হতে পারবে না।

এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সম্পদ উপার্জনের মাধ্যম ও হাতিয়ার হলো সম্মান অর্জন। মানুষের মনে যার প্রতি সম্মানবোধ আছে ধরে নিতে হবে সে সম্পদশালী হয়ে গেছে। অন্যদিকে যার অঢেল সম্পদ আছে সে যে সবসময় সম্মানী হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

এদিক বিবেচনায় মানুষের মনে সম্মান লাভের প্রতি বেশি ঝোঁক থাকে।

দুই. সম্পদ মানুষ যা উপার্জন করে, চাই তা স্থাবর হোক কিংবা অস্থাবর, হারিয়ে যাওয়া বা ছিনিয়ে নেওয়ার ভয় থাকে। ভয় থাকে অত্যাচারি

শাসকের লোভাতুর দৃষ্টির। তাই সম্পদ পাহারা দেওয়ার জন্য দরকার হয় কোষাগার, প্রহরী, হিসাব রক্ষক। তারপরও আর বিপদ আর বিপদ।

অন্যদিকে মানুষ যখন অন্যদের অন্তরের রাজাসনে উপবিষ্ট হয় সবার চোখে সে যখন সম্মানিত হয়ে ওঠে তার সব কিছু থাকে। কিন্তু হারানোর ভয় থাকে না। সম্মান হলো সবচেয়ে প্রাচীন সুদৃঢ় ভাণ্ডার চোর-ডাকাতের হাত সে পর্যন্ত পৌছতে পারে না। হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। বল প্রয়োগ করে অন্য কারও ছিনিয়ে নেওয়ারও ভয় থাকে না।

মানুষের অর্জিত সবচেয়ে স্থায়ী সম্পদ হলো (বাড়ি ও জমির মতো) স্থাবর সম্পত্তি কিন্তু কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না এগুলো তার কাছে কতদিন থাকবে। যে কোনো সময় শক্তিমান কেউ তার কাছ থেকে এসব ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই সার্বক্ষণিকভাবে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়।

কিন্তু কেউ যদি সম্মানের মতো হৃদয় সম্পদ অর্জন করতে পারে। সে চোরের উপদ্রব, ডাকাতের হঠকারিতা থেকে সব সময়ের জন্য মুক্ত হয়ে যাবে।

তবে হ্যাঁ, মানী লোক যে কখনো সম্মান হারায় না এমন নয়। কখনো কখনো সম্মানী লোকও সম্মানহারা হয়ে যায়। কেউ যদি সমাজের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায়। তার অবস্থার যদি অবনতি ঘটে, মানুষ যে বিশ্বাসে তাকে সম্মানের চোখে দেখতো সে যদি তা হারিয়ে ফেলে তাহলে তার মধ্য থেকে সম্মানের বিলোপ ঘটবে। তখন আর তার পক্ষে সম্মান অর্জন করা সহজ হবে না।

তিন. মানুষ অযথাই বিভিন্ন বস্তুর পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়, শ্রান্ত হয়। তার মনে কঠোরতা জমা হয়। কিন্তু সেই মানুষটিই যখন অন্য কারও মধ্যে পূর্ণতা খুঁজে পায়। হৃদয় দিয়ে তার গুণগত পূর্ণতার বিশ্বাস করতে শুরু করে, তখন পূর্ণ হৃদয়বানের প্রশংসা করে এবং অন্যকে তার প্রশংসা শোনায়, চারদিকে তার প্রশংসা ছড়িয়ে দেয়। এভাবে একজন দুজন করে মানী ব্যক্তির সম্মানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে যে সম্পদশালী, নিজের সম্পদ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কষ্ট করা ছাড়া সম্পদকে তারা বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে না। অন্যদিকে সম্মান সবসময় নিজে থেকেই ছড়ায়। তার বিস্তৃতির পথ রোধ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার সম্পদ এক স্থানে স্থির হয়ে থাকে।

অতএব সম্মানের মাহাত্ম্য, সুখ্যাতির বিস্তৃতি ও খ্যাতি প্রশংসার তুলনা করলে সম্পদের চেয়ে সম্মানের অবস্থান অনেক উর্ধ্বে। তাই মানুষ সম্পদের চেয়ে সম্মান অর্জনে আগ্রহী বেশি হয়।

এই হলো সামগ্রিকভাবে সম্পদের উপর সম্মানকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ। তবে যদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় তাহলে এর কারণ আরও অনেক বেড়ে যাবে।

একটি আপত্তি ও তার জবাব

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, সম্পদ কিংবা সম্মান বিষয়েই আপত্তি আসতে পারে। তাহলে কি করে মানুষ সম্মান ও সম্পদের পেছনে ছোটে?

মানুষ যতটুকু প্রয়োজনে কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জন ও ক্ষতিকারক বিষয় বর্জন করে তা আমাদের সবার জানা। যেমন মানুষের মৌলিক চাহিদা হিসেবে তার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। তেমনি কেউ অসুস্থ হলে কিংবা শাস্তির মুখোমুখি হলে সম্পদ ও সম্মানের মাধ্যমে এর থেকে সে বেঁচে আসতে পারে। কাজেই এখান থেকে সম্পদ ও সম্মানপ্রীতির কারণ জানা গেলো। অর্থাৎ যাকে মাধ্যম করে প্রার্থিত বস্তু হাসিল করা যায় বান্দার কাছে তাও প্রার্থিত হয়ে যায়। এর পেছনে প্রকৃতির অদ্ভূত খেয়াল কাজ করে। আর তা হলো, মানব মনে সম্পদের প্রতি আকর্ষণ, তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ জমা করার কামনা বিদ্যমান থাকে। এমনকি কোনো ব্যক্তিকে যদি দুই গ্রাম স্বর্ণ দেওয়া হয় তাহলে সে তৃতীয় আরেকটা স্বর্ণের গ্রাম পাওয়ার জন্য লোভাতুর হয়ে উঠবে।

এমনিভাবে মানুষ সম্মান বৃদ্ধি কামনা করে। সে দূরদূরান্ত পর্যন্ত নিজের সুনাম ছড়িয়ে দিতে চায়। চায় সবাই তাকে চিনুক। জানুক। সবাই তার কাছে উপঢৌকন পাঠাক। তার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা কারও পক্ষে এই পরিমাণ সম্মান অর্জন করা সম্ভব না হলেও সে কল্পনার এই স্তরের কথা ভাবে এবং মনে মনে স্বাদ অনুভব করে।

আর এ বিষয়টি মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যেই প্রোথিত থাকে এবং সে এটাও জানে যে, এগুলো কল্পবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। আর কল্পবিলাস মানুষকে না দুনিয়া না আখেরাতে কোথাও উপকার দেবে না।

এই আপত্তির জবাবে আমরা বলবো, উপরে বর্ণিত সম্পদ ও সম্মানপ্রীতি থেকে কোনো মানুষই মুক্ত নয়।

এর পেছনে দুটি কার্যকর কারণ রয়েছে

একটা কারণ প্রকাশ্য। সর্বজনবিদিত। মানুষের মনে এসবের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির পেছনে যা সবচেয়ে বড় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। এতে এই কারণটা খুবই সূক্ষ্ম। এমনকি অবোধ তো দূরের কথা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কারণ বিষয়টিতে আলোচনা করা হয়েছে নফসের সূক্ষ্মতম বিষয়, স্বভাবের গভীরে প্রবৃষ্ট প্রকৃতি নিয়ে যা স্বপণ্ডিত ও জ্ঞানের আধার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

প্রথম কারণ : সম্পদ ও সম্পদপ্রীতির প্রথম কারণ হলো, মনে নিঃস্বতার আতঙ্ক ও মন্দ ভাবনা ঘুরতে থাকে। আর মানুষ কোনো এক স্থানে বা অবস্থানে স্থির হয়ে বসতে চায় না। তার চোখে সর্বদা বড় বড় স্বপ্ন ভাসে। তার মনে হতে থাকে তার যে সম্পদ আছে একদিন হয়তো তা ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তাকে প্রবল সংকটে ভুগতে হবে। তাই তাকে আরও বেশি সম্পদ উপার্জন করতে হবে। এই ভাবনা যখন তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয় তখন সে সম্পদ উপার্জনের আরেকটা পথ বের করার আগ পর্যন্ত স্বস্থি পায় না।

মানুষ সবসময় নিজের প্রতি দয়া ও সম্মানের প্রতি ভালোবাসার কারণে ভাবে, সে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তার অনেক কিছুর প্রয়োজন হবে, প্রয়োজনের ভারে তার কাধ ন্যুব্জ হয়ে পড়বে। তার সম্পদের উপর বিভিন্নভাবে আপদ বিপদ নেমে আসবে। এই সব অলীক অনুমান তার মনে আতঙ্কের জন্ম দেয়। তখন সে বাড়ি বাড়ি সম্পদ জমিয়ে মনের কোণে বাসা বাধা ভয়কে উচ্ছেদ করতে সহায়তা করে। যাতে তার সম্পদের কিছু অংশে বিলোপ হয়ে গেলেও সে যেনো অসচ্ছল হয়ে না পড়ে।

এতটুকু সম্পদ হলে এই আতঙ্ক দূর হবে এর নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। তাই কোনো ব্যক্তির পক্ষে দুনিয়ার সব সম্পদ উপার্জন করা সম্ভব হলে সে তাই করতো। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوْمٌ فِيْ الْعِلْمِ وَمَنْهُوْمٌ فِي الْمَالِ.

দুই জিনিসের পিপাসায় যে কাতর সে কখনো তৃপ্ত হবে না। এক. যে ইলম অর্জনে নিমগ্ন। দুই. যে সম্পদের লালসায় প্রলুব্ধ। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১ : ৯২)

মনের গভীরে জমে থাকা এই ভয়ের কারণে মানুষ নিজের খ্যাতিকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে দিতে চায়। চায় কাছের মানুষও তার পরিচয় সম্বন্ধে অবগত হোক। কারণ, অবচেতন মনে হলেও মানুষের মনে এই আতঙ্ক থেকে যায় যে, কখনো তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। তাকে চলে যেতে হবে দূর কোনো দেশে। তখন যদি তার খ্যাতি ও পরিচয় না থাকে তাহলে সে অবস্থান করবে কোথায়? এই দিক বিবেচনা করে এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষ জগৎজোড়া সুখ্যাতি কামনা করে। জীবনে কারও বাসস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না বলে কেউ নিশ্চয়তা লাভ করে তারপরও সে আত্ম-স্বস্থি লাভ করার জন্য নিজের সুখ্যাতির বিস্তার কামনা করে।

দ্বিতীয় কারণ : সম্পদ ও খ্যাতি লোভের যে কারণ পূর্বে বলা হয়েছে তার চেয়ে এখানে বিবৃত কারণটির শক্তিমত্তা অনেক বেশি। নিচে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

মানুষের রূহ বা আত্মা হলো আল্লাহ তাআলার আদেশ যার উল্লেখ আল্লাহ কুরআনেও করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ.

(হে নবী!) তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৫)

এই আয়াতে রূহকে প্রভু সম্পর্কি একটি বিষয়ে বলার উদ্দেশ্য হলো একথা বোঝানো যে, রূহ হলো ইলমে মুকাশাফার একটি গোপন রহস্য। যার প্রকাশিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। রাসূলুল্লাহ (স)-ও এ বিষয়টি প্রকাশ করেননি।

তবে এই আলোচনার গভীরে প্রবেশ করার আগে কয়েকটি বিষয় জেনে নিতে হবে। মানুষকে অনেকগুলো দোষ-গুণের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে আহারবিহারের মতো পশুসুলভ গুণ। আছে আঘাত কষ্টদানের মতো হিংস্র দোষ। আছে ধোঁকা প্রতারণা প্রবঞ্চণার মতো শয়তানী চরিত্র। আছে বড়ত্ব অহম আত্মগর্বের মতো প্রভুত্বের গুণ। তেমনি মানুষের সৃষ্টিগত উপাদানের মধ্যে আছে আরও অনেক দোষ-গুণ। কারণ মানুষের সৃষ্টিগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে বৈচিত্রতা। অনেক উপদানের মধ্যে তার ভেতরে যেহেতু প্রভুত্বের চরিত্র রয়েছে তাই

স্বভাবগতভাবেই সে প্রভু সম্পর্কিত ও প্রভুত্বের বিষয়ের প্রতি মনের গভীর থেকে টান ও ঝোঁক অনুভব করে। প্রভুত্ব এই কথাটার অর্থ হলো— এককভাবে পূর্ণতা অর্জন ও নিজস্বভাবে এক সত্তায় অস্তিত্ব লাভ।

এই অর্থের ভিত্তিতে জানতে পারলাম যে। পূর্ণতা বা কামালিয়্যাত হলো স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত একটা গুণ। কারণ অস্তিত্বের মাঝে অংশিদারত্ব পূর্ণতাকে ত্রুটিযুক্ত করে তোলে। বিতরণকারী সূর্যের অনন্যতা। কারণ আলোকে বিতরণের ক্ষেত্রে জগৎ জুড়ে যদি দুটো সূর্য বিদ্যমান থাকতো, তাহলে সূর্যকে নিজ গুণে পূর্ণতা অর্জনকারী অনন্য সেতারা বলা হতো না।

সত্তাগতভাবে ও এককভাবে অস্তিত্বসম্পন্ন সত্তা হলেন আল্লাহ। অস্তিত্বলাভের তাঁর ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার নেই। কারণ তিনি ছাড়া বিপুল এই মহাবিশ্বে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর কুদরত ও সক্ষমতার নিদর্শন। যেগুলোর সত্তাগতভাবে কোনো অস্তিত্ব নেই। বরং তা আল্লাহর কুদরতের মাধমে অস্তিত্বে আসে।

কাজেই মহাবিশ্বে আল্লাহর সাথে অস্তিত্বে আসা কোনো সত্তা নেই। কারণ একই সাথে দুটি বস্তু বা সত্তা অস্তিত্বে আসলে তাদের মর্যাদা সমান হওয়া আবশ্যক হয়। আর দুটি বস্তুর মর্যাদা সমান হলে পূর্ণতা গুণের মধ্যে অসম্পূর্ণতা চলে আসে।

কাজেই দিগন্তে দিগন্তে সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণ সূর্যের গুণকে অসম্পূর্ণ করে না। বরং এ আলোর বিচ্ছুরণ সামগ্রিকভাবে সূর্যের পূর্ণতারই একটি গুণ। কিন্তু সমানভাবে উজ্জ্বল দুটি সূর্য যদি কোনো দিন আকাশে উদয় হয়, তাহলে সেটা হবে সূর্যের জন্য অপূর্ণাঙ্গতা।

এই দিক বিবেচনায় মহাবিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার কুদরতেরই সাক্ষ্য বহন করে। তাই কোনো সৃষ্টিই আল্লাহর সমগুণ সম্পন্ন নয়। বরং আল্লাহর সৃষ্টিও তার অনুগামী বস্তু।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেলো যে, রুবুবিয়্যাত বা প্রভুত্বের অর্থ হলো অস্তিত্বের একত্ব। যা পূর্ণতার পূর্ণাঙ্গ রূপ। আর এদিক থেকে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে পূর্ণতার একত্ব অর্জনের স্বপ্ন দেখে। এই দিক বিবেচনা করে জনৈক সুফি বুযুর্গ বলেন— ফেরআউন বলেছিলো, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। (সূরা নাযিয়াত : ২৪)

-সব মানুষের অন্তরে এমন কথা লুকায়িত থাকে। কিন্তু সে এই মনোভাব প্রকাশ করার সুযোগ পায় না। (সুযোগ থাকলে তার মুখ থেকে অবশ্যই প্রভুত্বের দাবী উচ্চারিত হতো।)

কথাটি সত্যিই যথার্থ কারণ, অন্যের দাসত্ব করাকে মানুষ নিজের উপর চাপানো বোঝা মনে করে। আর প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অন্যের উপর কর্তৃত্ব করতে ভালোবাসে। কারণ তার মধ্যে আছে প্রভুত্বের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। কিন্তু মানুষের পক্ষে যেহেতু সার্বিক পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয় না, তবুও সে মন থেকে পূর্ণতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বাদ দিতে পারে না। সে পূর্ণতা চায়। পূর্ণতার স্বাদ উপভোগ করার ইচ্ছা তার হয়। এছাড়া পূর্ণতার ভিন্ন কোনো অর্থ নেই। সব অস্তিত্বমান বস্তুই আপন সত্তাকে ভালোবাসে। সত্তার পূর্ণতাকে ভালোবাসে। অস্তিত্বহীন হয়ে সে ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করে। পূর্ণতার বিলুপ্তির আশঙ্কায় থাকে।

আসলে সকল অস্তিত্বমান বস্তুর উপর এককভাবে কর্তৃত্ব করতে পারা এবং নিজ সত্তা থেকে অন্য কারও অস্তিত্ব সৃষ্টি হওয়াই হলো বড় পূর্ণতা। তোমার থেকে যদি কারও অস্তিত্ব সৃষ্টি নাও হয় তাহলে নিদেনপক্ষে তার উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখা।

এই দিক বিবেচনায় প্রকৃতিগতভাবে মানুষ কৃর্তৃত্ব করতে পছন্দ করে। কারণ এটা পূর্ণতারই একটি অংশ।

সকল মানুষই তার সত্তা সম্পর্কে সচেতন। কারণ সে আপন সত্তাকে, সততার পূর্ণতাকে, উপভোগ করতে পছন্দ করে।

ইসতিলা আলাশ শাই, অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর কর্তৃত্বের সক্ষমতা রাখার অর্থ হলো বস্তুকে প্রভাবিত করা। বস্তুর মধ্যে ইচ্ছামতো পরিবর্তন সাধন করতে পারা। বস্তু তার অনুগত হয়ে তার কথামতো চলা। তাই মানুষ চায় তার আশপাশে যত বস্তু আছে সবাই তার আপনে থাকুক। তবে অস্তিত্বমান বস্তু তিন প্রকার

১. সত্তাগতভাবে যে পরিবর্তন গ্রহণ করবে না। সেগুলো হলো আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলি।
২. যা পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু তার উপর বান্দার কর্তৃত্ব চলে না। যেমন মহাকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, দিক-দিগন্ত, ফেরেশতা জিন-শয়তানের সত্তা, সাগর মহাসাগর, পাহাড়পর্বত ইত্যাদি।

৩. বান্দা যার উপর প্রভাব খাটাতে পারে ও কর্তৃত্ব করতে সক্ষম। যেমন জমিনের বিভিন্ন অংশ ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ। ভূপৃষ্ঠে জন্ম নেওয়া গাছপালা তরুলতা, পশু প্রাণি। সর্বোতভাবে মানুষের হৃদয়। কারণ মানুষ ও প্রাণি দেহের মতোই মানুষের হৃদয় ও পরিবর্তনের যোগ্যতা রাখে।

এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, অস্তিত্বমান বস্তু মূলগতভাবে দুই ধরনের হয়ে থাকে। যার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যায়। যার মধ্যে পরিবর্তন করা যায় না। অপরিবর্তিত বস্তুর উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করেছি আল্লাহর সত্তা ফেরেশতাকুল মহাকাশ। কিন্তু এসব বস্তু পরিবর্তনহীন জেনেও মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। বরং এসব ক্ষেত্রে নিজের জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে, তার ভেদ ও রহস্য সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চেয়েছে। কারণ অনুমান নির্ভর জ্ঞানও নিশ্চিত জ্ঞানের মতোই হয়ে থাকে। আর এমন কিছুর জ্ঞানার্জনকারীকে প্রভাবকও বলা হয়। এই দিক বিবেচনায় মানুষ স্রষ্টা, ফেরেশতা জগৎ, গ্রহনক্ষত্র ও মহাকাশের সকল অজানা ও রহস্যাবৃত ঘটনা সম্পর্কে জানতে উৎসাহি হয়। কারণ জানাটাও এক ধরণের কর্তৃত্ব আর কর্তৃত্ব পূর্ণতারই একটা অঙ্গ।

উদাহরণ দিলে হয়তো বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে আসবে। মানুষ অদ্ভুত কোনো শিল্প কর্ম দেখে মুগ্ধ হয়। তার ভালো লাগে। কিন্তু তার পক্ষে যায়না এমন কোনো কর্ম সৃষ্টি করা অসম্ভব মনে করে তখন সে এটা তৈরির কৌশল শিখে নিতে চায়। কেউ যখন দাবা খেলতে ব্যর্থ হয়, তখন সে দাবার ঘুটির চালগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে চায়। মানুষ যখন সুন্দর কোনো স্থাপনা দেখে মুগ্ধ হয় এবং বুঝতে পারে তার দ্বারা এমন কিছু নির্মাণ অসম্ভব, তখন সে এমন স্থাপনা নির্মাণের কৌশল শিখে নেয়। তাই মানুষ কোনো কিছু করতে ব্যর্থ হলে কষ্ট পায়। আর সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে আনন্দিত হয়।

অস্তিত্বমান বস্তুর দ্বিতীয় প্রকার হলো, মাটির সাথে সম্পর্কিত বস্তুসমূহ। মানুষ যার উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। এক্ষেত্রে সব মানুষেরই মনোবাসনা থাকে যে, ভূ পৃষ্ঠের সব কিছুই তার কথা মতো চলবে এবং তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

মানুষ কর্তৃত্ব করতে সক্ষম এমন বস্তু আবার দুই প্রকারের।

১. যার নির্দিষ্ট দেহ কাঠামো রয়েছে। যেমন, দিনার দিরহাম টাকাপয়সা। বিলাস উপকরণ ইত্যাদি। মানুষ চাইলে এগুলো নিজের কাছে রাখতে

পারে। আবার অন্যকে দান করতে পারে। ইচ্ছে হলে ফেলেও দিতে পারে। অর্থাৎ, এসব বস্তু মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে ব্যবহার করতে পারে। এটাকে বলে সক্ষমতা। আর সক্ষমতাই হলো পূর্ণতা। আর পূর্ণতা হলো প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বভাবগতভাবে মানুষ অন্যের উপর প্রভুত্বের দাবী করে থাকে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা না থাকলেও মানুষ সম্পদ উপার্জনে আগ্রহী হয়। এটা তার মনের তাড়না। এই দিক বিবেচনা করে সে মানুষকে জোড়জুলুম করে ক্রীতদাস বানায়। যদিও তাদের মনের রাজা সে হতে পারে না। তবুও তাদের দেহ কাঠামোকে তারা যথেচ্ছা ব্যবহার করে। তবে অনেক সময় শুরুতে মন কর্তৃত্বকারীর পূর্ণতা মেনে নিতে চায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মনে পূর্ণতার বিশ্বাস জন্মে এবং তার অন্তরকে বশ করে নেওয়া।

২. যার নির্দিষ্ট দেহ কাঠামো নেই। যেমন মানুষের নফস ও তার কলব। এ দুটি বস্তু ভূপৃষ্ঠের সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। মানুষ মাত্রই অন্যের মনের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। হৃদয়কে তার হাতের পুতুল বানাতে চায়, ইচ্ছার অধীন বানাতে চায়। কারণ তাতে রয়েছে কর্তৃত্বের পূর্ণতা, প্রভুত্বের গুণের মিশ্রণ। মানবহৃদয় ভালোবাসা দিয়ে জয় করা যায়। আর অন্যের মধ্যে পূর্ণতার প্রভাব পরিলক্ষিত হলেই মানুষের মনে ভালোবাসা বোধের জন্ম হয়। কারণ পূর্ণতা হলো প্রভুর গুণ। তার প্রভুর যতগুলো গুণ রয়েছে সবগুলো প্রকৃতিগতভাবে মানুষ পছন্দ করে।

কারণ মানুষের দেহ কাঠামোর মধ্যে প্রভুর সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় রয়েছে, যার কখনো মৃত্যু ঘটে না, যা কখনো মাটির সাথে মিশে যায় না। তা হলো মানবমন যা ইলম ও ঈমানের আধার। যা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বিগত জীবনের হিসেবে দেবে। সেটা হলো মানুষের রূহ।

এতসব আলোচনার দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, খ্যাতি ও সম্মানের অর্থ হলো, এই হলো মানুষের মন জয় করে নেওয়া।

আর যে ব্যক্তির মধ্যে অন্যের অন্তরকে বশ করে নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে সে তাদের উপর রাজত্য করতে পারবে। আর অন্যের হৃদয়ের উপর রাজত্ব করা পূর্ণতার মাধ্যম হওয়ার কারণে প্রভুত্বের অংশ।

কাজেই প্রকৃতিগতভাবে মানুষ মন, জ্ঞান ও পারঙ্গমতার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে চায়। আর সম্পদ ও সম্মান হলো পারঙ্গমতারই একটা অংশ।

জ্ঞানের কোনো সীমাপরিসীমা নেই। যতই সে শিখুক আগ্রহ দমিত হবে না কখনো এবং না জানার পরিবর্তন সে কমিয়ে আনতে পারবে না।

তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, চির তৃষিত দুই বস্তুকে কখনো তৃপ্ত করা যায় না। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১ : ৯২)

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, অন্তর ইলম ও মারিফাত, কুফর ও পারঙ্গমতার দ্বারা পূর্ণতা অর্জন করতে চায়। এক্ষেত্রে স্তরভিন্নতা গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়। ফলে মানুষ জীবনে যতটুকু পূর্ণতা অর্জন করতে পারে তার স্বাদই সে উপভোগ করে যায় জীবনভর।

তাই প্রীতির পেছনে প্রচ্ছন্ন কারণ হলো, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ। কারণ এটি এমন একটি ইল্লত, প্রবৃত্তি না থাকলেও যার চাহিদা থেকেই যাবে। তাই অনেক সময় মানুষকে এমন জ্ঞান চর্চা করতে দেখা যায়, যা তার উদ্দেশ্য পূরণের সাথে সামঞ্জস্যতা পূর্ণ নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তার পেছনেই নিজের জীবন যৌবন, স্বাদআহ্লাদ সব বিসর্জন দিয়ে দেয়। তবে মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি চায় সে এমন বিষয়ে ইলমের চর্চা করুক যা দ্বারা সে অনেক রহস্যের জট খুলতে পারবে। আশ্চর্য সব বিষয়ে অবগত হতে পারবে। কারণ এটা একটা গুণ অর্থাৎ পূর্ণতারই একটা অংশ। তাই তার স্বভাব প্রকৃতি এটা অর্জনের পেছনে ধাবিত হতে চায়।

তবে জ্ঞান ও পারঙ্গমতাপ্রীতির মধ্যেও কিছু ত্রুটি রয়ে যায়, যার বিবরণ তুলে ধরা অত্যাবশ্যকই বটে।

বাস্তব পূর্ণতা ও ধারণা প্রসূত পূর্ণতার বিবরণ

এর পূর্বের অলোচনায় বলা হয়েছে মানুষের পক্ষে যেহেতু এককভাবে অস্তিত্বে বিদ্যমান হয়ে পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই সে দুই ভাবে পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। জ্ঞানের মাধ্যমে ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে। আমরা এখন পূর্ণতার প্রকরণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

তাই শুরুতেই বলে রাখা জরুরি যে, প্রকৃত যে পূর্ণতা তা অনেক ক্ষেত্রেই ধারণাপ্রসূত পূর্ণতার সাথে গায়ে গায়ে মিশে থাক।

আর এখানে আমরা পূর্ণতার দুই ক্ষেত্র অর্থাৎ বাস্তবপূর্ণতা ও ধারণাপ্রসূত পূর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

আল্লাহর ইলম তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণ

১. জ্ঞানের আধিক্য ও বিস্তৃতি। কারণ তিনি যাবতীয় জ্ঞানের আধার। তাই বান্দার জ্ঞান যখনই প্রাচুর্য পায়, তখন সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

২. জ্ঞাত বিষয়টি পূর্ণ রূপে বিকশিত হওয়া। কারণ জ্ঞাত বিষয়সমূহ আল্লাহ তাআলার সামনে পূর্ণভাবে বিকশিত। তিনি সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত। কখনো কখনো বান্দার সামনেও ইলম হয়ে ওঠে সুস্পষ্ট সুনিশ্চিত সত্যমুখি ও জ্ঞাত বিষয়ের পরিধির সাথে সামঞ্জস্যশীল। তখন বান্দা আল্লাহর একান্ত কাছাকাছি চলে যায়।

৩. পরিবর্তনহীন ও স্থায়ীভাবে ইলমের অধিকারী হওয়া। আল্লাহ তাআলার ইলম চিরস্থায়ী। কোনো দিন তাতে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা নেই। আর বান্দা কখনো কখনো এমন নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে যে, তার জ্ঞানের মধ্যে কখনোই কারও সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন হয় না। তখন বান্দা আল্লাহর একান্ত কাছাকাছি চলে যায়।

জ্ঞাত বিষয় দুই ধরনের। ১. পরিবর্তন যোগ্য জ্ঞান, ২. শাশ্বত জ্ঞান।

পরিবর্তনযোগ্য জ্ঞান হলো। কেউ বললো যে, যায়েদ এখন ঘরের ভেতরে আছে। তার এই বক্তব্য থেকে যায়েদের ঘরের ভেতরে থাকার তথ্য জানা গেলো। তবে হতেও পারে যে, যায়েদ ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। সে এখন ঘরে নেই। তখন তোমার যায়েদের ঘরে থাকার ধারণাটা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। সেটাকে আর জ্ঞান হিসেবে পূর্ণতা বলা যাবে না। বরং অজ্ঞতা হিসেবে অপূর্ণতা বলতে হবে। তাই এমন সব জ্ঞান যা একভাবে ও অন্যভাবে হওয়ার সম্ভাবনাও রাখে, তখন তোমার ধারণার বিপরীতে বাস্তবতা থাকলে তোমার জ্ঞানের পূর্ণতা অপূর্ণতায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তুমি জ্ঞানী থেকে মূর্খে পরিণত হবে।

উপরে বলা কথাগুলো নিছক একটা উদাহরণ মাত্র। আর এই মত হবে জগতের সমস্ত পরিবর্তনযোগ্য জ্ঞানের উদাহরণ। যেমন, পাহাড়ে উচ্চতা, জমিনের বিস্তৃতির পরিধি, পৃথিবীতে দেশের সংখ্যা, তাদের পরস্পরের দূরত্ব এবং রাজা-বাদশাহদের বিভিন্ন ঘটনা পবিরর্তন যোগ্য জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে ভাষাগত জ্ঞান একটা পরিবর্তনযোগ্য জ্ঞান। কারণ যুগ জাতি ও অভ্যাসের পরিবর্তণের কারণে ভাষার ব্যবহারেও পরিবর্তন হয়। এসব জ্ঞান

হলো পারদের প্রলেপের মতো, শুনে শুনেই তাদের অবস্থান বদলায়। কাজেই এই জ্ঞান অর্জন করে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ণতার জ্ঞান অর্জন করা যায়। কিন্তু অবস্থা পরিবর্তনের সাথে তার জ্ঞান অজ্ঞতায় পরিণত হয়ে যায়।

শাশ্বত জ্ঞান হলো এমন জ্ঞান যা বৈধকে বৈধ করে। অসম্ভবকে সম্ভব করে। ইলমের এসব প্রকার আল্লাহর সিফাত মারেফাত ও কর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আল্লাহ তাআলা, তাঁর সিফাত, তাঁর কর্মপদ্ধতি, আসমান জমিনে তাঁর রাজত্ব পরিচালনার নীতি, দুনিয়া-আখেরাতের বিন্যাস এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হলো বাস্তবজ্ঞানে। বান্দা এসব গুণ অর্জন করতে পারলে সে হবে আল্লাহর নৈকট্যভাজন। তখন সে দুনিয়াতে তো পূর্ণতা অর্জন করবেই, মৃত্যুর পরেও তার পূর্ণতাগুণ অবশিষ্ট থাকবে। মৃত্যুর পরে তার এই ইলম, তার মারেফাত হবে তার জন্য নূরের মতন। যা তার সামনের দিক ও ডান দিককে আলোকিত করে তুলবে। সে বলবে, প্রভু, আমার নূরকে পূর্ণ করে দাও।

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

যার নিচ দিয়ে বয়ে যাবে নদনদী। সেদিন আল্লাহ লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং তাঁর মুমিন সঙ্গীদের। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা তাহরিম : ৮)

অজানা অনেক বিষয় জানার জন্য দুনিয়াতে আল্লাহর মারেফাত হলো মূলধন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কারও কাছে যদি কোনো প্রদীপ থাকে তাহলে সে অন্য কোনো প্রদীপ থেকে আলো গ্রহণ করে নিজের চারপাশকে আরও আলোকিত করে তুলতে পারবে। কিন্তু এমন যদি হয় তার কাছে কোনো প্রদীপই নেই তাহলে সে আলো জ্বালাবে কি দিয়ে। কাজেই যার কাছে আল্লাহর মারিফাতের মূলধনই নেই— তার কাছে অজানাকে উদঘাটন করার জন্য কোনো আলোই নেই। সে অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হতে থাকবে। যে অন্ধকারের বিবরণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে দিয়েছেন এভাবে—

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ.

অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, আঁধারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা একেবারেই দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতিই নেই। (সূরা নূর : ৪০)

আগের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহর মারেফাত হলো সকল সৌভাগ্যের উৎস।

এছাড়া জ্ঞানের অন্য যত শাখা উপশাখা রয়েছে তার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। কোনো কোনো জ্ঞান আছে মৌলিকভাবেই যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। যেমন কাব্যজ্ঞান। বংশবিদ্যা ইত্যাদি।

জ্ঞানের কিছু শাখা আছে এমন যেগুলো আল্লাহর মারেফাত অর্জনের পথে সহায়ক হওয়ার কারণে কল্যাণকর হয়। যেমন আরবি ভাষা শিক্ষা। কারণ তা কুরআনের তাফসির বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

তারপর তাফসির শাস্ত্র, কারণ কুরআনে তাযকিয়ায়ে নফসের সহায়ক যেসব ইবাদত ও আমলের কথা বলা হয়েছে তাফসিরের মাধ্যমে সেগুলো জানা যায়। আর তাযকিয়ায়ে নফসের দ্বারা আল্লাহর মারেফাত গ্রহণের জন্য মত তৈরি হয়। যেমন আল্লাহ বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا.

যে নিজেকে শুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয়। (সূরা শামস : ৯)

তিনি আরও বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

যারা আমার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন। (সূরা আনকাবূত : ৬৯)

তাই এসব ইলম হলো আল্লাহর মারেফাত অর্জনের মাধ্যম।

পূর্ণতা লাভের অর্থ হলো আল্লাহর মারেফাত সম্পর্কে অবগত হওয়া। তার গুণাবলি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। অস্তিত্বমান সকল বস্তুর জ্ঞান লাভ করাও এর মধ্যে শামিল। কারণ এসব কিছুই আল্লাহর কর্মকাণ্ডের মধ্যে শামিল। সুতরাং কেউ যদি মনে এই বিশ্বাস আনতে পারে যে, এই বিশাল মহাবিশ্বে যা কিছু অস্তিত্বমান, সবকিছুই আল্লাহর কর্মের অংশ, এবং সব কিছু আল্লাহর হুকুমের সাথে যুক্ত তাহলে ব্যক্তির জন্য এটা হবে তার মারিফাত লাভের পূর্ণায়ণ।

এই হলো ইলমের পূর্ণতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। খ্যাতিপ্রীতিও লৌকিকতা অধ্যায়ে এই আলোচনা কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে জানি না। কিন্তু পূর্ণতার প্রকার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই আলোচনা করা আবশ্যক ছিলো।

কুদরতের বিবরণ

মানুষের পক্ষে ইলমে হাকিকি অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু কুদরতে হাকিকি অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ কুদরতে হাকিকি একমাত্র আল্লাহর অধিকারভুক্ত বিষয়। বান্দার ইচ্ছা, ক্ষমতা ও কর্মের কারণে যেসব ঘটনা ঘটে, তার মূল সুতো থাকে আল্লাহর হাতে। তিনি ঘটান। তাই ঘটনা ঘটে। যেসব বিষয়ের বিবরণ আমি ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা অধ্যায়ে বিবৃত করেছি। তাই মৃত্যুর পরে জান্নাতলাভের মাধ্যমে কামালে ইলমের প্রভাব বাকি থাকবে। অন্য দিকে বান্দার দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্য কামালে কুদরতের কোনো ভাগ নেই।

অবস্থার প্রেক্ষিতে কামালে কুদরত মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। তখন সেটা হবে কামালে ইলম অর্জনের মাধ্যমে। যেমন শারীরিক সুস্থতা। হাত দিয়ে ধরার শক্তি। পা ফেলে সামনে হাঁটার শক্তি। বস্তু আকার আকৃতির ধরণ বোঝার জন্য ইন্দ্রিয় শক্তি। কারণ এসব শক্তি কামালে ইলমের হাকিকত অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সচল ও সুস্থ রাখতে দরকার স্বাস্থ্যকর খাবার, ভালো পোশাক ও নিরাপদ বাসস্থান। আর এসব অর্জন করার জন্য দরকার পর্যাপ্ত সম্পদ ও সম্মান কিংবা খ্যাতি। কিন্তু সম্মান ও সম্পদকে যদি আল্লাহর মারেফাত লাভের কাজে ব্যয় করা না হয় তাতে আদৌ কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না। সাময়িক কিছু স্বাদ তার মুখে আস্বাদিত

হতে পারে মাত্র। কিন্তু নিছক সম্পদ ও সম্মানকেই যারা পূর্ণতার সর্বোচ্চ পর্যায় মনে করে তারা স্বাভাবিকভাবেই বোকার স্বর্গে বাস করছে।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই ধোকার পেছনে ছুটে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের ধারনা দেহের ওপর কুদরতের পূর্ণতা নির্ভর করে গোলাম-বাদী ভৃত্য নওকরের বিস্তার, সম্পদের প্রাচুর্য ও মানুষের মন জয় করে তাদেরকে করায়ত্ব করে রাখার মাঝে। আর মানুষের মনে যখন বিশ্বাস জন্মে যে, এই হলো পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তর, তখন সে সম্মান ও সম্পদকে ভালোবাসতে শুরু করে। পর্যায়ক্রমে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ও ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে চলে যায়, এই বিষয়গুলো ঘটতে থাকে। তখন ইলম ও স্বাধীনতার মাধ্যমে আল্লাহর ও ফেরেশতাদের নৈকট্য লাভ করার অর্থাৎ কামালে হাকিকতের কথা ভুলে যায়।

স্বাধীনতার বিবরণ

ইলমের আলোচনায় আমরা আল্লাহর মারিফাত লাভ প্রসঙ্গে জেনে এসেছি। এখন আমরা স্বাধীনতা সম্পর্কে অবগত হবো। স্বাধীনতার অর্থ হলো, প্রবৃত্তির দাসত্ব ও দুনিয়ার ভাবনা চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং জোরপূর্বক এদের নিয়ন্ত্রণ করা। এরা হবে ফেরেশতাসদৃশ। প্রবৃত্তি যাদের প্রলুব্ধ করে না। ক্রোধ যাদের উন্মুক্ত করে না। কাজেই মনকে প্রবৃত্তি ও ক্রোধের সব প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা পূর্ণতার অংশ এবং ফেরেশতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ফেরেশতাদের চারিত্রক বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর পরিপূর্ণতার অন্য একটি গুণ পরিবর্তন ও প্রভাবকে গ্রহণ না করা। কাজেই যে ব্যক্তি পরিবর্তন ও প্রভাবিত হওয়ার দোষ থেকে মুক্ত, সে আল্লাহ তাআলার ততবেশি নিকটে থাকে, ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, আল্লাহর কাছে তার মর্তবা বেড়ে যায়। কামালে ইলম ও কুদরতের বাইরে একে তৃতীয় আরেকটি পূর্ণতার বিষয়ে বলা যায়। তবে আমরা একে পূর্ণতার প্রকরণের মধ্যে স্থান দেইনি। কারণ মৌলিকভাবে এটা শূন্যতা ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটা প্রকার। কারণ বিবর্তন একটা অপূর্ণাঙ্গ বিষয়। কোনো গুণের অনুপস্থিতি কিংবা বিলুপ্তির নাম হলো পরিবর্তন হওয়া। আর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া হলো কোনো কিছুর সত্তার মধ্যস্থ ত্রুটি।

কাজেই আমরা যদি প্রবৃত্তির মাধ্যমে পরিবর্তন হওয়া ও প্রবৃত্তির গোলামি না করাকে পূর্ণতা ধরি তাহলে বলতে হবে, পূর্ণতা বা কামালিয়্যাতের প্রকার তিনটি। ১. কামালে ইলম। ২. কামালে কুদরত। ৩. কামালে হুররিয়্যাহ। কামালে হুররিয়্যাত অর্থ হলো—

প্রবৃত্তির গোলামি না করা ও দুনিয়ার আসবাব অনুযায়ী পরিচালিত না হওয়া। আর কামালে কুদরত বলতে উদ্দেশ্য যে সক্ষমতা কামালে ইলম ও হুররিয়্যাত অর্জনের পথে সহায়ক হয়। তবে কামালে কুদরতের প্রভাব মৃত্যুর পরে বাকি থাকে না। কারণ তার সম্পদ ব্যায়ের সক্ষমতা ও অন্যের হৃদয়ে সৃষ্ট প্রভাব মৃত্যুর পরে আর থাকে না। কিন্তু ইলম ও হুররিয়্যত মৃত্যুর পরেও পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান থাকে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওসিলা হয়।

দেখুন অজ্ঞরা কীভাবে অন্ধের মতো সম্পদ ও সম্মান দ্বারা কামালে কুদরত অর্জনের পেছনে ছুটে যাচ্ছে। অথবা এটা এমন কামাল যার অর্জন হওয়ার বিষয়ে কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যদিও বা তা অর্জিত হয় কিন্তু স্থায়ী হয় না। আর তা উপেক্ষা করছে জ্ঞান ও স্বাধীনতার মতো দুটি পূর্ণতা অর্জনকারী বিষয় যা অনন্তজীবন তাকে সঙ্গ দেবে। এরাই হলো সেসব লোক যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার সওদা করেছে। ফলে তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে এবং তাদের অবকাশ দেওয়া হবে না। তারা সেসব লোক যারা আল্লাহর এই বাণীর মর্ম উপলব্ধিই করতে পারেনি।

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا.

ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি পার্থিবজীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট। (সূরা কাহফ : ৪৬)

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ، حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো এমন, যেমন আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারন করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ মনে করে তা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন হঠাৎ করে দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে তখন আমি তা কর্তিত ফসলের ন্যায় এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলি বিশদভাবে বিবৃত করি বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা ইউনুস : ২৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا.

তাদের নিকট পার্থিবজীবনের উপমা পেশ করুন, তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। তা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (সূরা কাহফ : ৪৫)

মৃত্যুর মাধ্যমে যেসব থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটবে তাই হলো পর্থিব জীবনের বাহ্যিক চাকচিক্য। আর মৃত্যুর পরও যার কল্যাণ বাকি থাকবে তাই হলো স্থায়ী কল্যাণের ভাণ্ডার।

এই আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, সম্মান ও সম্পদ দ্বারা যে কামালে কুদরত হাসিল হয় তা নিছক ধারণা প্রসূত। কাজেই এসবকে উদ্দেশ্য করে যে নিরলস খেটে যায় সে ধোঁকার হদ্দ ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রখ্যাত কবি আবুত তায়্যিব মুতানাব্বি (র) যথার্থই বলেছেন।

وَمَنْ يُنْفِقُ السَّاعَاتِ فِيْ جَمْعِ مَالِهٖ مَخَافَةَ فَقْرٍ فَالَّذِيْ فَعَلَ الْفَقْرُ.

দারিদ্র্যের ভয়ে যে দুহাতে সম্পদ কামাতে থাকে সে যেনো নিজের কাছে দরিদ্রতাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

তবে কেউ যথেষ্ট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তার কথা ভিন্ন।

আল্লাহ! যাদেরকে তাঁর কল্যাণ কর্মের তাওফিক দিয়েছেন এবং নিজ মহিমায় যাদের স্বীয় হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, আমাদেরকে তাদের দলে শামিল করে নাও।

খ্যাতির আসক্তিতে ভালো ও মন্দ

উল্লিখিত আলোচনা থেকে জানা গেল, খ্যাতির অর্থ অন্তরসমূহের মালিক হওয়া ও তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা। এর হুকুমও ধনসম্পদের মালিকানার হুকুমের মতোই। কেননা, যশ-খ্যাতিও দুনিয়াবী উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য, মৃত্যুর মাধ্যমে যার পরিসমাপ্তি ঘটে। যেহেতু দুনিয়া আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র, তাই দুনিয়াতে উৎপাদিত সামগ্রী থেকেই আখেরাতের সম্বল পাওয়া সম্ভব। সুতরাং পানাহার ও পোশাকের জন্য যেমন সামান্য অর্থসম্পদ প্রয়োজন, তেমনি মানুষের সঙ্গে জীবনযাপনের জন্যও অল্পবিস্তর খ্যাতির প্রয়োজন। খাওয়া দাওয়া বাস্তব জীবনের অন্যতম একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। প্রয়োজন মাফিক খাবার সংগ্রহ করা অথবা কেনার অর্থ সংগ্রহ করা এবং এগুলোকে প্রিয় মনে করা যেমন বৈধ, তেমনি খেদমতের জন্য একজন সেবক, সাহায্য-সহায়তার জন্য একজন সঙ্গী, পথপ্রদর্শনের জন্য একজন মুর্শিদ এবং দুষ্ট লোকের অনিষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একজন শাসক থাকাও বৈধ। সুতরাং মালিকের এ বিষয়কে প্রিয় মনে করা যে, সেবকের মনে তার এমন মাহাত্ম্য ও সম্মান থাকুক, যার ফলে সে খেদমত করতে উৎসাহী হয় কিংবা সফরসঙ্গীর অন্তরে এমন মর্যাদা থাকুক, যার ফলে সে সহযোগিতা থেকে বিরত না থাকে, অথবা মুর্শিদের মনে এমন আসন থাকুক, যার জন্য সে খুব ভালোভাবে পথপ্রদর্শন করে অথবা শাসকের মনে ইজ্জত থাকুক, যার জন্য সে অনিষ্ট দূরীকরণে সম্মত হয়— এসব বিষয়কে প্রিয় মনে করা দূষণীয় নয়। কেননা, যশ-খ্যাতিও ধনসম্পদের মতো উদ্দেশ্য সাধনের একটি মাধ্যম। উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

হ্যাঁ! এ ব্যাপারে সুচিন্তিত অভিমত হলো, নিজেই ধনসম্পদ ও যশ-খ্যাতিকে পছন্দনীয় মনে করবে না বরং এগুলোর প্রতি আসক্তিতে এমন মনে করবে, যেমন কারও ঘরে শৌচাগার রয়েছে এবং সে প্রয়োজন সারতে এই ব্যবস্থা থাকাকে পছন্দ করে। সে মনে করে, যদি তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন না থাকে, তবে সৌচাগারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এ ব্যক্তিকে বাস্তবে মলত্যাগকে মহব্বতকারী মনে করা হবে না। বরং এটা আসল উদ্দেশ্য হাসিলের উপায়কে বেছে নেওয়া হলো।

এটাকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে যেমন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এ কারণে ভালোবাসে যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে সে তার সাথে

যৌন সম্ভোগ করতে পারে। যেমন বাহ্যত্যাগের জন্য মলত্যাগ করাকে ভালো মনে করা হয়। যদি এই ব্যক্তির মধ্যে যৌনসম্ভোগের তাড়না না থাকে, তবে সে সঙ্গ ত্যাগ করবে। যেমন বাহ্যত্যাগের প্রয়োজন না থাকলে কেউ টয়লেটে যায় না। কেউ কেউ স্বয়ং স্ত্রীকেই ভালোবাসে এবং তার রূপ লাবণ্যের জন্য পাগলপারা থাকে। এমনকি যদি কখনো সঙ্গম নাও হয়, এরপরও তাকে ত্যাগ করতে চায় না। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার ভালোবাসা। প্রথম প্রকার ভালোবাসা মহব্বতের পর্যায়ে পড়ে না। যশ-খ্যাতি ও অর্থসম্পদের অবস্থাও তেমনি। এগুলো দ্বারা শারীরিক চাহিদা পূরণ হয় বলে এগুলোতে লালসা থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। আর যদি স্বয়ং এগুলোকেই মহব্বত করা হয়— উদ্দেশ্য হোক বা না হোক। অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণকে ভালোবাসা হয়, তবে তা নিন্দনীয়। তবে এমন মহব্বতকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে না— যে পর্যন্ত এই মহব্বতের জন্য কোনো গুনাহ না করে অথবা ধনসম্পদ ও জৌলুস হাসিল করার জন্য প্রতারণা, চক্রান্ত, মিথ্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ না করে। এগুলো হাসিল করার জন্য কোনো ইবাদতকেও ওসিলা করা যাবে না। কেননা, ইবাদতের মাধ্যমে ধনসম্পদ ও যশ সৃষ্টি করা ধর্ম মতে হারাম।

এ পর্যায়ে জানতে হবে সেবাদানকারী, সফরসঙ্গী, মুর্শিদ ও শাসকের মনে আসন প্রতিষ্ঠিত করার কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা রেখা আছে কি না কিংবা কতদূর পর্যন্ত তাদের আনুগত্য করতে পারবে? উত্তর সোজা। অর্থাৎ, তিনভাবে অন্যকে ভক্তি করা যায়। তন্মধ্যে দুটি উপায় জায়েয ও একটি হারাম। হারাম উপায় হলো, অপরকে এমন গুণের ভক্ত করা, যা নিজের মধ্যে নেই। যেমন তাকে বলা— আমি সাধক, খোদাভীরু অথবা সৈয়দ বংশীয়। অথচ সে এসবের কিছুই না। এটা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা হওয়ার কারণে হারাম।

বৈধ পন্থা দুটির মধ্যে একটি হলো নিজে যে গুণে গুণান্বিত সে গুণের যোগ্য মর্যাদা চাওয়া। যেমন ইউসুফ (আ) মিসরের শাসনকর্তাকে বলেছিলেন,

اِجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ, আমাকে আপনি রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োগ দিন। নিশ্চয় আমি সংরক্ষণকারী ও যথাযথ জ্ঞান রাখি। (সূরা ইউসুফ : ৫৫)

এতে তিনি শাসকের অন্তরে নিজের আমানতদারিতা ও বিজ্ঞ হওয়ার গুণ দ্বারা প্রভাব সৃষ্টি করার আশা করেছিলেন। শাসনকর্তার এমন ব্যক্তির

দরকারও ছিল। এই প্রেক্ষিতে তাঁর এই উক্তি সঠিকও ছিল। দ্বিতীয় উপায় হলো, অপরের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন না হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের কোনো ত্রুটি অথবা গুনাহ লুকিয়ে রাখা। এটা জায়েজ। কেননা, গুনাহের কাজ লুকিয়ে রাখা জায়েয এবং প্রকাশ্যে বলা নাজায়েয। এছাড়া এতে কোনো প্রতারণা নেই। বরং যে বিষয় জানার মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই, তা জানানো হলো না মাত্র।

যেমন কেউ শাসকের কাছে গোপন করলো যে সে মদ খায় এবং নিজের ধার্মিক হওয়ার দাবীর বিষয়টিও উপস্থাপন করলো না। কারণ সে যদি বলতো আমি খোদাভিরু ব্যক্তি তাহলে সেটা মিথ্যা সংমিশ্রিত হয়ে যেতো। আর তার মদ পান করার বিষয়টি গোপন রাখা ধার্মিক হওয়াকে আবশ্যক করে না। এখানে শুধু মদপানের বিষয় থেকে বেখবর রাখা হলো।

সামগ্রিকভাবে সতর্কতার বিষয় হলো, অন্যের কাছে ভালোবাসার জন্য সুন্দরভাবে ধীরেসুস্থে নামায আদায় করা। কারণ এতে রিয়া রয়েছে। এবং মনের মধ্যে সত্য গোপন করে রেখেছে। সে লোকদের দেখানোর জন্য মুখলিস সাজছে। কিন্তু সে তো রিয়াকার, মুখলিস হবে কি করে?

তাই রিয়ার আশ্রয় নিয়ে খ্যাতি অন্বেষী হওয়া হারাম। শুধু রিয়া নয়, অন্য সকল গুনাহের মিশ্রণ থাকলেও একই কথা। যখন বিষয়টি হয়ে যাবে হালাল-হারাম বা বিচার না করে সম্পদ কামাই করে যাওয়ার মতন। অন্যের সম্পদ বিনিময়ের বিষয় গোপন করে যেমন অন্যের থেকে কোনো সম্পদের মালিকানা লাভ করা যায় না। তেমনিভাবে ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের হৃদয় দখল করে নেওয়ার বৈধতা শরিয়ত দেয় না। কারণ সম্পদের মালিক হওয়ার চেয়ে অন্যের হৃদয়ে আসীন হতে পারার মর্যাদা অনেক বেশি।

আপন প্রশংসায় মন আনন্দিত ও নিন্দায় নিরুৎসাহিত হওয়ার রহস্য

চার কারণে মন প্রফুল্ল হয়। প্রথমত, প্রশংসার জন্য মন জানতে পারে যে, সে পূর্ণতাগুণসম্পন্ন। কারণ, যে বিষয় দ্বারা প্রশংসা করা হয় তা প্রকাশ্য অথবা সন্দিহান গুণ হতে পারে। যদি গুণটি প্রকাশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, তাহলে আনন্দ কম হয়। যেমন কারও প্রশংসায় বলা হয়, সে দীর্ঘাকৃতি ও

শ্বেতকায়। এটা যদিও এক প্রকার পূর্ণতাগুণ, কিন্তু মন এ থেকে অমনোযোগী থাকে। ফলে সে আদৌ আনন্দ পায় না। তবে অপর ব্যক্তির বলার ফলে যখন তার মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, তখন কিছু না কিছু সুখ পায়। আর যদি প্রশংসার বিষয়টি সন্দিহান হয়, তবে সুখ অনেক বেশি হয়। যেমন কারও শিক্ষাদীক্ষা, পরহেযগারি অথবা রূপের প্রশংসা করা। মানুষ প্রায়ই এসব গুণের ব্যাপারে সন্দিহান থাকে এবং কোনো না কোনো মতে এই সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়ার অভিলাষ করতে থাকে। কাজেই যখন অপরের মুখ থেকে এই কাঙ্ক্ষিত মন্তব্য শুনতে পায়, তখন অনাবিল আনন্দ হাসিল হয়। এ কারণে সবচে বেশি আনন্দ তখন হাসিল হয়, যখন এসব গুণ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির মুখ থেকে এই প্রশংসা উচ্চারিত হয়। যেমন কোনো ওস্তাদ তার ছাত্র সম্পর্কে বলে— তুমি খুব মেধাবী, বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। এতে ছাত্রের মনে আনন্দ আর ধরে না। কিংবা খারাপ লাগার কারণও এটা। এতে মন তার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে। দোষ হচ্ছে পূর্ণতার বিপরীত। সুতরাং পূর্ণতা যেমন প্রিয়, দোষ তেমনি অপ্রিয় হয়ে থাকে। অপরের মুখ থেকে যখন নিজের দোষ জানবে, তখন অবশ্যই তা খারাপ লাগার বিষয়। বিশেষ করে যখন জ্ঞানী ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নিন্দা করবে।

দ্বিতীয়ত, প্রশংসার মাধ্যমে জানা যায় প্রশংসাকারীর মন প্রশংসিত ব্যক্তির অধীন, ভক্ত। মনের মালিকানা লাভ করা সবার কাছেই প্রিয় ও পছন্দনীয়। যখন জানবে যে, প্রশংসাকারী তার ভক্ত এবং তার মন তার ইচ্ছার অনুগত, তখন একান্তভাবেই সে আনন্দিত হবে। বিশেষ করে যখন প্রশংসাকারী ব্যক্তি প্রচুর ক্ষমতাবান হয় এবং তাকে দিয়ে অধিক কাজ আদায়ের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে উৎফুল্লতার মাত্রা অধিক হবে।

তৃতীয়ত, এ ধরনের ব্যক্তির প্রশংসা করা, যার কথা সবাই শুনে এবং মান্য করে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো, প্রশংসা অথবা নিন্দা প্রকাশ্যে হওয়া। সুতরাং সমাবেশ যত বড় হবে এবং প্রশংসাকারী যত বেশি সম্মানী হবে, আনন্দ তত বেশি হবে। এর বিপরীতে নিন্দার অবস্থাটিও অনুমেয়।

চতুর্থত, প্রশংসার মাধ্যমে প্রশংসিত ব্যক্তি প্রতিপত্তিশালী হওয়া বোঝা যায়। প্রশংসাকারীর তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া এটা তার মনের সাগ্রহে হোক অথবা চাপের মুখে হোক। চাপও মানুষের নিকট প্রিয় হয়ে থাকে।

কেননা, এতে এক প্রকার প্রাবল্য পাওয়া যায়। এজন্যই প্রশংসাকারীর মন প্রশংসার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাসী না হলেও যার প্রশংসা করা হয় সে ব্যক্তি তৃপ্তি পায়।

আপন প্রশংসায় মন আনন্দিত ও নিন্দায় নিরুৎসাহিত হওয়ার প্রথম কারণ হলো মনে পূর্ণতার অনুভূতি জন্ম নেওয়া। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হলো, মনে এই ধারণা রাখা যে প্রশংসাকারী যা বলেছে তার মধ্যে সত্যতা নেই। যেমন কারও প্রশংসায় বলা হলো সে অনেক উচ্চবংশীয়, কিংবা দানশীল অথবা বড় আলেম বা খোদাভীরু ব্যক্তি এবং প্রশংসিত ব্যক্তি তখন মনে করলো যে, এসব অসত্য কথা। তার মধ্যে এমন কোনো গুণই নেই। তখন তার মনে পূর্ণতার অনুভূতি আসবে না এবং সে স্বাদও অনুভব করবে না।

কাউকে যদি আতঙ্কে নয় খেলাচ্ছলে প্রশংসা করা হয় তখন আর প্রশংসা শ্রবণের মধ্যে কোনো স্বাদই থাকবে না। কারণ তাতে স্বাদ আস্বাদনের কিছুই অবশিষ্ট নেই।

যশ-খ্যাতির প্রতিকার

জেনে রাখা ভালো, মানুষের হৃদ্যতা যেন হাতছাড়া না হয় এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর স্তুতির মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। সে কথায় ও কাজে—সব সময় খেয়াল রাখে, যাতে মানুষের মধ্যে তার সম্মান বেড়ে যায়। আসলে এ বিষয়টিই নিফাকের বীজ এবং অনর্থের মূল। এর ফলে ইবাদতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হতে থাকে, লৌকিকতার প্রভাব এত বেড়ে যায় এবং মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্য অবৈধ বিষয়াদিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই নবী কারীম (স) ইরশাদ করেন—

حُبُّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ.

অর্থাৎ, "সম্মান ও সম্পত্তি মানুষের মনে মোহ ও নিফাক জন্ম দেয়, যেমন পানি শাকসবজি জন্ম দেয়।"

এ থেকে জানা গেল, যশপ্রীতি বিনাশকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। তাই এর চিকিৎসা জরুরি। কেননা, এ রোগটি ধনসম্পদের মহব্বতের ন্যায় একটি মজ্জাগত রোগ।

খ্যাতির প্রতি আসক্তির প্রতিবিধান দু'টি— একটি ইলমী ও অপরটি আমলী। ইলমী প্রতিবিধান হচ্ছে, যেহেতু খ্যাতি অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তাই তার কারণ জানতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না এর কারণ হচ্ছে, মানুষের শরীর ও মনের উপর ক্ষমতা লাভ করা। মানুষ যদি এ বিষয়টি অর্জন করতে সক্ষমও হয়ে যায়, তবে চিন্তা করা প্রয়োজন, মৃত্যুই এর চূড়ান্ত সীমা। মৃত্যুর পর এটা কোনো কাজে আসে না। এটি "বাকিয়াতে সালিহাত" তথা অক্ষয় সৎকর্মসমূহের মধ্যে গণ্য নয় যে, মৃত্যুর পরও এর কার্যকারিতা বাকি থাকবে। ধরে নেওয়া যাক, যদি পূর্ব ও পশ্চিমে সকল মানুষ এক লোককে সিজদা করতে থাকে এবং ৫০ বছর পর্যন্ত সবাই সিজদারত থাকে, তবু না সিজদাকারীরা থাকবে, আর না সেই ব্যক্তি নিজে থাকবে। বরং তারা সকলেই একদিন অন্যান্য মহাপুরুষদের মতো অনুসারীদের নিয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে। সুতরাং এমন ধ্বংসপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য অনন্ত ও অক্ষয় জীবন লাভের মাধ্যম ধর্মকে জলাঞ্জলি দেওয়া মোটেই উচিত নয়। সত্যিকার পূর্ণতা কী— এ বিষয়টি যে বুঝতে পেরেছে, তার দৃষ্টিতে সুখ্যাতি খুবই তুচ্ছ জিনিস। এটা বুঝতে কিন্তু সে-ই অপারগ, যে পরকালের উপস্থিতিকে চোখের সামেন দেখে, দুনিয়াকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং মৃত্যুকে মনে করে যেন সে এখনি এসে গেছে। হাসান বসরী (র)-এর অবস্থা তেমনি ছিল। তিনি এক চিঠিতে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে লিখেছিলেন, আপনার বিশ্বাস করতে হবে যে, আপনি মারা গেছেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি চিঠির জবাবে লিখলেন, বিশ্বাস করা উচিত যেন আপনি দুনিয়াতে কখনো আগমন করেননি— চিরকাল পরকালেই রয়েছেন। (ইবনু আবিদ দুনয়া : কাসরুল আমাল : ২২৬)

বলার অপেক্ষা রাখে না, এই মুসলিম মনীষীগণের দৃষ্টি আখেরাতের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ফলে, তারা দুনিয়াতেই সুখ্যাতি ও ধনসম্পদকে হেয় মনে করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। তারা শুধু দুনিয়াকেই দেখে এবং পরিণতির ধার ধারে না। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى.

বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দাও; অথচ আখেরাতই হলো উত্তম ও স্থায়ী। (সূরা আলা : ১৬-১৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ .

কখনো নয়; বরং তোমরা ক্ষণিকের দুনিয়াকে ভালোবাসো এবং পরকালকে পরিত্যাগ কর। (সূরা কিয়ামাহ : ২০-২১)

সুতরাং যার অবস্থা এই, তার উচিত যশপ্রীতির বিপদ সম্পর্কে জেনে নেওয়া এবং দুনিয়াতে খ্যাতিমান লোকেরা যে যাবতীয় বিপদের সম্মুখীন হয়, সেগুলো চিন্তা করা।

যশপ্রীতি ব্যক্তিমাত্রই দুনিয়াতে ঈর্ষার পাত্র হয়ে থাকে। মানুষ তার ক্ষতি করার মানসে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সে-ও সব সময় আশঙ্কা করতে থাকে যে, কোথাও মানুষের অন্তর থেকে তার ইজ্জত-সম্মান মুছে যায়। কেননা, মানুষের মন তো সবসময় পরিবর্তনশীল। কখনো একদিকে আবার কখনো অন্যদিকে থাকে। এক সময় যাকে ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়, অন্য সময় তাকেই জুতার মালা দিতে মোটেও ভুল করে না। সেজন্যেই যে লোক মানুষের মনের উপর নির্ভর করে, সে যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের উপরে ঘর নির্মাণ করে। যার স্থায়ীত্বের কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং, আপন সুখ্যাতি ধরে রাখার চিন্তা, হিংসাকারীদের চক্রান্ত প্রতিহত করা এবং দুশমনদের দুশমনি নিবারণ করা- জাগতিক এসব আপদ-বিপদের কারণে যশ-খ্যাতির আনন্দ সবসময়ই ম্লান থাকে। দুনিয়ায় মানুষ এ থেকে যতটুকু সুখশান্তি আশা করে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিপদাশঙ্কায় জড়িত থাকে। আসল উদ্দেশ্য যে পরকালের উপকার, তার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না।

সুখ্যাতির আমলী প্রতিবিধান হলো এমন আমল করা, যাতে মানুষ তিরস্কারের উপযোগী হয়ে পড়ে এবং অন্যের দৃষ্টিতে শত্রু হয়ে যায়। এতে জনপ্রিয় হওয়ার মোহ কেটে যাবে। এছাড়া মানুষের নিকট অখ্যাত ও মন্দ সাব্যস্ত হওয়ার দিকটিকে বেছে নিয়ে শুধু আল্লাহর প্রিয় হওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকবে। এটা 'মালামতী' (ভ্রান্ত) সম্প্রদায়ের অনুসৃত নীতি। তারা যশ-খ্যাতির বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এমন গুনাহ ও অপরাধ করে থাকে, মানুষের দৃষ্টিতে পুরোপুরি বেইজ্জতের পাত্র হয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম মনীষীদের ও ধর্মীয় নেতাদের জন্য এ উপায় জায়েয নয়। কেননা, তাদের কার্যকলাপ দেখে মুসলমানদের মনে ধর্মের কাজে শৈথিল্য আসবে। এছাড়া

যে ব্যক্তি অনুকরণীয় নেতা নয়, তার জন্যও বিশেষ এ চিকিৎসার খাতিরে এমন কাজ করা বৈধ, যার ফলে মানুষের মাঝে তার মূল্য কমে যায়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, জনৈক বাদশাহ এক দরবেশের কাছে যেতে চাইলেন। এ উদ্দেশ্যে রওয়ানাও করলেন। দরবেশ যখন শুনল বাদশাহ তার আস্তানার খুব কাছে এসে গেছেন তখন সে শাকসবজি মিলিয়ে ইত্যাদি খাবার গোগ্রাসে খেতে লাগলো। বাদশাহ তাকে এভাবে খেতে দেখে তার প্রতি অভক্তি নিয়ে সেখান থেকে ফিরে গেলেন। দরবেশ বলল, আল্লাহ তাআলার হাজার শোকর, যিনি বাদশাকে আমার নিকট থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। অনেক মনীষী এমন রঙিন পাত্রে শরবত পান করেছেন, যা দেখে লোকেরা তাকে মদখোর মনে করে চলে গেছে। এক বুযুর্গ সংসার নির্লিপ্ততায় মশগুল হলে লোকজন তার নিকট ভিড় করতে শুরু করে। তিনি এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একদিন হাম্মামে গেলেন এবং অন্য এক লোকের কাপড় পরে বাইরে চলে এলেন এবং প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা চুরি যাওয়া কাপড় চিনতে পেরে তাকে ধরল এবং চোর চোর বলে ইচ্ছামতো ধোলাই দিল। এরপর ভক্তরা সেই বুযুর্গের হালকা পরিহার করল।

খ্যাতি প্রতিরোধের সবেচেয়ে কার্যকর উপায়

খ্যতির বিড়ম্বনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো জনসমাজ থেকে দূরে সরে বিরান কোনো স্থানে হিজরত করা। কারণ, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকলে মনের মধ্যে আসন গেড়ে বসা খ্যাতির প্রীতি দূর হতে চায় না। কখনো সে ধারণা করে, এখন আর আমার মনে খ্যাতি প্রীতি নেই। কিন্তু তার মনে তখনো খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। লক্ষ্য পূরণ হয়ে যাওয়ার কারণে তার মন শান্ত হয়ে আছে।

এসময় যদি তার বিষয়ে লোকদের ধারণা পাল্টে যায়, লোকেরা তার নিন্দা করে, তাকে অযোগ্য বলে মনে করে, তখন তার বুকে কষ্টের পাথর জমে যাবে। তখন সে নিজেকে ভালো প্রমাণে কখনো নিজের খ্যাতি উদ্ধারে অন্যায় কর্ম করতে দ্বিধাবোধ করে না।

এই আচরণ থেকেই বোঝা যায়, তার মনে এখনো সম্মান মর্যাদা ও খ্যাতি প্রীতি রয়ে গেছে। সে সম্পদের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির মতোই। বরং তার চেয়েও জঘন্য। কারণ সম্পদের ফিতনার চেয়ে খ্যাতির ফিতনা অনেক

ভয়াবহ। যতদিন সে মানুষের কাছে প্রত্যাশী হয়ে থাকবে, তার মন থেকে খ্যাতিপ্রীতি দূর হবে না। তবে যখন সে নিজে উপার্জন করে নিজের খাদ্যের ব্যবস্থা করবে এবং লোকদের দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস ত্যাগ করবে, সাধারণ মানুষ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। তখন সে আর ভাববে না আমার সম্মান বাড়লো না কমলো। তেমনিভাবে যারা মনুষ্যসমাজ থেকে বহুদূর দেশে বাস করে তাদের মনেও খ্যাতির ভাবনা আসে না। কারণ লোকদের সাথে তাদের দেখা হয় না। তাদের বিষয়ে কোনো আশাও তারা রাখে না।

আর মানুষের কাছ থেকে পাওয়ার প্রত্যাশা দূর করার মাধ্যম হলো অল্পে তুষ্ট ভাবনাও তার মনে স্থান পাবে না এবং খ্যাতির হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়েও তাকে ভাবতে হবে না। কাজেই যতক্ষণ মন থেকে লোভ দূর করে অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জন করতে না পারবে ততক্ষণ খ্যাতি-প্রীতি ত্যাগের দাবী করা উচিত নয়। আর এর জন্য সহায়ক হলো, খ্যাতির নিন্দা ও প্রশংসার অপকার বিষয়ক হাদিস ও লোকদের কথামালা। যেমন বলা হয়—

اَلْمُؤْمِنُ لَا يَخْلُوْ مِنْ ذِلَّةٍ أَوْ قِلَّةٍ أَوْ عِلَّةٍ.

মুমিন তুচ্ছতা, স্বল্পতা ও অস্বচ্ছতার কোনো একটা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা দেখলে বোঝা যায়, তারা সম্মানের চেয়ে তুচ্ছ জীবনের বেশি অভিলাষী ছিলেন। তারা আখেরাতের সওয়াবের প্রত্যাশী ছিলেন। আল্লাহ তাদের উপর শান্তি বর্ষিত করুন।

স্তুতির উপশম : মানুষের মন্দ বলার ভয় এবং তাদের স্তুতি পাওয়ার লোভ অধিকাংশ লোকের সর্বনাশের কারণ হয়েছে। এমন লোকেরা মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী যাবতীয় কাজকর্ম করার চেষ্টা করে, যাতে অন্যরা তার প্রশংসা করে এবং নিন্দার ভয় না থাকে। এটা ধ্বংসকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। তাই এ সমস্যার প্রতিকার জরুরি। এর চিকিৎসা পদ্ধতি হলো, প্রশংসার লোভ এবং নিন্দার ঘৃণার যে সমস্ত কারণ রয়েছে, সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। যেমন প্রথম কারণ হচ্ছে, প্রশংসিত ব্যক্তির কর্তব্য আপন বিবেক-বুদ্ধির শরণাপন্ন হওয়া এবং মনে মনে এ চিন্তা করা যে, যে গুণ দ্বারা আমার প্রশংসা করা হয়েছে, সেটা আমার মধ্যে আছে কি না? যদি থাকে, তাহলে সেটা আনন্দিত হওয়ার উপযোগী কি না? যদি গুণটি এমন হয়, যা প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে নেই, তবে এমন গুণের জন্য খুশি

হওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। যদি উদ্দেশ্যটা হয় পার্থিব তখন আনন্দটা হবে সামান্য তৃণ পেয়ে আনন্দিত হওয়া, দুদিন পরে যা রোদে পুড়ে শুকিয়ে যাব। তারপর দমকা হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর এটা মন্দ বুদ্ধির পরিচায়ক ছাড়া আর কিছু নয়; বরং বুদ্ধিমান তারাই আনন্দের সময় যাদের অবস্থা কবির মতো—

أَشَدُّ الْغَمِّ عِنْدِىْ فِىْ سُرُوْرٍ
تَيَقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ إِنْتِقَالًا

আনন্দের সময় আমার এতো মন খারাপ হয় যে, মনে হয় আমি মরেই যাবো। (দিওয়ানুশ শায়ির আবুত তাইয়িব আল মুতানাব্বি-আকাবিরের ব্যাখ্যা সহ : ৩ : ২২৪)

কাজেই পার্থিব আসবাবের কারণে মানুষের আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। মনে আনন্দ আসলেও তা যেনো প্রশংসা শুনে না হয়। বরং প্রশংসার সত্যতা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে আনন্দিত হওয়া উচিত। কারণ প্রশংসালাভ উত্তম গুণের বাহক হওয়ার কারণ নয়।

সত্যিই যদি কারও মধ্যে প্রশংসাযোগ্য গুণ থাকে যেমন ইলম, তাকওয়া তখনও মনে আনন্দভাব না আসাই উচিত। কারণ মানুষের শেষ জীবন কেমন হবে কেউ তা বলতে পারে না। ইলম ও খোদাভীতির মতো গুণ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য মনের মধ্যে থাকেই। আর মন্দ পরিণতির ভয়ের কারণ মানুষের উচিত পার্থিব বিলাস উপকরণ নিয়ে আনন্দিত না হওয়া।

তবে কেউ যদি সু-সমাপ্তির আশা মনে নিয়ে নিজ গুণের কারণে আনন্দিত হয়, তাহলে তার আনন্দের উৎস হওয়া উচিত আল্লাহর অনুগ্রহ তাকওয়া ও জ্ঞানের মতো সম্পদ লাভ করা।

আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে, যা কিছু নিয়ে তোমার গুণকীর্তন করা হয়েছে তার কোনোটাই তোমার মধ্যে নেই তাহলে পাগলামির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছো। বিষয়টা হবে এমন, কেউ বাইতুলখালা থেকে বের হয়ে এসে বললো আহ! কি মনোরম কষ্টের সুগন্ধ! পেট থেকে যখন বের হয় তখন তা কি সুগন্ধ ছাড়ায়!!!

সে জানে পাকস্থলি থেকে বের হওয়া বস্তু কখনো সুগন্ধি ছড়ায় না। তারপরও সে খুশিতে চোখ মুখ বড় করে ফেলেছে, তেমন যদি গুণ না

থাকার পরও প্রশংসা শুনে তোমার চোখ আনন্দে ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তাহলে তোমারও একই অবস্থা হবে।

আর আল্লাহ তো জানেনই তোমার মনে, তোমার অন্তরে কি কি মন্দ আছে। তাই নিজেকে নিয়ে মিথ্যা দু চারটা ভালোকথা শুনে যাদের মন আনন্দে লাফায় তাদেরকে মূর্খই বলা উচিত।

সারকথা হলো, প্রশংসাকারী যদি সত্য কথা বলে তাহলে তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ দেখে খুশি হওয়া উচিত। আর তোমার মিথ্যা প্রশংসা করা হলে তোমার উচিত মন ভারাক্রান্ত করে রাখা। প্রশংসায় উল্লিখিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, এতে জানা যায়, প্রশংসাকারীর মন প্রশংসিত ব্যক্তির অনুগত হয়ে গেছে এবং আরও হবে। এর পরিণতি এবং যশপ্রীতির পরিণতি একই, যার চিকিৎসা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশংসা করার তৃতীয় কারণ প্রশংসিত ব্যক্তির ভয়ভীতি। যার কারণে প্রশংসাকারী প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। এটা সাময়িক ও অস্থায়ী ক্ষমতা। এ কারণে প্রশংসা করা হলে প্রশংসিত ব্যক্তির উচিত দুঃখ করা, প্রশংসাকে খারাপ মনে করা। জনৈক বুযুর্গ বলেন, যে ব্যক্তি প্রশংসায় আনন্দিত হয়, সে নিজের মধ্যে শয়তানকে প্রবেশ করার পথ করে দেয়। (আবু নুআইম : হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২ : ৩৬৪)

জনৈক বুযুর্গ বলেন, মন্দ লোক শব্দটার চেয়ে যদি ভালো মানুষ কথাটা শুনতে তোমার ভালো লাগে তাহলে বুঝে নেবে, তুমি সত্যিই মন্দ লোক। (সুফিয়ান সাওরি (র)-এর বাণীতে উল্লেখ আছে— কূতুল কুলূব : ১ : ১৭৩)

রাসূলুল্লাহ (স) প্রশংসাকারীর নিন্দা করে বলেন, বিনাশ হোক তোমার! তুমি তো তার পিঠে আঘাত করে বসলে। তোমার এই কথা তার কানে গেলে কেয়ামত পর্যন্ত সে সাফল্যের মুখ দেখতে পেতো না। (সহিহ বুখারি : ২৬৬২; সহিহ মুসলিম : ৩০০০ অনুরূপ অর্থে)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা একে অন্যের প্রশংসা করো না। তোমাদের সামনে যদি কোনো প্রশংসাকারী পড়ে তাহলে তার চোখে মুখে মাটি ছিটিয়ে দাও। (সহিহ মুসলিম : ৩০০২; তবে সেখানে أَوْ لَا عَادَحُوْا অংশের উল্লেখ নেই)

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম প্রশংসাকে খুব ভয় করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের একজন কোনো ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে আরয করল:

আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি রাগ করে বললেন, আমার সাফাই গাওয়ার আদেশ আমি তোমাকে করিনি। (বায়হাকি : সুনানে কুবরা : ৫ : ১৮২)

কোনো এক সাহাবিকে জনৈক ব্যক্তি বললো, আল্লাহ আপনাকে যতদিন আমাদের মাঝে জীবিত রাখছেন ততদিন লোকেরা কল্যাণের পথেই থাকবে।

লোকটার কথা শুনে সাহাবি বললেন, মনে হচ্ছে তুমি ইরাকি লোক?! (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ৫৪; ঘটনার উল্লিখিত সাহাবি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর)

কোনো এক সাহাবিকে প্রশংসা করা হলে তিনি বললেন, আয় আল্লাহ! আপনার এই বান্দা আমাকে আপনার ক্রোধের কাছে নিয়ে গেছে। সুতরাং তার দুশমনির ক্ষেত্রে আমি আপনাকে সাক্ষ্য রাখছি। (ইবনু আবিদ দুনয়া আস-সামতু ওয়া আ-দাবুল লিসান : ৬০২)

এমন ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। মানুষের কথায় খুশি হয়ে আল্লাহর ক্রোধের শিকার হওয়ার ভয়ে তাঁরা অন্য কারও মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শোনাকে অপছন্দ করতেন। সার্বক্ষণিক আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত তাদের অন্তর বান্দার প্রশংসাকে অপছন্দ করতো। কারণ প্রকৃত প্রশংসিত ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে। আর বাস্তবেই যে নিন্দনীয় আল্লাহর কাছ থেকে সে যোজন যোজন দূরে সরে মন্দদের সাথে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

কাজেই দুনিয়াতে যার প্রশংসা করা হলো সে যদি বাস্তবে জাহান্নামি হয়, অন্যের প্রশংসা শুনে আনন্দিত হয়ে সে কতটা মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে! আর যদি সে জান্নাতি হয়ে থাকে তবুও তার আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, নিজের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের বিষয় লক্ষ করে যদি কারও মনে প্রসন্নতা আসে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আর কাউকে ভালো গুণ দান করা আল্লাহর এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। যখনই ভাববে যে, জীবন মৃত্যু ও রিযিকের দাবি আল্লাহর মুঠোবন্ধ, তখন বান্দার প্রশংসার দিকে তাকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। তার মনে প্রশংসা প্রীতি থাকবে না। তার মন থেকে দুনিয়ার ভাবনা দূর হয়ে যাবে।

আল্লাহই সবকিছু সঠিকভাবে সমাধা করার তাওফিক দান করেন।

নিন্দাকে অপছন্দ করার উপায়

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, নিন্দাকে অপছন্দ করার কারণ প্রশংসাপ্রীতির কারণের বিপরীত। তার তিন ধরনের অবস্থা হয়। সে সত্য কথা বলবে এবং তোমার প্রতি স্নেহ ও উপদেশদানের লক্ষ্যে নিন্দা করবে। কিংবা মুখে সত্য নিন্দা করলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে তোমাকে কষ্ট দেওয়া। অথবা তোমার মিথ্যা নিন্দা সে করবে। সুতরাং নিন্দা অপছন্দ হওয়ার প্রতিকারও প্রশংসাপ্রীতির চিকিৎসার মাধ্যমে বোঝা যায়। সংক্ষেপে এর বর্ণনা এই যে, যে ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে, সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয় এবং মঙ্গলকামী হয়ে নিন্দা করে, তবে তার উপর রাগ করা, বিদ্বেষ পোষণ করা এবং মন্দ কথা বলা সঠিক নয়। কেননা, এ ধরনের মানুষ তোমার দোষত্রুটি আলোচনা করে তোমাকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাতে চায়। আর যদি সে তোমাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিন্দা করে, তবু তার কথায় তোমার উপকারই হবে। কেননা, সে তোমার সে ত্রুটির কথা বলে দিয়েছে, যে বিষয়টি তোমার অজানা ছিল। অবশ্য কষ্ট দেওয়ার নিয়ত করে নিন্দাকারী নিজেরই ক্ষতি করে। কিন্তু তোমার জন্যে তার উক্তি নিয়ামতস্বরূপ। ইচ্ছা থাকার পরেও তুমি অনেক সময় পোশাক নোংরা থাকার কারণে গণ্যমান্য কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারো না। কারণ নোংরা কাপড় পরে তার সামনে গেলে হতে পারে ঘর নোংরা করার অপরাধে সে তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। তখন কেউ যদি তোমাকে সতর্ক করে বলে যে, আপনার পোশাকে তো ময়লা লেগে আছে। পরিষ্কার করে নিন! তার কথা শুনে রেগে যাওয়া মোটেও উচিত হবে না বরং তার পক্ষ থেকে সতর্ক করা হবে তোমার জন্য উপরি পাওনা। আর আখেরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত মন্দকর্মই ধ্বংসাত্মক। আর মানুষকে চেনা যায় তার শত্রুদের মন্তব্য শুনে। ফলে শত্রুদের কথাকে ছুড়ে ফেলে না দিয়ে তাদের কথার মূল্যায়ন করা উচিত।

আর যদি নিন্দাকারী নিজের কথায় মিথ্যাবাদী হয়, তবে এমতাবস্থায়ও খারাপ লাগা উচিত নয়। বরং এ ক্ষেত্রে দেখা প্রয়োজন, যদিও সেই বিশেষ দোষটি তোমার নেই; এর চেয়ে নিকৃষ্ট ত্রুটি আরও থাকতে পারে। সুতরাং, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, নিন্দাকারী সেসব ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়নি এবং এমন ত্রুটি বলেই ক্ষান্ত হয়ে গেছে, যা তোমার মধ্যে নেই।

এতদসত্ত্বেও যে লোক তোমার ত্রুটি বলে, সে তার নেকীগুলো তোমাকে উপহার দেয়, আর যে তোমার প্রশাংসা করে, সে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী তোমার কোমর ভেঙে দেয়। অতএব, কোমর ভাঙার কারণে তুমি উল্লসিত হবে, আর নেকী আসার কারণে বেজার হবে, এটা কেমন কথা? নেকী এলে তো আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ হয়, যার জন্য তুমি আগ্রহী থাকো।

আরও একটি বিষয় ভাবা উচিত যে, নিন্দাকারী ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে নিজের ধর্ম ধ্বংস করেছে এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে পড়েছে। সুতরাং, তোমার রাগ করা ও তাকে বদদুআ করা উচিত নয়। বরং এ দুআই করা উচিত— হে আল্লাহ! তাকে যোগ্যতা দাও, তার প্রতি দয়া করো এবং তার তাওবা কবুল করো। দেখ, উহুদ যুদ্ধে যখন কাফেররা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাঁত মুবারক শহীদ করেছিল, মস্তক ক্ষত-বিক্ষত করেছিল এবং তাঁর চাচা হামযা (রা)-কে শহীদ করেছিল, তখন তিনি এই দুআ করেছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার কওমকে সৎপথ দেখাও। কেননা, তারা কিছুই জানে না। (সহিহ বুখারি : ৩৪৭৭; সহিহ মুসলিম : ১৭৯২)

একবার ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এমন এক লোকের জন্য নেক দুআ করেছিলেন, যে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। লোকেরা বলল, এমন আঘাতের পরও নেক দুআ করার কারণ কী? তিনি বললেন, আমি ভালো করেই জানি, তার ব্যবহারের কারণে আমি নেকী পাব। কাজেই যার জন্য আমি সওয়াব পাব, সে আমার জন্য শাস্তি ভোগ করুক আমি এটা ভালো মনে করি না। (খুরকুশি : তাহযিবুল আসরার : ৩৩৫; আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৪১৪)

নিন্দার তিক্ততা কীভাবে নিজের কাছে হালকা মনে করবে?

এর সবেচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো অন্যের থেকে ভালো কিছু আশা না করা। যে তোমার নিন্দা করছে তার কাছে যদি তুমি প্রয়োজন মুক্ত থাকতে পারো তাহলে সে যত যাই বলুক তোমার তেমন খারাপ লাগবে না।

অন্য আরেকটা পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। তা হলো অল্পেতুষ্টি। অল্পেতুষ্টির দ্বারা সম্পদ সম্মান উভয় ধরনের লালসা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

যতক্ষণ কারও মনে সম্পদশালী ও খ্যাতিমান হওয়ার আশা থাকবে ততক্ষণ তার মনে মনে আশা আকাঙ্খার প্রাবল্য থাকবে। তার ধ্যান-ধারণা মর্যাদা হাসিলের পেছনে ছুটতে থাকবে। এতে দীনের অনেক ক্ষতি করতে হবে। কাজেই সম্পদ ও সম্মান প্রত্যাশী ব্যক্তি ও প্রশংসালাভের কামনা প্রবল ব্যক্তি দীনের সীমানা ঠিক রাখতে পারে না। কারণ দুটি বস্তুর মাঝে দূরত্ব অনেক অনেক বেশি।

প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে লোকদের বিভিন্ন অবস্থান

প্রশংসা ও নিন্দার বিচারে মানুষ চার ধরনের।

১. প্রশংসা যাদের খুশী করে এবং প্রশংসাকারীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সে নিন্দা অপছন্দ করে এবং নিন্দুকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। নিন্দুককে সে শাস্তি দিতে ব্যাকুল থাকে। সাধারণভাবে প্রায় সকল মানুষের অবস্থার ক্ষেত্রে এটাই গুনাহের চূড়ান্ত সীমা।

২. নিন্দা করলে, মুখে কিছু বললেও মনে মনে আনন্দিত হয়। এবং প্রশংসা করলে বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ না করলেও মনে সুখানুভূতি আসে।

এ ধরনের ব্যক্তিও ত্রুটির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তির চেয়ে সে একটু বেশি মুক্ত।

৩. এটা পূর্ণতা অর্জনের প্রথম ধাপ। তা হলো, ব্যক্তির কাছে নিন্দা কিংবা প্রশংসার আলাদা কোনো মূল্য থাকবে না। নিন্দা তাকে ক্রোধান্বিত করবে না। প্রশংসা তাকে উদ্বেলিত করবে না।

কতক আবেদ নিজেকে প্রমাণ মনে করে এবং বাহ্যিক আলামতের বিচার না করেই ধোঁকায় পড়ে থাকে।

প্রশংসা ও নিন্দা সমান হওয়ার কিছু আলামত

ক. প্রশংসাকারী ব্যক্তির কাছে বসতে মন যতটা সায় দেয় নিন্দুকের কাছে বসলে এর ব্যতিক্রম কিছু মনে আসে না।

খ. প্রশংসাকারীর সঙ্গ ছেড়ে উঠে আসতে যেমন খারাপ লাগে নিন্দাকারীর ক্ষেত্রেও তেমন হয়।

ঘ. প্রশংসাকারীর মৃত্যুর কারণে চোখ থেকে পানি ঝরলে নিন্দুকের মৃত্যুও তাকে কাঁদায়।

ঙ. প্রশংসাকারীর বিপদ তাকে যতটা ভাবিত করে, নিন্দাকারীর বিপদ তাকে ততটাই ভাবনায় ফেলে।

চ. প্রশংসাকারীর অপরাধ তার কাছে নিন্দাকারীর চেয়ে হালকা মনে হবে না।

যখনই অন্যের থেকে নিন্দা বিষয়ক কিছু শুনবে, প্রশংসাকারীর মতো তার অন্য নিন্দাকে হালকা করে নেবে। এভাবে তার কাছে প্রশংসা ও নিন্দা দুটোই গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। এদুটির মধ্যে কোনো দিক থেকে আর বিভেদ থাকবে না। অর্থাৎ প্রশংসা ও নিন্দা উভয়টি তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু মনের জন্য বিষয়টি কতই না কঠিন!!

অনেক আবেদ আছে, অন্যের মুখে প্রশংসা শুনে অবচেতনভাবেই তার ভেতরজগৎ খুশিতে ভরে ওঠে। কারণ, সে উপরে বর্ণিত আলামতের নিক্তিতে নিজেকে ওযন করে দেখেনি-কখনো কখনো আবেদ মন নিন্দুকের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে প্রশংসাকারীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর শয়তান তার সামনে বিষয়টি সুশোভিত করে আর বলে, নিন্দুক লোকটা আসলেই খারাপ। সে তোমার নিন্দা করে আল্লাহর নাফরমানি করেছে। আর প্রশংসাকারী লোকটা কত ভালো। ভদ্র। আল্লাহর আদেশ মেনে সে তোমার বিষয়ে ভালো কথা বলেছে। এরা দুজন তাই সমানে হয় কি করে? আর নিন্দা শুনে তোমার মনে যে খারাপ লাগার বোধটা আসছে তা নিছক দীনি কারণেই হচ্ছে। এর পেছনে অন্য কোনো কারণ নেই।

এসব কথা স্রেফ ধোঁকায় ফেলা। তাই আবেদের ভাবা উচিত। নিন্দুক ব্যক্তি আমার নিন্দা করে গুনাহ করেছে ঠিক। কিন্তু অনেক মানুষ তো এমনও আছে যারা প্রতিনিয়ত কবিরা গুনাহ করে যাচ্ছে। তাদের বিষয়ে তো আমার মন খারাপ হচ্ছে না? তাহলে এই লোকের সামান্য দুচারটি মন্দ কথা শুনে আমার মনে এমন ঝড় উঠছে কেন?

আমার যে প্রশংসা করছে, সে তো অন্য কাউকে নিয়ে মন্দ বলতে দ্বিধা করছে না, সেও তো গুনাহ করছে। তাহলে তার বিষয়ে আমি মনের মধ্যে খারাপ লাগাকে স্থান দিতে পারছি না কেন? কারণ নিন্দা করা যদি মন্দ হয় তাহলে কার নিন্দা করা হয়েছে তা দেখার বিষয় নয়।

এভাবে নিজেকে নিয়ে দ্বিধায় পড়ে থাকা ব্যক্তি নিন্দা বাক্য শুনে ক্রুদ্ধ হতে থাকে। আর প্রবৃত্তির চাহিদা থাকার সাথে সাথে বাড়তে থাকে শয়তানের

প্রবঞ্চনা। শয়তান তাকে ভাবতে বাধ্য করে যে, নিন্দুককে ঘৃণা করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপযোগী কল্যাণকর্ম। কিন্তু এর দ্বারা সে ধীরে ধীরে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

কাজেই যে শয়তানের চক্রান্ত ও নফসের আপদ বিপদ সম্পর্কে সচেতন নয় তার অধিকাংশ ইবাদত হয় বৃথা ক্লেশ। ফলে সে দুনিয়ায় বিলাসি হতে পারে না। আখেরাতেও তার লাভের পেয়ালা শূন্য থাকে। এদের বিষয়েই আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا . اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

বলুন, আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব আমলের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তলোকদের সম্পর্কে? পার্থিবজীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়। যদিও তারা মনে করে, তারা সৎকর্মই করছে। (সূরা কাহাফ : ১০৩-১০৪)

৪. ব্যক্তি প্রশংসাকে অপছন্দ করবে। স্তুতিকারীকে ঘৃণা করবে। আর এটাই হলো সতত ইবাদত।

সে প্রশংসাকে মনে করবে নিজের উপর আপতিত বিপদ। নিজের দীন ধর্মের উপর চেপে বসা মুসিবত।

বিপরীত দিকে সে নিন্দুককে পছন্দ করবে। মনে করবে নিন্দুক তার দোষগুলো ধরিয়ে দিচ্ছে। চিন্তাকে সংশোধন করে দিচ্ছে। ভালোকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। আর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমার পুণ্য ও তাকওয়া বিষয়ে অন্যদের আলোচনা ও অন্যদের মুখ থেকে প্রশংসা বাক্য শোনাকে অপছন্দ করা সবচেয়ে বড় বিনয়। (কিতাবুয যুহদ : ৮০৭)

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, ধ্বংস হোক রোযাদার, বিনাশ হোক নামাযী, নাশ হোক সুফিবাদীর। তবে..... সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, তবে বলতে কি বোঝাচ্ছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রিয়নবী (স) বললেন, তবে যারা নিজের মন থেকে দুনিয়াকে ঝেড়ে ফেলেছে। স্তুতিকারীকে অপছন্দ করেছে, নিন্দাকে ভালোবেসেছে (তারা মুক্তি পাবে)।

(হাফেয ইরাকি (র) বলেন, এই শব্দে এমন কোনো হাদিস আছে বলে আমার জানা নেই। তবে ফেরদাউস গ্রন্থকার উল্লেখ করেন, আনাস (রা)-এর এক হাদিসে বলা হয়েছে, যারা পশমের পোশাক পরিধান করে কিন্তু

কথার সাথে কাজের মিল থাকে না তার ধ্বংস হোক। কিন্তু গ্রন্থকারের পুত্র তার মুসনাদে" গ্রন্থে একই বর্ণনাটি অন্তর্ভুক্ত রাখেননি। বিস্তারিত দেখুন ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ২৫৯)

এই ধমকি আমাদের মতো মানুষের জন্য অনেক বড় বিপদ সংকেত।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সাধনার সীমা হলো দ্বিতীয় পর্যায় পর্যন্ত। অর্থাৎ আমরা প্রশংসা শুনলে মুখ বেজার করে রাখি কিন্তু মনে মনে ঠিকই খুশি হই।

প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে মানুষের যে চার অবস্থা হয় তার তৃতীয় প্রশংসার প্রভাব সমানভাবে বিদ্যমান থাকা। এই অবস্থা পর্যন্ত পৌছার কোনো চেষ্টা আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। উপরন্তু আমরা যদি নিজেদের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার কোনো আলামত খুঁজতে যাই তাহলে তাও খুঁজে পাবো না। কারণ প্রশংসাকারীকে সম্মান করতে, তার সেবা করতে আমাদের ভালোলাগে। আর যে আমাদের নিন্দা করে তারও সম্মান করতে, তার কোনো কাজ করে দিতে আমাদের মনে বাধে। কষ্ট অনুভব হয়। এভাবে আমরা বাহ্যিকভাবেও প্রশংসার আনন্দ ও নিন্দার ক্রোধ গোপন করতে পারি না। আর অন্তরের বিষয়ে তো আমাদের কোনো লাগামই নেই।

বর্তমান সময়ে যদি কেউ বাহ্যিকভাবে প্রশংসা ও নিন্দার মাঝে সমতা বিধান করতে পারে। এমন কাউকে পাওয়া গেলে আমাদের উচিত তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা। তবে এমন লোকের দেখা পাওয়া খুবই মুশকিল। তারা অনেকটা লাল স্বর্ণের মতো দুষ্পাপ্য। যাদের আলোচনা দিকে দিকে হয় শুধু, তাদের দেখা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় স্তরের মানুষেরাই যদি এমন হন, তাহলে ভেবে দেখুন, অন্য দুই তাবকার লোকদের অস্তিত্ব কি খুঁজে পাওয়া যাবে এই দুনিয়ায়? এই যে চার অবস্থার কথা বলা হলো এরও আবার কয়েক স্তর রয়েছে। এখানে কয়েকটি স্তরের কথা তুলে ধরা হলো।

কিছু লোক আছে যারা অন্যের থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে থাকে, নিজের খ্যাতিকে সে চার দিকে ছড়িয়ে দিতে চায়। এর জন্য সে সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করে। এমনকি সে ইবাদতে লৌকিকতার

আশ্রয় নেয় ভালোমন্দের বাছ বিচার না করে, হালাল-হারামের পরোয়া না করে সব কাজ সে করে যায়। লোকদের মনে স্থান করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সে এসব কাজ করে। লোকদের থেকে প্রশংসা পাওয়া হয় ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। এটা সরাসরি ধ্বংসাত্মক কর্ম।

অনেকে আছে যারা খ্যাতি চায়, কিন্তু প্রশংসা অর্জন করার জন্য তারা বৈধ কর্মের আশ্রয়ী হয়। তারা এবাদতে লৌকিকতা দেখায় না। সরাসরি মন্দ কর্মে লিপ্ত হয় না। এমন ব্যক্তি যেনো গভীর খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করতে গিয়ে যেকোনো সময় সে পা ফসকে গর্তে পড়ে যেতে পারে। তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যেতে পারে গর্হিত কোনো কর্ম।

অনেক মানুষ আছে যারা প্রশংসা চায় না এবং প্রশংসা অর্জনের পেছনে ছোটে না। কিন্তু কারও মুখ থেকে প্রশংসা বাক্য শুনলে তার মনে আনন্দের চোরা স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু মুজাহাদা করে যদি এমন আনন্দ ভাব থেকে মনকে ফেরানো না হয়, এবং মনের আনন্দবোধকে ঘৃণার চোখে দেখা না হয়, তাহলে সত্বরই হয়তো পূর্বে বর্ণিত লোকের মতো হয়ে যাবে। অর্থাৎ খাদের কিনারায় চলে যাবে। কিন্তু যদি মুজাহাদা করে নফসকে এমন আনন্দভাব থেকে মুক্ত করা যার এবং প্রশংসার সাথে আগত বিপদের কথা ভেবে যদি সে আনন্দকে ভুলতে পারে তাহলে সে মুজাহাদা নিয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকবে। কখনো তার মন মুজাহাদা করতে উদ্বুদ্ধ, কখনো মুজাহাদার বিরোধী হয়ে যাবে।

কিছু মানুষ আছে যারা প্রশংসা শুনলে আনন্দে ভাসে না আবার দুঃখে ভারাক্রান্তও হয় না। কারও মুখের প্রশংসা তার মনেকে প্রভাবিত করতে পারে না।

এই হলো কল্যাণের স্তর। যদি সে এই অবস্থার সাথে নিষ্ঠার সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকতে পারে তাহলে সে প্রভূত কল্যাণের মালিক হবে।

অনেকে আছে প্রশংসা অপছন্দ করে। কিন্তু সে প্রশংসাকারীর উপর ক্রোধান্বিত হয় না এবং তাকে অপছন্দও করে না। আর এই অবস্থার বিবরণের সর্বশেষ স্তর হলো, যে নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে না। কেউ প্রশংসা করলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে যায়। সত্য মনে সে রাগ প্রকাশ

করে। এমন হয় না যে, মনে খুশি আর মুখে সে ক্রোধ প্রকাশ করে, এটা সরাসরি নিফাক। কারণ সে নিজেকে নিষ্ঠাবান মুখলিস দাবী করছে। অথচ তার মনে এক্ষেত্রে কোনো ইখলাসই থাকে না।

এই আলোচনার উপর ভিত্তি করেই নিন্দার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থার ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।

এর প্রথম স্তর হলো নিন্দামূলক কথা বার্তা শুনে ক্রোধ প্রকাশ পাওয়া। সর্বশেষ অবস্থা হলো আনন্দিত হওয়া। আর নিন্দা শুনে সে আনন্দ প্রকাশ করবে নিজের ভেতরের পঙ্কিলতার কারণে। নিজের মধ্যে প্রচুর দোষ থাকার কারণে।

আপন শত্রুর নিন্দা করলে মানুষ নিন্দুকের উপর খুশি হয় এবং তার কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকে। নিন্দুকের মেধা ও বুদ্ধির প্রশংসা করে।

নিন্দুকের নিন্দার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের দোষ সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সেটা হয় নিজের জন্য আরোগ্য লাভের সুযোগ এবং অনেক বড় গণিমত।

নিন্দা লোকদের সামনে তার চরিত্রকে উন্মোচিত করে দেয়। তখন তাকে আর খ্যাতির বিড়ম্বনায় পড়তে হয় না। কোনো ভালো কাজের সম্বন্ধ তার দিকে করা হয় না। তখন সে বাধ্য হয়ে এমন দোষও নিজের থেকে দূর করে ফেলে যার থেকে মুক্ত হতে সে এতদিন অপারগ ছিলো।

মুরিদ যদি দীর্ঘদিন ধরে এই এক অবস্থার উপর মুজাহাদা করে অর্থাৎ প্রশংসা ও নিন্দাকে সমান চোখে দেখা, এর পেছনেই তার সারা জীবন অতিবাহিত হয়ে যাবে। কারণ এটা দুর্গম পর্বত। দীর্ঘ জীবন ধরে কঠোর সাধনা ছাড়া তার গিরি পার হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
লৌকিকতা ও রিয়া

এ পর্বে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন—

লৌকিকতার নিন্দা। রিয়ার প্রকৃতি। রিয়ার স্তর বিন্যাস। গোপন রিয়া। রিয়ার কারণে বিনষ্ট আমল। রিয়ার প্রতিরোধ। কখন প্রকাশ্যে ইবাদত করা যাবে? কখন নিজের ত্রুটি গোপন করা যাবে? রিয়ার কারণে ইবাদত ত্যাগ করার বিবরণ। মানুষের দেখার কারণে বান্দার মনে সৃষ্ট ইবাদতের উদ্দীপনার বৈধতা-অবৈধতা। ইবাদতের আগে-পরে ও মাঝখানে মুরিদের কর্তব্য। এ পর্বে মোট এগারোটি অনুচ্ছেদ সংযুক্ত হয়েছে। সামনে একে একে সবগুলোর আলোচনা তুলে ধরা হবে।

লৌকিকতার নিন্দা

কুরআন কারীমের আয়াত, হাদিস এবং বুযুর্গগণের বাণীর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত, রিয়া হারাম এবং রিয়াকার আল্লাহ তাআলার ক্রোধে নিপতিত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ.

সুতরাং ওই সমস্ত নামাযীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানো নামায পড়ে। (সূরা মাউন : ৪-৬)

আরও ইরশাদ হচ্ছে—

وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَ مَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ.

যারা কুকর্মের চক্রান্তে লিপ্ত, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই। (সূরা ফাতির : ১০)

মুজাহিদ (র) এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে উল্লিখিত লোকেরা হচ্ছে রিয়াকার বা লৌকিকতা প্রদর্শনকারী। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা শুধু তোমাদের আহার্য দেই। আমরা তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা চাই না। (সূরা ইনসান : ৯)

এখানে প্রশংসা করা হয়েছে আন্তরিকতাসম্পন্ন লোকদের। বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছু কামনা করে না। রিয়া হচ্ছে এরই বিপরীত বিষয়। অন্যত্র বলা হয়েছে—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا.

সুতরাং, যে তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন নেক আমল করে এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক সাব্যস্ত না করে। (সূরা কাহফ : ১১০)

এমন লোকদের ক্ষেত্রে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাদের ইবাদত ও নেক আমলের পারিশ্রমিক ও প্রশংসা কামনা করতো। (মুসতাদরাকে হাকেম : ২ : ১১১)

নবী কারীম (স)-কে এক লোক প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কীসের মধ্যে মুক্তি নিহিত? তিনি বললেন,

اَنْ لَّا يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ يُرِيْدُ بِهَا النَّاسَ.

'আল্লাহর আনুগত্যে এমন কাজ না করার মধ্যে, যার উদ্দেশ্য হয় মানুষ।' (সুয়ূতি আদ দুররুল মানসুব : ১ : ৭৪)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা শহীদ, দাতা ও ক্বারীদের বলবেন— তুমি মিথ্যুক। তুমি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করনি। বরং এজন্যে করেছ, মানুষ যাতে তোমাকে বীর বলে। তুমি আল্লাহর জন্য দান করনি; বরং দানবীর বলে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য করেছ। তুমি আল্লাহর জন্য কুরআন পাঠ করনি; বরং ক্বারী খ্যাতি লাভ করার জন্য করেছ। এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তারা সওয়াব পায়নি এবং রিয়া তাদের সকল কর্ম ধ্বংস করে দিয়েছে। (সহিহ মুসলিম : ১৯০৫)

ইবনে ওমর (রা) বলেন, নবী কারীম (স) বলেছেন, যে অন্যের সাথে লৌকিকতা প্রদর্শন করে আল্লাহ তার সাথে এমন আচরণ করেন। যে অন্যকে শুনিয়ে খ্যাতি অর্জন করতে চায় আল্লাহ তার সাথে তেমন আচরণই করেন। (সহিহ বুখারি : ৬৪৯৯; সহিহ মুসলিম : ২৯৮৭; জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রে। গ্রন্থকার উল্লিখিত রাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সূত্রে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) তার আয যুহদ গ্রন্থে। তবে সেখানে তাদের কিছু তারতম্য রয়েছে। গ্রন্থকার বর্ণিত হুবহু শব্দে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন মুহাসেবি (র) তার "আর রিআয়া" গ্রন্থে তবে সেখানে হাদিসের বর্ণনাকারী হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)।)

অন্য এক দীর্ঘ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, এই ব্যক্তি তার কর্মের নিয়ত আমার জন্য খালেস রাখেনি। তাকে ধরে সিজ্জিনে (জাহান্নামের নাম বিশেষ) নিক্ষেপ করো। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ৪৫২; আবুশ শায়খ : আল-আযমাহ : ৫২০- যামরা ইবনে হাবিবের সূত্রে মুরসাল সনদে)

অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে— আমি যেসব বিষয়ের আশঙ্কা তোমাদের জন্য করি, সেগুলোর মধ্যে অধিক ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে "শিরকে আসগর" বা ছোটো শিরক। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ছোটো শিরক কী? তিনি বললেন, রিয়া। এরপর তিনি ইরশাদ করলেন,

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً.

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন বান্দার আমলের পুরস্কার দিবেন, তখন বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করতে, তাদের নিকট যাও, এরপর দেখ তাদের নিকট কোনো পুরস্কার পাও কি না? (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ৪২৮; তাবারানি : মুজামে কাবির : ৪ : ২৫৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬৪১২)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে "হাযান" থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, আল্লাহর রাসূল! "হাযান" কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "হাযান" হলো জাহান্নামের

একটা উপত্যকা। রিয়া কারদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে। (জামে তিরমিযী : ২৩৮৩; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৫৬)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে কোনো আমল করতে গিয়ে তাতে অন্য কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্য করে, আমার এমন লোকের আমলের দরকার নেই। যাকে দেখানোর উদ্দেশ্য সে আমল করছে তাকেই সে দেখাক। আর কখনোই আমার কোনো অংশিদারের প্রয়োজন হবে না। (সহিহ মুসিলম : ২৯৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৫৬)

নবী কারীম (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো ব্যক্তির ইবাদত কবুল করেন না যার মধ্যে সামান্য লৌকিকতা রয়েছে। (হাফেয ইরাকি (র) বলেন, মারফু সূত্রে এমন কোনো হাদিস আমি পাইনি। তবে আবু নুআইম (র) হিলইয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে একে ইউসুফ ইবনে আসবাতের বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।)

একদিন ওমর (রা) মুয়ায (রা) কে কাঁদতে দেখে বললেন, কি কারণে তুমি কাঁদছো? মুয়ায (রা) বললেন, আমি এই কবরে শায়িত ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি; লৌকিকতার সর্বনিম্ন স্তর হলো শিরক। (তাবারানি : আল মুজামুল কাবির : ২০ : ৩৬; অনুরূপ অর্থে সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৯৮৯)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের যেসব বিষয়ে আমি ভীত করতে চাই তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো লৌকিকতা ও সুপ্ত প্রবৃত্তি। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১১১৪; আবু নুআইম হিলইয়াতুল আউলিয়া : বায়হাকি : আয যুওহদুল কাবির : ৩১৬; অনুরূপ অর্থে : সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২০৫ শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) -এর সূত্রে)

আর সুপ্ত প্রবৃত্তি দ্বারা লৌকিকতার সূক্ষ্ম দিকই উদ্দেশ্য।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন যে বাম হাতের কাছে লুকিয়ে ডান হাতে দান করেছে সে আরশের ছায়ার আশ্রয় পাবে। (দীর্ঘ হাদিসের একাংশ : সহিহ বুখারি : ৬৬০; সহিহ মুসলিম : ১০৩১)

এজন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকাশ্য আমলের চেয়ে গোপন আমলের সাওয়াব সত্তর গুণ বেশি। (বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ৫৫১; অনুরূপ অর্থে হাদিস উল্লেখ রয়েছে আবুদ দারদা (রা) তার সূত্রে : ৬৩৯৪)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কেয়ামতের দিন রিয়াকারি ব্যক্তিকে ডাকা হবে, ওহে ফাজের ওহে গাদ্দার, রিয়াকার, তোমার সব আমল তো বরবাদ হয়ে গেছে। কোনো প্রতিদান পাওয়ার আশা তোমার আর নেই। যাও, যাকে দেখাতে আমল করতে তার কাছ থেকে প্রতিদান নাও। (আবুল লাইস সামারকান্দি তামবিহুল গাফিলিন : ৩৩; তবে সেখানে হে রিয়াকার, এই বাক্যাংশ নেই।)

শাদদাদ ইবনে আওস (রা) বলেন, একদিন আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ (স) কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন কাঁদছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি শিরকের ভয় করছি না, তারা মূর্তি পূজা করবে না। চাঁদ তারা সূর্য কিংবা কোনো জড়ো বস্তুর সামনে মাথা ঝুঁকাবে না। কিন্তু তারা রিয়াকারী হয়ে যাবে। তারা লোক দেখানো কাজ কর্ম করতে শুরু করবে। (আর রিআয়া : ১৬৪)

ঈসা (আ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, তখন মাথায় ও দাড়িতে যেন তেল মেখে নেয় এবং ঠোঁটের উপর যেন হাত বুলিয়ে নেয়, মানুষ যাতে তাকে রোযাদার মনে না করে। যখন কেউ ডান হাতে কোনো কিছু দান করে, তখন যেন বাম হাত তা টের না পায়। আর নামায আদায়ের সময় দরজায় পর্দা ছেড়ে দেওয়া উচিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা প্রশংসাও তেমনি বণ্টন করেন, যেমন বণ্টন করেন রুজি। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১৫০)

এক হাদিসে আছে, আল্লাহ তা'আলা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন তার উপরস্থিত বস্তুসমূহ কম্পন আরম্ভ করল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা পাহাড়পর্বত সৃষ্টি করে সেগুলোকে পৃথিবীর জন্য পেরেক হিসেবে স্থাপন করে দিলেন। ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করল, আল্লাহ তাআলা পর্বতের চেয়ে অধিক শক্ত কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি। এরপর আল্লাহ তাআলা লৌহ সৃষ্টি করলেন। সে পাহাড়-পর্বত কেটে দিল। এরপর আল্লাহ আগুন সৃষ্টি করলেন। আগুন লোহাকে গলিয়ে দিল। এরপর পানিকে হুকুম করা হলো। সে আগুন নিভিয়ে দিল। এরপর বাতাসকে হুকুম করা হলো। সে পানিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। এসব কাণ্ড দেখে ফেরেশতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল, এদের মধ্যে সবচে শক্তিশালী কে? তারা বলল, এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করাই ভালো।

তারা আরয করল, হে আল্লাহ! আপনার সৃষ্টির মধ্যে কোন বস্তুটি সর্বাধিক শক্তিশালী? ইরশাদ হলো, আমার নিকট সবচেয়ে বেশি শক্ত আদম সন্তানের দিল। সে ডান হাতে দান করে; কিন্তু বাম হাতকে তা জানতে দেয় না। তার চেয়ে অধিক শক্ত কোনো বস্তু আমি সৃষ্টি করিনি। (জামে তিরমিযী : ৩৩৬৯)

জনৈক ব্যক্তি মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত কোনো একটা হাদিস আমাকে শোনান।

রাবী বলেন, একথা শুনে মুআয (রা) অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন। আমার তো মনে হলো আর কখনো তার কান্না থামবেই না। এক সময় তার কান্না থেমে গেলো। তারপর বললেন,

আমি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছি, তিনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন, মুআয! বললাম, রাসূলুল্লাহ, আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন, শোনো, আমি তোমাকে একটা হাদিস শোনাচ্ছি। এই কথাগুলো মনে রাখতে পারলে তোমার লাভ হবে। না হলে কেয়ামতের দিন তোমার যুক্তি ফুরিয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা আসমান জমিন সৃষ্টি করার আগে সাতজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। তারপর আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রবল প্রতাপ দিয়ে প্রত্যেক আসমানে একজন করে প্রহরী নিয়োগ করেছেন।

আমলের সংরক্ষক ফেরেশতারা বান্দার সকাল থেকে সন্ধ্যার আমল নিয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করে। বান্দার সে আমল হবে সূর্যের আলোর মতো বিচ্ছুরিত। ফেরেশতা বান্দার পবিত্র ও প্রচুর আমল নিয়ে প্রথম আসমানে যাবে। প্রহরী ফেরেশতা তাকে বলবে, আমলকারীর মুখে তুমি এই আমল ছুড়ে মারো। আমি গীবতের ফেরেশতা। আমাকে আল্লাহ আদেশ করেছেন, পরচর্চাকারী কোনো ব্যক্তির আমল যেনো আমি উপরে না পাঠাই।

তারপর সংরক্ষক ফেরেশতা নেক বান্দার প্রচুর ও পবিত্র আমল নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে আসবে। তখন সেখানের দায়িত্বরত ফেরেশতা বলবেন, থামো! আমলকারীর মুখে এইসব আমল ছুড়ে মারো গিয়ে!! এসব আমল দ্বারা সে তো দুনিয়া কামাই করতে চেয়েছে। এসব আমল উপরে পাঠাতে আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছেন। এগুলোকে তো লোকদের মজলিসে নিজেদের গর্বের বিষয় হিসেবে বলে বেড়াতো।

আলেম সংরক্ষক ফেরেশতা জ্যোতির্ময় সাদাকা, সিয়াম সালাতের মতো মুগ্ধকর আমল নিয়ে তৃতীয় আসমানে আসবে। তখন সেখানের দায়িত্বরত ফেরেশতা বলবেন, ফিরে যাও, আমলকারীর মুখে এসব আমল ছুড়ে মারো। সে তো এসব নিয়ে লোকদের মাঝে অহংকার করে বেড়াতো। আমি হলাম আমলের ফেরেশতা। কোনো অহংকারীর আমল আমাকে অতিক্রম না করার বিষয়ে আমি আদিষ্ট হয়েছি।

সংরক্ষক ফেরেশতা তখন সন্ধ্যাতারার মতো জ্বলজ্বলে আমল যার মধ্যে থেকে ভেসে আসবে তাসবিহ্ তাহলিল সালাত সিয়াম হজ ওমরার গুঞ্জন এগুলো নিয়ে সে চতুর্থ আসমানে পৌঁছবে, চতুর্থ আসমানের দায়িত্বরত ফেরেশতা তাকে থামিয়ে বলবে, দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে এসব আমল তুমি আমলকারীর মুখে ছুড়ে মারো। কারণ নিজের আমল তাকে মুগ্ধ করে রাখতো। আর আমি উজব তথা মুগ্ধতার ফেরেশতা। মুগ্ধতাপূর্ণ আমল ফিরিয়ে দিতে আমি আদিষ্ট হয়েছি।

বান্দার বাসর শয্যার মতো গোছানো আমল নিয়ে এরপর সংরক্ষক ফেরেশতা পঞ্চম আসমানে উপনীত হবে। সেখানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা তাকে থামিয়ে বলবে, এই আমলের বোঝা আমলকারীর মুখে মারো ও তার কাঁধে চাপিয়ে দাও। লোকদের সাথে হিংসা করার জন্য সে সব কাজ করতো। এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও সে অন্যকে হিংসা করতো। আমি হিংসার ফেরেশতা। তার আমল উপরে পাঠাতে আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছেন।

বান্দার সালাত সিয়াম, হজ, ওমরা যাকাতের বিপুল বহর নিয়ে সংরক্ষক ফেরেশতা ষষ্ঠ আসমানে উপনীত হবে। তখন সেখানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা তাকে থামাবে এবং বলবে, এ আমল নিয়ে তুমি আমলকারীর মুখে নিক্ষেপ করো। কারণ কোনো রোগ-শোক, দুর্ভাগ্যপীড়িত ব্যক্তির প্রতি সে কোনোদিন রহম করেনি। দয়া দেখায়নি। বরং তাদের বিপদে হেসেছে। আর আমি দয়ার ফেরেশতা। আল্লাহ আমাকে এই আমল অন্য কারও কাছে যেতে দিতে নিষেধ করেছেন।

তারপর তিন হাজার ফেরেশতার একটা দল সংরক্ষক ফেরেশতার সাথে এক ব্যক্তির আমল নিয়ে আসবে। যে আমলের মধ্যে থাকবে সালাত, সিয়াম, যাকাত, দান-সাদাকা, খোদাভীতির মতো সব বিষয়। তার

আমলনামা থেকে বজ্রের মতো শব্দ বের হবে। সূর্য কিরণের মতো আলো বিচ্ছুরিত হবে। তারা সবাই সপ্তম আসমানে আসবে। এবং দায়িত্বরত ফেরেশতার কাছে বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাদেরকে সে বলবে, থামো তোমরা ফিরে যাও দুনিয়ার এই আমলকারীর কাছে। এসব আমল ছুড়ে মারো তার মুখে। আঘাত করো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। কপাট লাগিয়ে দাও তার হৃদয়ের উন্মুক্ত দারে।

আমার রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে করা আমল আমি রবের কাছে যেতে বাধা দেই। কারণ সেতো জ্ঞানীদের আসরে উঁচু পদ পেতে চেয়েছে। আলেমদের মাঝে সুখ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছে। দূর-দূরান্তে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে চেয়েছে। আল্লাহ আমাকে এই ব্যক্তির আমল উপরে পাঠাতে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে করা আমল লৌকিকতা। আর আল্লাহ তাআলা লৌকিকতার আশ্রয়ী ব্যক্তির আমল কবুল করেন না।

এরপর সংরক্ষক ফেরেশতা সব বাধা অতিক্রম করে বান্দার নামায রোযা, হজ, যাকাত সদকা, সচ্চরিত্রতা, দীর্ঘ নিরবতা ও আল্লাহর যিকিরের মতো নেক আমল নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপনীত হবে। সে আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বান্দার সর্বসময় সৎকর্মের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ বলবেন, তোমরা তো আমার বান্দার আমল সংরক্ষণ করো। আর আমি তাদের হৃদয় পর্যবেক্ষণ করি। এই যে তোমরা আমলসমূহের কথা বললে, এর একটা সে আমার জন্য করেনি। অন্য কারও উদ্দেশ্যে করেছে। তার উপর আমার লানত।

সকল ফেরেশতা তখন বলবে, তার উপরে আপনার লানত, আমাদেরও লানত।

সাত আসমান বলবে, তার উপর আল্লাহর লানত। আমাদের লানত এবং সপ্ত আসমান ও তার মধ্যস্ত সবকিছুর লানত।

মুয়াজ রাযি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আল্লাহর রাসূল, আমি (নগন্য বান্দা) মুয়ায। (পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হলে আমরা উদ্ধার পাবো কি করে?)

জীবন সায়াহ্নে চলে এলেও তুমি আমাকে অনুসরণ করে চলো।

মুয়ায, তুমি তোমার মুসলিম ভাইদের নিন্দা করো না। নিজের দোষ নিজের ঘাড়ে নাও। তাদের উপর চাপাতে চেষ্টা করো না। তাদের কুৎসা করা

থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। নিজেকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে যেয়ো না। পার্থিব কর্মকে আখেরাতের আমলের সাথে গুলিয়ে ফেলো না। তোমার মন্দতা থেকে লোকদের সতর্ক করতে মজলিসে বড়াই করে বেড়িয়ো না। এক লোককে পাশে রেখে অন্য কারও সাথে কানে মুখে কথা বলো না। মানুষের মাঝে বড় হতে চেয়ো না। দুনিয়ার কল্যাণ তাহলে হারাবে। জনবিচ্ছিন্ন হয়ো না। তাহলে কেয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের কুকুর জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا এবং যারা মৃদুভাবে (মুমিনদের প্রাণ) বন্ধনমুক্ত করে দেয়। (সূরা : নাযিয়াত : ২)

মুয়ায! তুমি কি জানো এটা কি? মুয়ায (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! কি সেটা?

তিনি বললেন, এগুলো হলো জাহান্নামের কুকুর। (আঁচড়ে কামড়ে সেগুলো) হাড় মাংস ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে।

আমি বললাম, এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে কে মুক্তি পাবে? আর কার সাথেই বা এমন আচারণ করা হবে? তিনি বললেন, মুয়ায, আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন বিষয়টা তার জন্য খুবই সহজ ও সুখদায়ক।

মুয়ায (রা) বললেন, এই হাদিসের সতর্ক বার্তা থেকে মুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো কুরআন তেলাওয়াত করা। (হাফেয ইরাকি (র) বলেন, এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক : কিতাবুয যুহদ গ্রন্থে। তবে এই হাদিসের সনদে দুর্বল একজন রাবি রয়েছেন। দেখুন ইবনুল যাওজি প্রণীত : আল মাউজুআ : ২ : ৩৩৯; বিস্তারিত দেখুন ইতহাফ : ৮ : ২৬৬)

তাকি উদ্দীন কুশায়রি (র) দুর্বল রাবির নামে উল্লেখ করেছেন খালেদ ইবনে মাদান)

ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে মাথা নিচু করে রেখেছে। তিনি বললেন, ওহে অবনত মস্তক ব্যক্তি! শুধু মাথা নুইয়ে থাকায় খুশু প্রকাশ পায় না। প্রকৃত খুশুর অবস্থান হলো অন্তর। (ইসমাঈলি আল মানাকিব : ৮ : ২৬৭)

আবু উমামা বাহেলি (রা) দেখলেন, এক লোক মসজিদে সেজদাবনত অবস্থায় খুব কাঁদছে। তিনি লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই কাজ যদি তুমি নিজ বাড়িতে বসে করতে তাহলে কতইনা ভালো হতো! (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১৫৬)

আলী (রা) বলেন, রিয়াকারকে চেনার উপায় চারটি —

ক. একা থাকলে ইবাদতে গড়িমসি করে।

খ. মানুষের মাঝে থাকলে ভালো কাজে দ্রুত ছুটে যায়।

গ. প্রশংসা করলে আমল বৃদ্ধি পায়।

ঘ. নিন্দা করলে আমল করা ছেড়ে দেয়। (লাইস সামারকান্দি : তামবিহুল গাফিলিন : ৩০; আবু সুলাইমানের সূত্রে সালাবি তার তাফসির গ্রন্থে অনুরূপ হাদিস উল্লেখ করেন : ২ : ৭; সেখানে তিনটি আলামতের কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ আলামতের উল্লেখ সেখানে নেই।)

এক লোক উবাদা ইবনে সামেত (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবো। সাথে অন্যের প্রশংসা অর্জন কামনা করবো। এক্ষেত্রে কি আমি কোনো সওয়াব পাবো।

উবাদা ইবনে সামেত (রা) উত্তর দিলেন, তুমি কিছুই পাবে না। লোকটি এই প্রশ্ন তিনবার করলো, কিন্তু প্রতিবার সে একই উত্তর পেলো। উবাদা (রা) তৃতীয়বার বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার কখনোই কোনো অংশিদারের প্রয়োজন নেই। (আর রিআয়া : ১৬৬)

এক লোক সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-এর কাছে জানতে চাইলো, আমাদের মধ্য থেকে এক লোক আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভ এবং লোকদের থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য ভালো কাজ করে। এই লোকের কাজে কি কোনো কল্যাণ আছে? সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বললেন, তুমি কি চাও তোমার উপর গযব নাযিল হোক?

লোকটি বললো না!! সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বললেন, তাহলে আল্লাহর জন্য কোনো কাজ করলে নিয়তকে একনিষ্ঠ রাখো। (আর বিআয়া : ১৬৬)

দাহকাক (র) বলেন, কেউ যেনো এমন না বলে, আমি এই কাজটি আল্লাহর এবং তোমার জন্য করছি। এমনও যেনো না বলে, এটা আল্লাহ ও আত্মীয়দের জন্য। কারণ আল্লাহ সর্বদা অংশীদার মুক্ত। (ইবনু আবি শায়বা! আল মুসান্নাফ : ৩৫৯৩৭; সুনানু দারা কুতনি : ১ : ৫১)

ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে দোররা দিয়ে আঘাত করলেন। তারপর ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পেরে লোকটিকে বললেন, আমাকে তুমি আঘাত করো। লোকটি বললো, না আমি আঘাত করবো না। বরং আল্লাহর জন্য আমি

ক্ষমা করে দিবো। একথা শুনে ওমর (রা) বললেন, তুমি তো দেখছি দু কুল হারাতে বসেছো। মাফ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কোনো একটা নিয়ত করো। হয় পুরোপুরি আমার দিকে লক্ষ করে আঘাত করা ত্যাগ করো। তাহলে আমি তোমার ইহসান মনে রাখবো। না হয় পুরোপুরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করো। তখন লোকটি বললো, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করলাম। ওমর (রা) বললেন, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। (আর রিআয়া : ১৬৬; ইবনু আসাকির তারিখু দিমাশক : ৪৪ : ২৯ দীর্ঘ এক খবরের অংশ হিসেবে।)

হাসান বসরি (র) বলেন, আমি এমন একদল মানুষের সঙ্গে থেকেছি, তাদের কেউ যদি হেকমতের কথা বলতেন তাহলে হেকমত দ্বারা নিজে উপকৃত হতেন এবং তার সাথিরাও উপকৃত হতো। কিন্তু প্রসিদ্ধির ভয়ে তারা এ কাজ থেকে বিরত থেকেছেন।

তাদের অবস্থা ছিলো এমন যে, তারা যদি কষ্টদায়ক কোনো বস্তু রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন তাহলে নাম ছড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা সেটাও দূর করেন না। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১৩৮)

লৌকিকতার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন চারটি নামে ডাকা হবে— ১. হে রিয়াকার, ২. হে গাদ্দার, ৩. হে পাপিষ্ট, ৪. হে ক্ষতিগ্রস্ত, যাও, যার উদ্দেশ্যে তোমার রুকু সিজদা হতো তার কাছ থেকে বিনিময় চেয়ে নাও। আমাদের কাছ থেকে তুমি কিছুই পাবে না। (আর রিআয়া : ১৬৩; লাইস সামার কান্দি তামবিহুল গাফিলিন : ৩৩)

ফুযাইল ইবনে আয়ায (র) বলেন, আগে লোকেরা যা করতো তা নিয়ে রিয়া করতো। এখন মানুষ এমন হয়েছে, যা সে করে না তাতেও রিয়ার আশ্রয় নেয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ২৬৮)

ইকরিমা (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা নিয়তের বিনিময়ে মানুষকে যে প্রতিদান দেন আমলের বিনিময়ে তা দেন না। কারণ নিয়ত লৌকিকতা মুক্ত থাকে। (দায়লামি : মুসনাদুল ফিরদাউস : ৬৮৪৩ আবু মুসা আশআরি (রা)-এর সূত্রে।)

হাসান বসরি (র) বলেন, রিয়াকার ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যকে উপেক্ষা করতে চায়। সে তো আল্লাহর কাছে মন্দ ব্যক্তি। কিন্তু লোকদের মুখ থেকে সে বের করাচ্ছে, সে কত ভালো লোক! বাস্তবে সে সৎ লোক

কি করে হবে! আল্লাহর কাছে তার স্থান নিকৃষ্টদের সাথে। কাজেই মুমিনদের এর পরিচয় লাভ করা আবশ্যক! (হিলইয়াতুল আউলিয়া; বিস্তারিত জানতে দেখুন : ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ২৬৮)

কাতাদা (র) বলেন, মানুষ যখন লৌকিকতা প্রদর্শন করে তখন আল্লাহ বলেন, এই দেখো আমার বান্দা, আমাকে নিয়ে উপহাস করছে!! (দাইনুরী আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ২৯৩)

মালেক ইবনে দিনার (র) বলেন, কারী তিন ধরনের হয়— ১. রাহমানের কারী। ২. দুনিয়ার কারী। ৩. রাজা-বাদশাহদের কারী। এ বিচারে মুহাম্মদ ইবনে ওয়াস রাহমানের কারী : (আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২ : ৩৪৫)

ফুযাইল ইবনে আয়ায (র) বলতেন, কেউ যদি রিয়াকারী দেখতে চায় সে যেনো আমার দিকে তাকায়।

মুহাম্মদ ইবনুল মুবারক সওয়ারি বলেন, "তোমরা ইবাদতের জন্য রাতের পথ ধরো। কারণ তা দিবসের ইবাদতের চেয়ে বেশি সম্মানীয়। কারণ দিবসের ইবাদত হয় মাখলুকের জন্য। আর রাতের ইবাদত হয় রাব্বুল আলামিনের জন্য।

আবু সুলায়মান (র) বলেন, আমল করার চেয়ে আমলের মধ্যে আল্লাহ ভীতি থাকা বেশি কঠিন।

মারফু সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত রয়েছে। যেমন বায়হাকি শুআবুল ঈমান : ৬৩৯৪; আবু দারদা (রা) তার সূত্রে।)

ইবনুল মুবারাক (র) বলেন, মানুষ ইচ্ছা করলে খোরাসানে বসেও বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারে। জানতে চাওয়া হলো, কীভাবে তা সম্ভব?

ইবনুল মুবারক (র) বললেন, আল্লাহর ঘরের পাশে থাকার বাসনা মনে থাকলেই তা সম্ভব।

ইবনে আদহাম (র) বলেন, যে খ্যাতি চায় সে আল্লাহর বিষয়ে সত্য বলে না।" আবু নুআইম : হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ৩১; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬৫৭৬)

রিয়ার প্রকৃতি

রিয়া শব্দটি আরবি 'রুইয়ত' ধাতু মূল থেকে উদ্ভূত। অর্থ, দেখা। অনুরূপভাবে খ্যাতির অর্থে ব্যবহৃত "সুমআ" শব্দটি "সেমা" ধাতু মূল

থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ শ্রবণ করা। রিয়ার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে মানুষকে ভালো স্বভাব-চরিত্র দেখিয়ে তাদের নিকট মর্যাদাবান হওয়া। যেহেতু ইবাদত দ্বারাও যশ ও মর্যাদা হাসিল হতে পারে, তাই সাধারণের পরিভাষায় লৌকিকতা বিশেষভাবে সেই অবস্থাকে বলা হয়, যাতে ইবাদতের দিক দিয়ে অন্তরে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং, এখানে চারটি বিষয় একত্রিত রয়েছে। (১) রিয়াকার। সে হচ্ছে ইবাদতকারী। (২) যার কারণে রিয়া করা হয়। সে হচ্ছে মানুষ। মানুষকে দেখানোই উদ্দেশ্য থাকে। (৩) যা দেখানো উদ্দেশ্য; অর্থাৎ, ইবাদত ও অভ্যাস, যা রিয়াকার প্রকাশ্যে করতে চায়। (৪) স্বয়ং রিয়া; অর্থাৎ, ইবাদত প্রকাশ করার ইচ্ছা।

মানুষ পাঁচ ধরনের জিনিসের মধ্যে রিয়া করতে পারে– শরীর, আকার-আকৃতি, কথা, কর্ম ও সঙ্গী-সাথি। কিন্তু ইবাদত নয়— এমন বস্তুতে রিয়া করা ইবাদতে রিয়া করার তুলনায় দুর্বল।

শরীর দেখানো হচ্ছে রিয়ার প্রথম প্রকার। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এর পদ্ধতি শরীরে ক্ষীণকায়-শীর্ণকায় ও ফ্যাকাসে ভাব জাহির করা, যাতে মানুষ মনে করে, এ ব্যক্তি ধর্মকর্মে খুব পরিশ্রম করে এবং তার মধ্যে ধর্মের ভয় খুব বেশি। অথবা সে কম খাওয়া-দাওয়া করে। কিংবা ফ্যাকাসে ভাব দেখে মানুষ ধারণা করে যে, সে রাত জেগে থাকে এবং ইবাদত করে। ক্ষীণস্বরে কথা বলা, চক্ষু কোটরাগত হওয়া ও ঠোঁট শুষ্ক থাকা। এগুলো দ্বারা বোঝা যায়, লোকটি বেশি বেশি রোযা রাখে। এজন্যই ঈসা (আ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে; তখন যেন মাথায় তেল মালিশ করে, চিরুনি করে এবং চোখে সুরমা ব্যবহার করে। ধার্মিক ব্যক্তিরা এভাবে শরীর প্রদর্শন করে। কিন্তু দুনিয়াদাররা এর বিপরীতে, স্বচ্ছবর্ণ, সুঠাম দেহ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করে।

দ্বিতীয় প্রকার রিয়া হচ্ছে আকার-আকৃতি ও পোশাক দেখানো। যেমন, মাথার চুল এলোমেলো রাখা, গোঁফ মুণ্ডন করা, রাস্তায় মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে চলা, কপালে সিজদার চিহ্ন থাকা এবং ময়লা ও ছেঁড়াফাটা জামা পরিধান করা। এগুলো এজন্য করা হয়, যাতে বোঝা যায় যে, লোকটি সুন্নতের অনুসারী এবং আল্লাহর নেক বান্দা। এর মধ্যে আবার রয়েছে তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করা এবং সুফীগণের অনুসরণ করে নীল রঙের পোশাক পরা, আলেম না হয়েও আলেমদের বিশেষ পোশাক পরিধান করা, যাতে মানুষ তাকে একজন আলেম মনে করে, এটাও রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

পোশাক পরিচ্ছেদ নিয়ে লৌকিকতা করার কয়েকটি স্তর রয়েছে।

কিছু লোক আছে যারা বাহ্যিকভাবে দুনিয়াবিমুখতা প্রকাশ করে নেক লোকদের চোখে ভালো সাজতে চায়। তাই তারা ছেড়া, মোটা, খাটো নোংরা পোশাক পরিধান করে। এসব দিয়ে সে দেখাতে চায়, আসলেই তার মনে দুনিয়ার প্রতি কোনো টান নেই। কিন্তু কখনো যদি তাকে শরীরের নোংরা জামা খুলে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মতো মধ্যম মানের পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে বাধ্য করা হয় তাহলে সে মনে মনে ভাববে এর চেয়ে মরণ অনেক সহজ ছিলো। কারণ তার মনে ভয় রয়ে গেছে যে, এতদিন ধরে নোংরা ছেড়া ফাড়া মোটা পোশাক পড়ে সে দুনিয়াবিমুখ হিসেবে মানুষের মাঝে যে খ্যাতি অর্জন করেছে, তা বুঝি সব ধূলোয় মিটে গেলো। এই পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করানোর কারণে লোকেরা হয়তো ভাবছে, সে আবার দুনিয়াদার হয়ে গেছে।

আরেক দল লোক রয়েছে যারা চূড়ান্ত সুবিধাবাদী। তারা চায় নেক লোকদের কাছে তারা প্রিয় থাকুক। আবার দুনিয়াদারদের চোখে তাদের মর্যাদা খাটো না হোক। রাজা-বাদশা, উযির-নাজির ধনবান ব্যবসায়ী সবাই তাকে সম্মান করুন। তারা পড়ে সংকটে। তারা যদি রত্নখচিত দামি পোশাক পরে তাহলে দুনিয়াবিমুখ সাধাসিধা নেক লোকেরা তাকে ফিরিয়ে দেবে। আবার যদি ছেড়াফাড়া তালি লাগানো অপরিচ্ছন্ন কাপড় সে পরে, তাহলে আমিরদের জমকালো মজলিসে সে স্থান পাবে না। তাই তারা উভয় পক্ষ অর্থাৎ দীনদার ও দুনিয়াদার সবাইকে খুশি করে চলতে চায়। সে লক্ষ্যে তারা পশমের মোটা উচ্চমূল্যের রঙিন তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করে। কিন্তু বাহির থেকে দেখে বোঝা না গেলেও তাদের গায়ের পোশাকের দাম আমীরদের পোশাকের চেয়েও বেশি। তবে তাদের পোশাকের রং হয় আবেদদের পোশাকের রঙের মতন।

এইসব লোককে যদি কোনোদিন অপরিচ্ছন্ন নোংরা কাপড় পরানো হয়, তারা যেনো মরেই যাবে। কারণ তাদের মনে ভয় থেকেই যায়, এ পোশাকে দেখলে আমির ওমারাদের চোখে হয়তো তার মর্যাদা কমে যাবে। আবার যদি তাদেরকে রেশম বা সুতির চাকচিক্যপূর্ণ দামী কোনো পোশাক পরতে দেওয়া হয় তাহলেও তাদের মরার অবস্থা হয়। কারণ এতে দুনিয়াবিমুখদের কাতার থেকে নিজের নামটা কাটা হয়ে যাওয়ার

আশঙ্কা থাকে। তারা ভাবে, নেককাররা হয়তো তাকে বলবে, সে তো দুনিয়ার বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে পড়েছে। এইসব স্তরের লোকেরা নিজেদের স্তর অনুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদও আলাদা করে। তাই কেউ যদি আপন স্তর থেকে এক ধাপ নিচে নেমে যায় কিংবা উপরের বৈধ কোনো স্তরে ওঠে যায় তারপর অন্যের নিন্দার ভয়ে বিষয়টা সহ্য করা ও মেনে নেওয়া তার পক্ষে খুব কঠিন হয়ে দেখা দেয়।

আর যারা পার্থিব জীবনের অভিলাষী তারা দামী দামী পোশাক পরে, মূল্যবান বাহনে চড়ে এবং বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রকার বিলাসী সামগ্রী দিয়ে ঘর ভরে ফেলে। তারা রঙিন পোশাক পরে। দামী চাদর শরীরে জড়ায়। তার সব কিছু হয় মানুষের চোখের সামনে। তারা বাড়িতে সাধারণ পোশাক পরে। কিন্তু ঘরের পোশাকে বাইরে বের হওয়াকে নিজের জন্য প্রচণ্ড লজ্জার কারণ মনে করে।

তৃতীয় প্রকার রিয়া হলো কথা। অর্থাৎ, লোক দেখানোর জন্য ওয়ায-নসীহত করা, জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বলা, দৈনন্দিন ব্যবহার করার জন্য হাদিস ও মনীষীদের উক্তি মুখস্থ করা, মানুষের সামনে যিকিরের জন্য ঠোঁট নাড়াচাড়া করা, মানুষের সামনে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।

মন্দ দেখলে ক্রুদ্ধ হওয়া, অন্যকে অন্যায় করতে দেখলে আপসোস করা। নিচু স্বরে কথা বলা। ভয় ও দুঃখবোধ প্রকাশ করার জন্য চিকন স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা। অনেক হাদিস মুখস্থ করা। বড় বড় শায়খদের হাদিস শোনার দাবী করা। হাদিসশাস্ত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য হাদিস বর্ণনায় শাব্দিক ত্রুটি সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করা। নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার জন্য হাদিস সহিহ না যয়িফ তা নিয়ে বিতর্ক করা। দীনি বিষয়ে দক্ষতা প্রমাণ করার লক্ষ্যে, বিপক্ষকে হারানোর উদ্দেশ্যে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া।

এগুলো হলো কথা দ্বারা লৌকিকতা প্রকাশের কয়েকটি প্রকার। যা দীনি ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়। নামধারী আলেমদের থেকে যা প্রকাশ পায়।

আর দুনিয়ার অভিলাষী যারা তারা রিয়া প্রকাশ করার জন্য কাব্য কবিতা মুখস্ত করে কথায় বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে। ব্যাকরণের অদ্ভূত নিয়ম-কানুন আয়ত্ব করে। যাতে সে পণ্ডিতদের উপর পাণ্ডিত্য ফলাতে পারে। মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করে তাদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারে।

চতুর্থ প্রকার রিয়া হলো আমল। অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য নামাযে লম্বা কিয়াম করা, রুকু ও সিজদা লম্বা করা। স্থিরতা ও গাম্ভীর্য প্রকাশ করা। হাত পা সোজা রাখা। এমনিভাবে রোযা, জিহাদ, হজ, সদকা ও অন্যকে আহার করানোর মধ্যে এ রিয়া হতে পারে। রিয়া হতে পারে কারও সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়ার মধ্যেও। যেমন কেউ পথে বের হয়ে দৃষ্টি অবনত রাখে। মাথা নিচু রাখে। ধীরে সুস্থে কথা বলো। কিন্তু এই লোকটাই নিজের কোনো প্রয়োজনে কোথাও যাওয়ার সময় দ্রুতবেগে চলতে থাকে। সামনে থেকে কোনো বুযুর্গকে আসতে দেখলে মাথা ঝুকিয়ে, চোখ নামিয়ে সেও বুযুর্গ হতে চায়। কিন্তু পথের মোড়ের আড়াল হলেই স্থিরতা ভুলে দ্রুত ছুটতে থাকে নিজ প্রয়োজনের দিকে। তার স্থিরতা প্রদর্শনের পেছনে কখনোই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য থাকে না। বরং তার বিষয়ে মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার ভয়ে সে এ কাজ করে থাকে।

আর কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা সবার সামনে যেমন স্থির থাকে, একা একা হাঁটলেও সে স্থিরতার আবরণ শরীর থেকে মুক্ত করে না। সবসময়ে সে জোড় করে মাথা নামিয়ে চোখ নিচু করে হাঁটে। ফলে আচমকা কেউ সামনে চলে আসলে তাকে রূপ বদলাতে হয় না। লোকদের মনে সে মুখলিস হিসেবে স্থান করে নেয়। এ অবস্থায় রিয়ার প্রভাব তার উপর বেশি হয়। কারণ লোকদের সামনে তো সে লৌকিকতা প্রদর্শন করেই এমনকি সে যখন একা থাকে রিয়ার আবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। কারণ লোকদের সামনে বিনয়াবনত হয়ে চলার অনুশীলন হিসেবে একা একাও সে এভাবে চলে। তার মনে আল্লাহ ভীতি বলতে কোনো কিছুর উপস্থিতি থাকে না। এই তো গেলো দীনদারদের বিবরণ। দুনিয়াদাররা আমলে রিয়া করে এভাবে তারা অহংকার করে। ছোটো ছোটো পদক্ষেপ জোড়ে জোড়ে হাত দুলিয়ে হাঁটে। হাত দিয়ে লুঙ্গির এক পাশ ধরে রাখে। যাতে লোকেরা দেখলে তাকে সম্মানী লোক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে।

পঞ্চম প্রকার রিয়া হলো— সঙ্গীসাথি ও সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিবর্গ। যেমন কেউ আকাঙ্ক্ষা করে যে, তার সাথে অমুক বড় আলেম সাক্ষাৎ করতে আসুক। যাতে লোকেরা তাকেও বড় ভাবে কিংবা কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি তার কাছে আসুক। যাতে লোকেরা বলাবলি করে, আহলে দীন তার কাছে আসে। তার সাক্ষাৎ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। কিংবা সে চায়, তার

কাছে দেশের বাদশাহ কিংবা কোনো রাজ কর্মচারী আসুক। যাতে অন্যরা মনে করে, এ ব্যক্তি কত বড় সম্মানের অধিকারী। রাজা পর্যন্ত তার দুয়ারে তাশরিফ নিয়ে গিয়েছেন।

এক্ষেত্রে লৌকিকতার প্রদর্শন অন্যভাবেও হতে পারে। সেটা হলো— কেউ একজন কথার কথায় বিভিন্ন শায়খদের নাম বলে। সবার কাছে বলে বেড়ায়, সে অমুক অমুক শায়খের সান্নিধ্য পেয়েছে। তাদের থেকে উপকার হাসিল করেছে। এ নিয়ে সে অন্য কারও সাথে তর্কে লিপ্তহলে তার মুখ থেকে বেশি বের হয়, কয়জন শায়খের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে? আর আমি অমুক শায়খ তমুক শায়খের সাথে সাথে সাক্ষাৎ করেছি। এতো এতো দেশ ঘুরে এই এই শায়খের সান্নিধ্য পেয়েছি। আর তুমি এসেছো আমার সাথে তর্ক করতে!! আগে আমার স্তরে উপনীত হও। তারপর পারলে কিছু বলতে এসো।

মানুষ যে কয়টি বিষয়ে লৌকিকতা প্রদর্শন করে, তার ক্ষেত্রে বিবরণ সহ এখানে তা তুলে ধরা হলো। এসব লোকেরা একটা জায়গায় সবাই এক আর তা হলো, এরা সবাই খ্যাতির মোহে পড়ে লৌকিকতা প্রকাশ করতে উদ্যত হয়।

ব্যক্তি হিসেবেও রিয়ার মধ্যে ভিন্নতা এসে থাকে। কিছু লোক আছে যারা শুধু অন্যের থেকে ভালো ধারণা কামনা করে। কিছু আবেদ আছে বছরের পর বছর তারা পাহাড়ের গুহায় কাটিয়ে দেয়। কিছু সংসার ত্যাগী লোক আছে যারা মঠের মধ্যে দীর্ঘ দিন পড়ে থাকে। তাদের জীবনে চাহিদার খুব বেশি ক্ষেত্র থাকে না। তাদের ধারণা মতে মানুষের মনে সম্মানের আসন গড়ে তুলতে পারাটাই হলো জীবন।

কিন্তু কখনো যদি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও মঠের মধ্যে সংঘটিত কোনো অপরাধের কারণে যখন তাকে জনগণ অভিযুক্ত করে তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। নিজেকে নিয়ে সে ঝুঁকিতে রয়েছে বলে মনে করে। কিন্তু স্রষ্টার কাছে সে নির্দোষ এই ধারণা তাকে সহসা আত্মমুক্তি দান করে না। বরং মানুষের কাছে দোষী হওয়া তার মনে পাহাড়সম দুঃখ গড়ে দেয় এবং সে লোকদের মন থেকে নিজের সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়া মন্দ ধারণা দূর করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে অথচ এই লোক মানুষের থেকে কোনো কিছু চায় না। সম্পদের প্রতি তার কোনো মোহ নেই। বরং সে সম্মানকে খুব বেশি

মহব্বত করে। তা সম্পদ উপার্জনের মতোই সুস্বাদু বস্তু। কারণ সম্মান হলো অবস্থা ভেদে কুদরত ও কামালিয়্যাতের একটা প্রকার—

আর সম্মান যেহেতু অতি দ্রুত শেষ হয়ে যায়, তাই মূর্খরা ছাড়া আর কেউ তা অর্জনে অভিলাষী হয় না। কিন্তু আপসোস! পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই মূর্খতার চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে আছে।

কিছু রিয়াকার আছে যারা মর্যাদা লাভে সন্তুষ্ট হয় না। বরং অন্যের থেকে প্রশংসাও কামনা করে।

অনেকে আছে যারা বারবার বিদেশ ভ্রমণের অভিলাষে দূর-দূরান্তে নিজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা করে।

অনেকে আছে যে নিজের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য করার জন্য, নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং জনগণের কাছে নিজেকে মর্যাদাবান হিসেবে তুলে ধরার জন্য রাজা বাদশাহ ও পদস্থ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক রাখে। এবং তাদের কাছে খ্যাতিমান হতে চায়।

কিছু লোক আছে যারা লৌকিকতার মাধ্যমে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু লাভ করতে চায়, সম্পদ উপার্জন করতে চায়। হোক সেটা ওয়াকফ কিংবা ইয়াতিমের সম্পদের মতো অবৈধ ও হারাম কিছু। সম্পদের ক্ষেত্রে তাদের কোনো বাছ বিচার নেই। রিয়াকার লোকদের মধ্যে এরাই হলো সর্বনিকৃষ্ট স্তরের। এই হলো রিয়ার হাকিকত ও রিয়া প্রকাশের ক্ষেত্র।

এখানে নিমগ্ন পাঠকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, এতক্ষণ তো রিয়া নিয়ে বিবিধ আলোচনা করা হলো। কিন্তু রিয়ার হুকুম তো বলা হলো না। ইসলামি শরিয়তে রিয়া হারাম, মাকরূহ, মুবাহ না কি এর কোনো বিশ্লেষণ রয়েছে?

কৌতুহলি পাঠকের প্রশ্নের জবাব আমি আগত আলোচনায় তুলে ধরছি।

রিয়ার হুকুম কী? বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

আমরা জানি রিয়ার অর্থ হলো— সম্মান ও খ্যাতির অভিলাষী হওয়া। খ্যাতি মানুষ দুইভাবে অর্জন করতে পারে। ১. ইবাদত দ্বারা। ২.ইবাদত নয় এমন বিষয় দ্বারা।

* ইবাদত নয় এমন বিষয় যেমন সম্পদ উপার্জন করা। কাজেই মানুষের অন্তরে স্থান করে নেই, এই কারণে রিয়া হারাম হতে পারে না। কিন্তু এর সাথে যদি মন্দ ও গর্হিত কাজের সংযোজন ঘটে তাহলে খ্যাতি অন্বেষণ ও

গর্হিত বলে বিবেচিত হবে। প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষের পরিমিত সম্পদ উপার্জন যেমন সম্মানের কাজ, তেমনি নিজের উপর আপদবিপদ রোধ করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্মানলাভে অভিলাষী হওয়া প্রশংসাযোগ্য। যেমন পরিমিত পরিমাণ সম্মান অর্জনের লক্ষ্যে ইউসুফ (আ) বলেছিলেন,

إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ। (সূরা ইউসুফ : ৫৫)

সম্পদে যেমন রয়েছে ঘাতক বিষ ও বিষনাশের অষুধ তেমনি সম্মানের মধ্যেও এ বিষয়টি পাওয়া যায়। সম্পদের পেছনে অধিক নিমগ্নতা যেমন মানুষকে অন্য বিষয় থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়, তুচ্ছ করে দেয়, আল্লাহর স্মরণও অনন্ত আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়। তেমনি সম্মান ও খ্যাতির প্রভাব। বরং অনেক ক্ষেত্রে সম্পদের ফেতনার চেয়ে সম্মানের ফেতনা অনেক বিকট আকার ধারণ করে। আমরা যেমন বলি না, অনেক বেশি সম্পদ অর্জন করা হারাম। তেমনি অনেক মানুষের মনে সম্মানের আসন গড়ে তোলাও অবৈধ কিছু নয়। কিন্তু সম্মানের আধিক্য ও সম্পদের প্রাচুর্য যখন মানুষকে বৈধতার সীমারেখার ওপারে নিয়ে যায় তখন তাকে বৈধতা দানের, তাকে হারাম বলার কোনো সুযোগ থাকে না। এখন কথা হলো, সম্মানের বিস্তার ঘটানোর দিকে ভাবনাকে ফিরিয়ে নেওয়া হলো অকল্যাণের সূচনা। আর যারা সম্মান ও সম্পদ ভালোবাসে তারা শরীরিক ও আত্মিক অনেক গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এ থেকে সহসা বেঁচে থাকতে পারে না।

কিন্তু কারও সম্মানের প্রসার যদি নিজে নিজে ঘটে, ব্যক্তির পক্ষ থেকে এর বিস্তৃতির পেছনে কোনো ভূমিকা না থাকে তাহলে এতে কোনো দোষ নেই। কারণ পৃথিবীতে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। খোলাফায়ে রাশেদিন ও তাঁদের পরবর্তী ওলামায়ে দীনের খ্যাতি কোনো অংশে কম ছিলো না। কিন্তু নিজের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনায় সর্বদা লিপ্ত থাকার মানে হলো ধর্মীয় আচারপালনে ত্রুটি করা। তবে তাকে হারাম বলার কোনো সুযোগ নেই।

এই আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় বাইরে বের হওয়া কিংবা কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় মানুষ যে সুন্দর ও পারিপাটি পোশাক পরিধান করে তাকে হয়তো রিয়া বলা যায় কিন্তু হারাম কখনোই বলা যায়

না। কারণ সে এখানে লোক দেখানো কোনো ইবাদত করছে না। বরং দুনিয়ার একটা সুন্দর বস্তু গায়ে চড়িয়েছে। আর এটাই হলো দুনিয়াবি বিষয়ে রিয়া হারাম না হওয়ার মূলনীতি।

হাদিস থেকেও আমাদের দাবীর সপক্ষে দলিল দিতে পারি।

আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার মনস্থ করেন। তখন তিনি পানি ভরা বড় পাত্রের দিকে তাকিয়ে নিজের চুল পাগড়ি ঠিক করে নেন। রাসূলুল্লাহ (স) কে এই কাজ করতে দেখে আয়েশা (রা) অবাক হলেন। তিনি বিস্ময়ের স্বরে বললেন, আপনি ও এমন করেন!!

রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর দেন, সঙ্গীসাথি ভাই বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে পরিপাটি হয়ে যাওয়াকে আল্লাহ পছন্দ করেন। (হাফেয ইরাকি (র) বলেন, এই হাদিসটি ইবনে আদি (র) তার "আল কামিল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বিস্তরিত দেখুন ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ২ : ৩৯৬)

রাসূলুল্লাহ (স) চুল পরিপাটি করেছিলেন ইবাদতের অংশ হিসেবে। কারণ উম্মতের মাঝে ইসলামের দাওয়াত ও দাওয়াতের প্রসার ঘটানো ছিলো তাঁর উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। তাঁর আরও দায়িত্ব ছিলো লোকদেরকে তাঁর অনুসরণে আকৃষ্ট করা এবং তাদের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি আকর্ষিত করা। কিন্তু কোনো কারণে যদি রাসূলুল্লাহ (স) মানুষের মনের শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলেন, লোকেরা সহজে তার কথা মানতে চাইবে না। তাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্তব্য ছিলো লোকদের সামনে নিজের উত্তম অবস্থা তুলে ধরা, যাতে তার বিষয়ে অন্যদের মনে তুচ্ছতা না আসে। কারণ সাধারণ মানুষ বাহ্যিক অবস্থা দেখে। ভেতরের কী আছে তা দেখে না। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকে সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ (স) সকলের সামনে নিজেকে পরিপাটিভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু অন্যদের নিন্দা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য, তাদের চোখে সম্মানিত হওয়ার জন্য কেউ যদি জনসম্মুখে পরিপাটি পোশাক পরিধান করে তাহলে এমন কাজকে বৈধ বলতে হবে। ইবাদত বলা যাবে না। বা এর কারণে সে সাওয়াবও লাভ করবে না। কারণ মানুষের কর্তব্য হলো নিন্দুকের নিন্দা থেকে সতর্ক থাকা এবং ভাইদের সাথে সুহৃদ সম্পর্ক বজায় রাখা। কিন্তু নিজেকে নিন্দার হাত থেকে বাঁচাতে না পারলে অন্যদের সাথে সম্পর্কের সৌহার্দ্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেলো যে, ইবাদত নয় এমন বিষয়ে লৌকিকতা করার হুকুম তিন ধরনের—

১. কল্যাণ কাজ। এর জন্য সে সাওয়াব পাবে।

২. মুবাহ। যার কল্যাণ-অকল্যাণ কোনো দিকই নেই।

৩. কখনো নিষিদ্ধ, তখন লৌকিকতা প্রদর্শন করা হারাম।

লৌকিকতার এমন বিভাজন হয় কর্মের সাথে সাথে ব্যক্তির উদ্দেশ্যের কারণে। তাই আমরা বলবো ধনীদের এক সমাবেশে এক লোক ইবাদত বা সাদাকার নিয়ত ছাড়া লোকদের কাছে দানশীল হওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক টাকা দান করলো। এটাকে লৌকিকতা বলা হবে। কিন্তু হারাম বলা হবে না। কাছাকাছি বিষয়ের অন্য সবকিছুর হুকুম এর মতোই হবে।

ইবাদত বিষয়ে রিয়া : যেমন, সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত, জিহাদের মতো বিষয়ে রিয়া করা। এর দুটি অবস্থা।

প্রথম অবস্থা : ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিদান পাওয়ার ন্যূনতম ইচ্ছা না রেখে লৌকিকতার নিয়ত করা। এক্ষেত্রে তার ইবাদত বাতিল হয়ে যাবে। আর আমলের অন্যতম ভিত্তিমূল হলো সঠিক পদ্ধতিতে নিয়ত করা। আর এ কাজের ক্ষেত্রে যেহেতু সে ইবাদতের নিয়ত করেনি তাই তার ইবাদত বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে ইবাদত বাতিল হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই নয় যে, তার ইবাদত বাতিল হয়ে এমন হবে যেনো সে কোনো আমলই করেনি।

বরং এক্ষেত্রেও আমাদের কথা হলো লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে বান্দা গুনাহগার হবে। হাদিস ও আসারের ভাষ্য থেকে আমাদের এটাই বোধগাম্য হয়।

এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয় দুইটি

ক. বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট। সেটা হলো ধোঁয়াশা সৃষ্টি ও ধোঁকায় ফেলে দেওয়া। কারণ বান্দা মনে মন্দ ইচ্ছা নিয়ে অন্যের সামনে নিজেকে মুখলিস হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছে।

তালবিস বা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করার বিষয়টি এমন যে, পার্থিব বিষয়ে এ কাজের আশ্রয় নেওয়া হারাম। এর উদাহরণ হলো— কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের ঋণ শোধ করে এমন ভাব ধরলো যে, সে তাদেরকে দান করে এসেছে যাতে

তাকে দানশীল মনে করা হয় তার এই কাজ হারামে বলে বিবেচিত হবে। কারণ সে ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে মানুষের মন জয় করতে চেয়েছে।

খ. আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কিত। সেটা এভাবে যে, যে ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ হওয়া কর্তব্য। তা যখন বান্দার উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পাদন করা হয় তখন আল্লাহ তাআলাকে উপহাস করা হয়। তাই কাতাদা (র) বলেন, বান্দা যখন লৌকিকতা করে তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলে, দেখো, আমার বান্দা আমাকে উপহাস করছে। (দাইনুরী : আল মুজলাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ২৯৩)

আরও একটি উদাহরণ : কোনো এক ব্যক্তি দীর্ঘ প্রহর ধরে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য রাজাকে সম্মানপ্রদর্শন করা নয়। বরং রাজার কোনো বাঁদিকে দেখাই তার উদ্দেশ্য। এটা যেনো প্রকারান্তে রাজাকে অপমান করা হলো। কারণ রাজার সেবা করে তার আস্থাভাজন হওয়া ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং কোনো গোলাম বা বাঁদির জন্য সে দণ্ডায়মান থেকেছে। সুতরাং যে কাজ দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা হয় তা যদি কেউ শক্তিহীন মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করে তাহলে সেটাই হবে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য সবচেয়ে বড় উপহাস? এর দ্বারা কি ধারণা হয় না যে, ব্যক্তি উদ্দিষ্ট বস্তু প্রদানে মানুষকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান মনে করেছে। তার কাছে মানুষ আল্লাহর চেয়ে নৈকট্যলাভের অধিক উপযোগী। তাই সে মানুষকে সর্বজাহানের অধিপতির উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং ইবাদত করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। কাজেই আল্লাহর সাথে এর চেয়ে বড় উপহাস আর কি হতে পারে?

এটা হলো ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ। এই সবদিক বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ (স) রিয়ার নাম দিয়েছেন "শিরকে আসগর। (মুসনাদে আহমাদ : ৫ : ৪২৮; তাবারানি : আল মুজামুল কাবির : ৪ : ২৫৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬৪১২)

রিয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে রিয়ার স্তর পর্বে করা হবে। তবে রিয়ার কোনো স্তরই গুনাহ মুক্ত নয়। বান্দার নিয়তের উপরে ভিত্তি করে তার গুনাহের পাল্লা ভারী অথবা হালকা হবে।

ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যে লৌকিকতা দেখাতে গিয়ে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে রুকু সেজদা করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ সে ইবাদতের দ্বারা

আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করেনি। তাই সেটা অন্য কারও, উদ্দেশ্যে হয়ে গেছে। আমি কসম করে বলছি কেউ যদি গায়রুল্লাহকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে মাথা নত করে সিজদা করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। তবে রিয়া হলো প্রচ্ছন্ন কুফুরি। কারণ রিয়াকারের অন্তরে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণে সে রুকু করে। সেজদাবনত হয়। তাই একদিক বিবেচনায় রিয়াকার এখানে মানুষকে শ্রদ্ধা করে সেজদা করছে। যখনই সেজদা দ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য বিলোপ হয়ে মানুষের প্রতি সম্মান বাকি থাকে, তখন ব্যক্তি শিরকের একেবারে প্রান্তসীমায় পৌঁছে যায়।

তবে ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের কাছে নিজের সুনাম গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে শ্রদ্ধা করে স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা করার মতন তাহলে সেটা শিরকে খফি হবে। জালি হবে না। আর এমন অজ্ঞতার পরিচয় শুধু তারা দিতে পারে যাদের শয়তান ধোঁকায় ফেলেছে এবং তাদের মনে একথা প্রবিষ্ট করে দিয়েছে যে, তার উপকার-অপকার, জীবন-মৃত্যু, তার রিযিকের দায়িত্ব, উত্তম হালে তাকে প্রতিপালন, সবকিছুতে আল্লাহর চেয়ে বান্দার কর্তৃত্ব বেশি। তাই তারা আল্লাহ বিমুখ হয়ে পড়ে। সামর্থবান মানুষের মন জয় করার জন্য তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু বাস্তবতা হলো। দুনিয়ার সব সম্পদ দান করা হলেও সে অন্যদের প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না। কারণ সে নিজের ক্ষেত্রেই ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। তাহলে কীভাবে সে অন্যের প্রয়োজন পূরণ করবে? এতো গেলো দুনিয়ার কথা। ওই দিবসের কথা ভাবুন একবার, যখন পিতা পুত্রের কোনো উপকারে আসবে না। পুত্র পিতার পাপের বোঝা নিজের কাধে নেবে না। যেদিন নবীরা বলতে থাকবেন, ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি..!! তখন কীভাবে অজ্ঞরা দুনিয়ার মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ নৈকট্য লাভের উপযোগী বস্তু পাবে? আকলি নাকলি উভয় প্রকারের দলিলের মাধ্যমে একথাগুলো প্রমাণিত। তাই আল্লাহ প্রবর্তিত ইবাদতসমূহকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী লোকদের এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা : বান্দার ইবাদাত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি মানুষের থেকে প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে। এটা ইখলাসের বিপরীতার্থে ব্যবহৃত শিরক। যার বিস্তারিত বিবরণ আমি কিতাবুল ইখলাসে দিয়েছি। এ বিষয়ে বর্ণিত আসার যেমন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ও উবাদা ইবনে

সামেত (রা)-এর আসার থেকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাথে অন্যের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে করা ইবাদতের কোনো সাওয়াব সে পাবে না।

রিয়ার বিভিন্ন স্তর : প্রকাশ থাকে যে, কঠোর ও ব্যপকতার বিবেচনায় রিয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে। তবে মৌলিক বিষয় ও মর্যাদার বিবেচনায় এক স্তর অন্য স্তর থেকে ভিন্নতা রাখে।

রিয়ার মূল রোকন তিনটি : ১. যা নিয়ে রিয়া করা হয়। ২. যার কারণে রিয়া করা হয়। ৩. স্বয়ং রিয়া।

প্রথম রোকন : ইবাদত প্রকাশ করার ইচ্ছা অর্থাৎ স্বয়ং রিয়া। এর স্তর ভিন্নতা রয়েছে। হতে পারে সে নিছক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করছে। আল্লাহর কাছ থেকে পরুস্কার লাভের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তার মনে নেই। কিংবা ইবাদত দ্বারা হয়তো তার মনে সওয়াব লাভের ইচ্ছা রয়েছে। সাথে সাথে লোক দেখানো মনোভাবও তার মধ্যে রয়েছে। এক্ষেত্রে তার মধ্যে লোক দেখানো মনোভাব প্রবল থাকবে। কিংবা সওয়াব পাওয়ার আশা প্রবল থাকবে। কিংবা দুটোই সমান সমান হবে। নিচে এই চারটি স্তরের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

প্রথম স্তর হচ্ছে, সওয়াবের ইচ্ছা আদৌ না থাকা। যেমন, এক ব্যক্তি জনসমক্ষে নামায পড়ে এবং একাকী থাকলে পড়ে না; বরং কখনো ওযু না করেই অন্যদের সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। এ ধরনের লোকের মনে শুধু রিয়াই রিয়া। ফলে, সে আল্লাহর অভিশাপের পাত্র। রিয়ার এ স্তরটি ভারি বিপজ্জনক।

দ্বিতীয় স্তর হলো, সওয়াবের ইচ্ছা থাকবে, তবে তা খুবই দুর্বল। এমনকি, একাকী থাকলে এ ইচ্ছা এতটুকু থাকে না যে, তার জন্যই সে আমলটি করে। এরূপ ব্যক্তিও প্রথম প্রকার ব্যক্তির প্রায় কাছাকাছি। কেননা, তার এমন ইচ্ছা নেই, যার জন্যে আমলটি করতে পারে। এরকম ইচ্ছা থাকা-না থাকা সমান।

তৃতীয় স্তর হলো, রিয়া ও সওয়াবের ইচ্ছা উভয়টি সমান থাকা। ফলে, উভয় ইচ্ছা একসাথে হলে সে আমল করে এবং একটি না থাকলে আমল করে না। এ ধরনের লোকের অবস্থা এই যে, সে যতটুকু ক্ষতি করে, ততটুকুই গড়ে। ফলে, আশা করা যায় যে, তার সওয়াবও হবে না এবং শাস্তিও হবে না।

অথবা যে পরিমাণ শাস্তি হবে, সেই পরিমাণ সওয়াব হবে। হাদিসসমূহের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায়, এরূপ ব্যক্তিও আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

চতুর্থ স্তর হচ্ছে, সওয়াবের ইচ্ছা প্রবল হওয়া। এখানে রিয়ার প্রভাব ক্ষীণ। অর্থাৎ, মানুষ তার আমল সম্পর্কে জানতে পারলে তার আনন্দ বেড়ে যায়; কিন্তু একাকী অবস্থায়ও ইবাদত ত্যাগ করে না। আমাদের ধারণায় এরকম ব্যক্তির আসল সওয়াব বরবাদ হবে না। বরং কিছুটা কমে যাবে অথবা রিয়ার পরিমাণে শাস্তি হবে এবং সওয়াবের ইচ্ছা পরিমাণে সওয়াব হবে।

দ্বিতীয় রোকন : যা দেখানোর উদ্দেশ্যে রিয়া করা হয়; আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য দ্বারা রিয়া করা হলে রিয়ার দু'টি স্তর রয়েছে— মূল ইবাদত দ্বারা রিয়া করা ও ইবাদতের গুণ দ্বারা রিয়া করা। প্রথম স্তরের রিয়া অত্যন্ত খারাপ। এর তিনটি সোপান রয়েছে।

প্রথম সোপান হলো, মূল ঈমান দ্বারাই রিয়া করা। এ ধরনের রিয়াকার অনন্তকাল দোযখে বসবাস করবে। এ রিয়াকার সে ব্যক্তি, যে মুখে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে; কিন্তু অন্তরে তাকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে। নিছক লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে মুসলমানিত্ব জাহির করে। কুরআন কারীমের বহু স্থানে আল্লাহ তাআলা এ রিয়াকারদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

এক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে,

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.

(হে রাসূল!) মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি তাঁর রাসূল। আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যুক। (সূরা মুনাফিকুন : ১)

অর্থাৎ, তাদের কথার সাথে তাদের আন্তরিক বিশ্বাসের মিল নেই। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ. وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.

মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের কথা পার্থিব জীবনে আপনাকে আশ্চর্য করবে। সে তার মনের কথার উপর আল্লাহকে সাক্ষী সাব্যস্ত করে; অথচ সে মারাত্মক ঝগড়াটে। যখন সে প্রস্থান করে, তখন চেষ্টা করে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে, শস্যক্ষেত্র বিনাশ করতে এবং প্রাণহানি ঘটাতে। আল্লাহ সন্ত্রাসী কার্যক্রম পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা : ২০৪-২০৫)

অন্য এক আয়াতে আরও বলা হয়েছে,

وَ اِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ اِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ.

যখন তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন একাকী হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর ক্ষোভে আঙুল কামড়াতে থাকে। (সূরা আলে ইমরান : ১১৯)

يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ.

তারা লোক-দেখানো আমল করে। আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। তারা দোদুল্যমান— না এই দলে, না সে দলে। (সূরা নিসা : ১৪২-১৪৩)

নিফাক ইসলামের প্রাথমিক যামানায় খুব বেশি ছিল। তখন কিছু লোক মতলব হাসিলের জন্য আপাতত মুসলমান হয়ে যেত। বর্তমানে এটা কম হলেও এর আকৃতি ও নমুনা কম নয়। যেমন, কিছু লোক ধর্মদ্রোহীদের কথার দিকে ঝুঁকে পড়ে মনে মনে জান্নাত, জাহান্নাম ও কিয়ামত অস্বীকার করে অথবা শরীয়ত ও শরীয়তের বিধানাবলিকে বিধর্মীদের কথা অনুযায়ী ওয়াজিব মনে করে না। অথচ মুখে এর বিপরীত বর্ণনা করে। এ ধরনের লোকও মুনাফিক। এরা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। কেননা, এর চেয়ে বড় কোনো কপটতা নেই। এরা কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ, কাফের বাইরেও শত্রু এবং ভিতরেও বেঈমান। কিন্তু এদের অবস্থা এই যে, এরা মুখে আল্লাহ আল্লাহ জপে এবং বগলে ছুরি লুকিয়ে রাখে।

দ্বিতীয় সোপান হলো, ইবাদত দ্বারা রিয়া করা। এরা ঈমানের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু ইবাদত করে দেখিয়ে দেখিয়ে। এরা দ্বিতীয় স্তরের লোক। এ স্তরটিও আল্লাহ তাআলার কাছে নিন্দনীয়। যেমন, এক লোক জনসমাবেশে হাজির আছে, এমন সময় নামাযের সময় হয়ে গেল। সকলেই যখন নামায পড়ল, তখন সে-ও পড়ে নিল। কিন্তু একাকী অবস্থায় নামায না পড়াই তার

অভ্যাস। অথবা রমযান মাসে রোযা রাখল। কিন্তু রোযা যেন না রাখতে হয়, সেজন্য মানুষের নিকট থেকে দূরে চলে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে। অথবা জুমার নামাযের জন্য মসজিদে যায় বটে, কিন্তু মানুষের নিন্দার ভয় না থাকলে মোটেও যেতো না। অথবা জিহাদ বা হজ শুধু মানুষের ভয়ে করে- মনের আগ্রহে নয়। এ ধরনের রিয়াকারের মধ্যে মূল ঈমান থাকে। সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুকে উপাস্য মনে করে না। কেউ অন্য কিছুকে সিজদা করতে বললে সে করবে না। কিন্তু উদাসীনতার রোগে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে না এবং লোকের সাথে করলে খুশি হয়। সুতরাং আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভের তুলনায় মানুষের নিকট মর্যাদা লাভ তার কাছে ভালো মনে হয়। তার নিকট মানুষের মন্দ বলার ভয় আল্লাহর আযাবের ভয়ের চেয়েও বেশি। মানুষের প্রশংসার প্রতি তার আগ্রহ আল্লাহর সওয়াবের প্রতি আগ্রহের তুলনায় বেশি। বলাবাহুল্য, এ ধরনের বিশ্বাস চরম মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। এ ব্যক্তি মূল ঈমানে বিশ্বাসী হলেও আল্লাহর গযবে পতিত হওয়ার যোগ্য।

তৃতীয় সোপান হলো, নফল ও মুস্তাহাব ইবাদত যেগুলো ত্যাগ করলেও কেউ গুনাহগার হয় না। লোক মাধ্যমে রিয়া করার এটা তৃতীয় প্রকার। যেমন, নামাযের জামাতে শরীক হওয়া, রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করা, জানাযায় শরীক হওয়া, তাহাজ্জুদ পড়া, আশুরার রোযা রাখা বা সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখা। রিয়াকাররা এসব ইবাদত মানুষের নিন্দার ভয়ে এবং প্রশংসা কুড়ানোর জন্য পালন করে। আল্লাহ তাআলা জানেন, একাকী হলে তারা ফরযের বেশি কিছু করতো না। এ ধরনের রিয়াকার মন্দ হলেও পূর্ববর্তীগুলোর তুলনায় ভালো।

পূর্বের স্তরের সাথে তুলনামূলকভাবে এ স্তরটি কম ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলেও এর ঝুঁকি কোনো অংশেই কম নয়। কারণ পূর্বের স্তরে বান্দার স্তুতিকে স্রষ্টার প্রশংসার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এ স্তরেও আসলে তাই করা হয়েছে, সে স্রষ্টার ভর্ৎসনাকে বান্দার নিন্দার নিচে স্থান দেয় । কারণ সে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে নফল নামায আদায় করেনি। তার উদ্দেশ্য ছিলো লোকদের দেখানো। পূর্বের স্তরে বিবৃত অপরাধের অর্ধেক। তাই এর শাস্তিও অর্ধেক হবে।

এই হলো মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়ার বিবরণ ।

দ্বিতীয়ভাগ মৌলিক ইবাদতের আনুষঙ্গিক বিষয়। এর তিনটি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর : এমন কাজে রিয়া করা যা বাদ দিলে ইবাদতে ক্ষতি সৃষ্টি হয়। যেমন কোনো লোকের অভ্যাস হলো নামাযে রুকু সেজদা সংক্ষিপ্ত করা। ছোটো কেরাতে নামায পড়া। কিন্তু যখন তার আশপাশে লোক থাকে, তখন লৌকিকতা করতে সে রুকু দীর্ঘ করে। সেজদা লম্বা করে বড় বড় কেরাত পড়ে। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যে এমন করে সে যেনো তার প্রভুকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলো। (ইবনু আবি শাইবা : আল মুসান্নাফ : ৮৪৯০ অনুরূপ অর্থে)

এই আসারের অর্থ হলো, সে নির্জনে থাকলে আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়ে কোনো পরোয়া করে না। কিন্তু সামনে কোনো মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করলে সে লম্বা চওড়া রুকু সেজদাওয়ালা বনে যায়।

বিষয়টি অনেকটা এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি বড় কোনো মহাজনের সামনে চারজানু হয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে। কিন্তু মহাজনের কোনো কর্মচারীকে দেখলে সে হেলান ছেড়ে দিয়ে আদবের সাথে নিজের বৈঠক দুরস্ত করে নেয়।

গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে, কর্মচারীকে এভাবে সে সম্মান করা প্রকারান্তে কোনো মহাজনকে অবজ্ঞা করা। তেমনিভাবে যে একা একা রুকু সেজদায় অবহেলা করে কিন্তু লোকদের সামনে ভালোভাবে নামায পড়ে, সেও যেনো এর দ্বারা আল্লাহকে অবজ্ঞাই করলো।

একটি উদাহরণ : কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক অভ্যাস হলো, সে যাকাত আদায় করে খাদ যুক্ত দিনার দিরহাম কিংবা নিম্নমানের গম দিয়ে, কিন্তু যখন কোনো লোকের উপস্থিতি লক্ষ করে, নিখাদ দিনার এবং উচ্চ মানের শস্যগুলোই সে যাকাত উসুলকারীর হাতে তুলে দেয়।

কিংবা এক লোক রোযার সময় কারও গীবত করে না। যৌন কর্মে লিপ্ত হয় না। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে সে এসব থেকে বিরত থাকে না, বরং মানুষের নিন্দার ভয়ে, তাদের চোখে সম্মান হারানোর ভয়ে। এ ধরনের লৌকিকতাও নিষেধের আওতাধীন। কারণ এতে স্রষ্টাকে ছোটো করে সৃষ্টিকে বড় করে দেখানো হয়েছে। তবে এর শাস্তি ইবাদতের মৌলিক বিষয়ে রিয়া করার চেয়ে কম হবে।

রিয়াকারী বলতে পারে : আমি এ কাজ করেছি তাদের কথার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। কারণ লোকেরা যদি আমাকে এভাবে নামাযে নড়াচড়া করতে, সংক্ষিপ্ত কেরাত পড়তে, রুকু সেজদায় তাড়াহুড়া করতে দেখতো তাহলে তারা আমার নামে বদনাম ছড়াতো। কুৎসা রটাতো। তাই এদের যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে আমি একাজ করেছি।

তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি যেভাবে ভাবছো, বিষয়টা আসলে এমন নয়। বরং তুমি শয়তানের চক্রান্তের শিকার হয়েছো। আল্লাহর দেওয়া অর্থাৎ তাঁর নির্দেশিত ইবাদতের ত্রুটির ভয়ের চেয়ে তোমার কাছে বান্দার দুচারটি কথার মূল্য অনেক বেশি হয়ে গেলো!! দীনের কারণে যদি তুমি এমন কাজ করতে তাহলে নিজের উপর তোমার দয়া আছে বলে প্রমাণিত হতো। তোমার অবস্থা হবে, যেমন এক লোক বাদশাহর অনুগ্রহ ও দয়া অর্জন করতে তাকে এমন একটি বাঁদি উপহার দিলো। কিন্তু বাঁদির দেহ উলঙ্গ, শরীরে কালি ঝুলি লেগে আছে এবং অঙ্গহীন। বাদশাহ একা আছে বলেই সে এমন বাঁদি বাদশাহকে দিতে পারলো। বাদশাহর আশ-পাশে যদি কোনো দাস-দাসী থাকতো তাহলে বাদশাহর সামনে সে এমন উপহার উপাস্থাপন করতে পারতো না। কারণ ব্যক্তির মনে বাদশাহর রুষ্টতার ভয় না থাকলেও সেবা দাসদের কথার ভয় সে করে।

ভেবে দেখো, এই কাজটা কতটা গর্হিত ও অবাস্তব। কারণ বাদশাহর সেবা দাসদের চেয়ে লোকদের মনে বাদশাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা লাভের আকাঙ্ক্ষা বেশি থাকে।

এক্ষেত্রে রিয়াকারীর হালত হয় দুই ধরনের।

১. কর্ম দ্বারা সে মানুষের কাছে মর্যাদা ও তাদের মুখ থেকে প্রশংসা বাক্য শুনতে চায়।

অকাট্যভাবে ব্যক্তির এমন কর্ম হারাম ও অবৈধ।

২. ব্যক্তির এমন কথা বলা যে, ভালোভাবে রুকু সেজদা আদায় করে নিলেও আমার মনে ইখলাসের নিয়ত থাকে না। কিন্তু যদি আমি তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করি তাহলে দুই দিক থেকে ক্ষতির শিকার হই। আমার নামায তো আল্লাহর কাছে অসম্পূর্ণ থেকেই যাচ্ছে। সাথে সাথে আমি মানুষের কাছে নিন্দার পাত্র হবো। কাজেই মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য হলে আমাকে নামাযের বাহ্যিক বিষয়গুলো সুন্দরভাবে আদায় করতে হয়।

আর এই নামায দিয়ে আমি সওয়াব আশা করি না। কারণ এটা আমার কাছে তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করার চেয়ে ভালো মনে হয়। তাতে সওয়াব না থাকলেও মানুষের মুখ বন্ধ রাখা যায়। এ বিষয়ে সামান্য আপত্তি রয়েছে। তবে সঠিক কথা হলো মানুষের উচিত ইখলাসের সাথে সুন্দরভাবে নামায আদায় করা। ধীরস্থিরতার সাথে রুকু সেজদা আদায় করা। তারতিলের সাথে তেলাওয়াত করা। দৃষ্টিকে নির্দিষ্ট স্থানে নিবদ্ধ রাখা। তবে যদি মন বশে আসতে না চায়, নামাযের মধ্যে ইখলাস না আসে, তাহলে নিভৃতে বারবার এর অনুশীলন করা উচিত।

কিন্তু আল্লাহর নির্দেশিত কর্মকে বান্দার নিন্দা রক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কারণ তাতে আল্লাহকে উপহাস করা হয়।

দ্বিতীয় স্তর : এমন কাজে লৌকিকতা করা যা ছেড়ে দিতে কোনো সমস্যা নেই। তবে এসব কর্ম ইবাদতের পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন রুকু-সেজদা দীর্ঘ করা। দীর্ঘ সময় কিয়াম করা। তাকবিরের জন্য হাত সুন্দরভাবে ওঠানো। তাকবিরে উলাসহ নামায আদায় করা। নামাযের কারর্যাবলি সুন্দরভাবে আদায় করা। নামাযে স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ কেরাত পড়া। এমনিভাবে রমযান মাসে রোযা রেখে নির্জনতা অবলম্বন করা। নিরবতা এক্তিয়ার করা। যাকাতে সবচেয়ে ভালো মানের পণ্য দেওয়া। কাফফারা আদায়ে সবচেয়ে মূল্যবান গোলাম আযাদ করা। উপরে বিবৃত বিষয়গুলো এমন, এর সবগুলো আদায় ছেড়ে দিলেও তার উপর আলাদা করে কিছু আবশ্যক হবে না।

তৃতীয় স্তর : নফলের মৌল বহির্ভূত বিষয়ে লৌকিকতা প্রদর্শন করা। যেমন সবার আগে জামাতের সাথে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া। প্রথম কাতারে দাঁড়ানো। ইমাম সাহেবের ডান পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি। এসব কিছু এমন বিষয়, যে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত, তাই ব্যক্তি একা থাকলে খেয়ালই থাকে না, সে মসজিদে কোথায় দাঁড়াচ্ছে কিংবা নামায কখন শুরু হয়েছে।

এই হলো যা কিছু দিয়ে লৌকিকতা প্রদর্শন করা হয় তার স্তর বিন্যাসও বিস্তারিত বিবরণ। এর সবগুলো গুনাহ বলে বিবেচিত। তবে ভয়াবহতার দিক থেকে কিছু তারতম্য রয়েছে।

তৃতীয় ভাগ : যার কারণে লৌকিকতা প্রদর্শন করা হয়।

যে লৌকিকতা করে সে মনে মনে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে অবশ্যই করে। কখনো তার উদ্দেশ্য হয় সম্পদ অর্জন করা। কখনো উদ্দেশ্য হয় সম্মানলাভ করা। এর তিনটি স্তর রয়েছে—

প্রথম স্তর : নাফরমানিতে সুবিধা লাভের জন্য লোক দেখানো ইবাদত করা। এটা সবচেয় গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। যেমন কেউ ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া করা শুরু করলো। নিজেকে মুত্তাকি পরহেযগার হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরলো। সবাইকে দেখাতে লাগলো সে সন্দেহপূর্ণ কোনো কিছু খায় না। এভাবে নিজেকে সে আমানতদার প্রমাণ করে বিচার বিভাগ, ওয়াকফ সম্পদ, ওসিয়ত কিংবা এতিমদের সম্পদের দায়িত্বশীল হতে চায় এবং তা আত্মসাৎ করতে চায়।

কিংবা সে যাকাত ও সাদাকা বণ্টনের দায়িত্ব নিয়ে সেগুলো নিজের মতো করে ব্যয় করতে চায়। অন্যের রাখা আমানত সে অস্বীকার করতে চায়। কিংবা সে চায় হাজিদের রাখা খরচের জন্য নির্ধারিত অর্থ তার কাছে থাকুক এবং সে তা নিজের কাজে ব্যয় করুক। এভাবে সে নিজের বুযুর্গির মুলা অন্যের নাকের সামনে ঝুলিয়ে তাদেরকে লুটে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে।

অনেকে আছে যারা সুফিদের বেশভূষা ধারণ করে। দরবেশের ভাব ধরে। ওয়াজ নসিহতে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা বলে, তবে তাদের মনে থাকে ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নারী বা বালকের মন আকৃষ্ট করা।

এভাবে তারা বিভিন্ন ইলমি মজলিসে যায়, কুরআন শিক্ষার আসরে উপস্থিত হয়। ইলম কালাম ও কুরআন তেলাওয়াত শোনার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তাদের মনে আসলে বাসনা থাকে নারী কিংবা কোনো সুশ্রী বালকের সঙ্গ লাভ। কিংবা তারা হজের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় যায় ঠিকই কিন্তু তার মনে থাকে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার তীব্র ইচ্ছা।

এরা আল্লাহর চোখে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের রিয়াকার। কারণ আল্লাহর নির্দেশিত পথকে তারা নিজেদের গুনাহের কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। নিজের মন্দ স্বভাব চরিতার্থ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

এর চেয়ে সামান্য নিচু স্তরের হলো তারা যারা কোনো গুনাহের দায়ে অভিযুক্ত এবং বাস্তবেই সে কাজটা করেছে। সে এই অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাই সে তাকওয়ার বেশ ধারন করে। যেমন কাউকে

আমানতের খেয়ানত করার কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তখন সে লোকদেরকে দান সদকা করতে শুরু করলো। যাতে লোকেরা বুঝতে পারে, সে তো নিজের সম্পদ অন্যকে দান করে দিচ্ছে। তার পক্ষে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা কি করে সম্ভব হতে পারে? তেমনিভাবে, ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য তাকওয়ার বেশ ধারণ করে।

দ্বিতীয় স্তর : দুনিয়ার বৈধ সম্পদ লাভের জন্য রিয়া করা।

যেমন সম্পদ অর্জন, সম্ভ্রান্ত সুন্দর মহিলাকে বিবাহ করা ইত্যাদি। কেউ ওয়াজ নসিহতে ভারাক্রান্ত মনে কথা বলে। কান্নকাটি করে। যেন লোকেরা তার পেছনে সম্পদ ব্যয় করে এবং মেয়েরা তাকে বিবাহ করতে আগ্রহ দেখায়। এতে তার উদ্দেশ্য হতে পারে দুই ধরনের।

এক. হয়তো সে নির্দিষ্ট কোনো মেয়েকে নিজের দিকে আকর্ষিত করতে চাইবে।

দুই. কোনো দির্দিষ্ট মেয়ে নয়। যে কোনো সুন্দরী সম্ভ্রান্ত বংশীয় মেয়ে হলেই তার চলবে। যেমন কেউ কোনো ইবাদতগুজার আলেমের মেয়ে বিয়ে করার জন্য নিজে আলেম ও আবেদ হওয়ার ভান করলো, যাতে বাবা মেয়েকে তার সাথে বিবাহ দিতে আগ্রহী হয়।

এটাও নিন্দিত লৌকিকতারই একটি প্রকার। কারণ ব্যক্তি এখানে আল্লাহর নির্দেশিত কর্ম দিয়ে পার্থিব চাহিদা পূরণ করতে চেয়েছে।

তবে তার গুনাহ পূর্বের স্তরের গুনাহের চেয়ে কম। কারণ এখানে রিয়া দ্বারা অনুমোদিত বস্তু অর্জনে অভিলাষী হয়েছে।

তৃতীয় স্তর : কর্ম দ্বারা সম্পদ অর্জন করা উদ্দেশ্য হয় না। কিন্তু সে প্রকাশ্যে ইবাদত করতে পছন্দ করে কারণ, তার মনে ভয় থাকে, (সবাইকে দেখিয়ে ইবাদত না করলে) হয়তো লোকেরা তাকে তুচ্ছ ভাববে। তাকে আবেদ যাহেদ কিছুই মনে করবে না। অন্য সাতজন মানুষের মতো তাকেও কোনো গুরুত্ব দেবে না।

কেউ কেউ দ্রুত রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলো তখন সামনে থেকে কাউকে আসতে দেখে হাঁটার গতি কমিয়ে দিলো। কারণ সে মনে করেছে, এভাবে হাঁটতে দেখলে লোকেরা তাকে গুরুত্বহীন বলে মনে করবে। কেউ তাকে আর গুরুত্বের চোখে দেখবে না।

তেমনিভাবে লোকেদের চোখে নিচু প্রমাণিত না হতে সে হাসি তামাশা করে সাথে সাথে ইসতিগফার করে নেয় এবং মনস্তাপের দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বেদনা প্রকাশ করে বলে, মানুষ নিজেকে নিয়ে এতো গাফেল থাকে কি করে!!

কিন্তু আল্লাহ অবগত রয়েছেন সে যদি নিভৃতে এই কাজটা করতো তাহলে তার মধ্যে এ ধরনের মনস্তাপ কখনো দেখা যেতো না। সবার সামনে সে এমন ভাব করেছে যাতে অন্যরা তাকে তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখে।

একটি উদাহরণ : এক ব্যক্তি দেখলো, তার আশপাশের লোকেরা সব তারাবির নামায পড়ে। দীর্ঘ রাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে। সোম বৃহস্পতিবার রোযা রাখে। তার মনে তখন ভয় জাগলো, লোকেরা হয়তো তাকে অলস ভাববে। তাকে সাধারণ মনে করবে। তাই সে নিজেকে ইবাদত মগ্ন ব্যক্তিদের দলে ভিড়িয়ে নেয়।

কিন্তু একা থাকলে এসব ইবাদত পালন করা তার পক্ষে কখনোই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

এক লোক আরাফার দিন, আশুরার দিন, কিংবা নিষিদ্ধ মাসের দিবসগুলোতে পিপাসা লাগলেও পান করে না কারণ, তার মনে ভয় থাকে লোকেরা বুঝে ফেলবে সে আজ রোযা রাখেনি, লোকদের ধারণা দানের জন্য হলেও সে সারাদিন না খাওয়া থাকে।

কেউ ডাকলেও সে খায় না এবং মুখে বলেও না রোযার কথা। শুধু বলে, আমি এখন খেতে পারবো না। সমস্যা আছে। এক্ষেত্রে এক সাথে দুটি মন্দ কাজ করলো। সে রোযাদারের মতো ভাব দেখালো এবং রোযার কথা মুখে প্রকাশ না করে নিজেকে মুখলিস প্রমাণের চেষ্টা করলো। সাথে রোযার কথা মুখে উচ্চারণ না করে সে যেনো বোঝাতে চাইছে, আমি নিজের ইবাদতের কথা খোলাখুলি বলি না। গোপন করে রাখি।

কিন্তু লোকেরা যখন কোনো আপত্তি উপস্থাপন করার সুযোগ না দিয়ে তাকে জোড় করে পানি খাইয়ে দেয়। তখন সে বলে, আমি অমুকের মন রক্ষা করার জন্য রোযা ভঙ্গ করলাম।

পান করার সাথে সাথে সে একথা বলবে না, কারণ তাতে এমন ধারণা হওয়ার সুযোগ রয়েছে যে, সে রিয়া করে আপত্তি পেশ করছে। তবে পরবর্তিতে ফুলিয়ে দাপিয়ে বিষয়টাকে গল্পের আকার দান করে। আরে অমুক ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধবদের খুব পছন্দ করে। সে খুব করে চায় অন্যরা তার সাথে

এক আসনে বসে খাক। আজ সে আমাকে ধরেছিলো, এমন পীড়াপীড়ি শুরু করলো, তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আহার গ্রহণ না করে পরিনি।

কিংবা মা আমাকে প্রচন্ড স্নেহ করে, আমার প্রতি সে খুব দুর্বল। সে বলে, রোযা রাখলে নাকি আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো। তাই রোযা রাখতে পারিনি। এমন আরও যত ক্ষেত্রে রয়েছে সবই রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। মনের গভীরে রিয়ার বীজ বপন করা থাকলে মুখে মানুষ এসব কথা বলতে পারে।

আর যে মুখলিস, যার মনে নিষ্ঠা রয়েছে, মানুষ তাকে কোন চোখে দেখেছে সেই ভাবনাই তার থাকে না। সে রোযা রাখতে সক্ষম না হলে রোযাদারের ভাব ধরে না। আর মনে রোযা রাখার উদ্দীপনা থাকলে চুপিচুপি রোযা রাখে, সবার কাছে বলে বেড়াতে যায় না। তার মনে হয়, এসব কথা অন্যকে বলা মানে তাদের মুখকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া। তার বিষয়ে মানুষকে আগ্রহী করে তোলা। এতে রয়েছে শয়তানের ধোঁকার জাল বোনা চক্রান্ত। (এর আলোচনা সামনে আসছে) বিস্তৃত বিবরণ এবং রিয়াকারের ক্রম বিন্যাস।

এই অনুচ্ছেদে যতগুলো বিষয়ে আলোচনা করা হলো, তার সবগুলোরই জন্য আল্লাহর কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হবে। এগুলো আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে। তাতে পিপিলীকার পদধ্বনির মত সূক্ষ্ম কিন্তু ভয়ঙ্কর পাপ রয়েছে। যার বিবরণ আমরা হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে জানতে পারি।

পিঁপড়ার চলার চেয়েও গোপন রিয়া : মূলত রিয়া দু' ধরনের। প্রকাশ্য ও গোপন। সওয়াবের ইচ্ছা না থাকলেও মানুষকে আমল করতে যে রিয়া উদ্বুদ্ধ করে, এটাই প্রকাশ্য রিয়া। এ প্রকার রিয়া খুব দ্রুত বোঝা যায় এবং রিয়াকারও জানতে পারে যে, সে রিয়া করছে। এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত গোপন সেই রিয়া, যা সব আমল করার ক্ষেত্রে তো হয় না; তবে সওয়াবের নিয়তে যে আমলটি করা হয়, তা এই রিয়ার কারণে সহজ হয়ে যায়। যেমন, এক ব্যক্তি দৈনিক তাহাজ্জুদ পড়ে; কিন্তু কিছুটা কষ্ট ও অবহেলার সাথে পড়ে। তবে বাড়িতে কোনো মেহমান এলে তাহাজ্জুদ পড়া তার জন্য খুব সহজ হয়ে যায়। সে এটাও জানে যে, সওয়াবের আশা না থাকলে শুধু মেহমানকে দেখানোর জন্য সে তাহাজ্জুদ পড়তো না।

এরচেয়েও বেশি গোপন সেই রিয়া, যা আমলের জন্যও হয় না এবং আমলকে সহজও করে না। তবে তা অন্তরে গোপন থাকে। আমলের উপর

এর কোনো আধিপত্য নেই বিধায় আলামত ব্যতীত একে জানাও সম্ভব নয়। এর সবচেয়ে সুস্পষ্ট লক্ষণ এই যে, এই রিয়াকারের আমল সম্পর্কে মানুষ জানতে পারলে সে খুশি হয়। যেমন, অনেক আবিদ রয়েছে, যারা একনিষ্ঠতার ইবাদত করে এবং রিয়ায় বিশ্বাস করে না; বরং একে খারাপ মনে করে। কিন্তু যখন তাদের ইবাদত সম্পর্কে মানুষ জেনে যায়, তখন তারা খুব খুশি হয়— যেন ইবাদতে পরিশ্রম করার একটি বোঝা অন্তর হতে নেমে গেল। বলাবাহুল্য, একটি গোপন রিয়া থেকেই এই আনন্দের সূচনা হয়। কারণ, মন যদি মানুষের দিকে খেয়াল না করতো, তাহলে মানুষের জানার কারণে এই পুলক কখনও হত না। অতএব বোঝা গেল তো, পাথরে যেমন আগুন গোপন থাকে, এই রিয়াও তেমন অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, যার মধ্যে মানুষের অবগতি চকমকি পাথরের কাজ করেছে এবং খুশির আলামত ফুটিয়ে তুলেছে। এরপর এই জানা থেকে উদ্ভূত খুশির স্বাদ যদি আবিদ ব্যক্তি গ্রহণ করে এবং ঘৃণা দ্বারা ক্ষতিপূরণ না করে, তাহলে এ পুলকই গোপন রিয়ার শক্তি ও আধার হয়ে যায়।

এরচেয়েও অধিক লুক্কায়িত সেই রিয়া, যাতে মানুষের জানার খাহেশ থাকে না এবং ইবাদত প্রকাশ পেলে খুশিও হয় না; কিন্তু তারপরও এটা ভালো মনে হয় যে, লোকে তাকে দেখামাত্রই প্রথমে সালাম করুক, ভদ্র আচরণ করুক, তার কাজে সন্তুষ্ট থাকুক এবং কেনাকাটায় তার খাতির করুক। এসব ব্যাপারে কেউ ভুল করলে সেটা তার নিকট খুব কষ্টের কারণ ও অবাস্তব মনে হয়। এ অবস্থায় সে যেন এই সম্মান ও সম্ভ্রম সেই ইবাদতের কারণেই চায়, যা সে লুকায় এবং কাউকে জানায় না। এই ইবাদত পূর্বে না করলে সম্মান প্রদর্শনে মানুষের ত্রুটি তার নিকট অবাস্তব মনে হতো না। সুতরাং এ ধরনের ইবাদতে আবিদ শুধু আল্লাহ তাআলার অবগতিতে সন্তুষ্ট থাকে না, তাই তার সাথে গোপন রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, যা পিঁপড়ার পায়ের শব্দ থেকেও অধিক লুক্কায়িত। এই রিয়া যদি সওয়াব ধ্বংস করে দেয়, তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ এই রিয়া থেকে বাঁচতে পারে না। সওয়াব ধ্বংস করার দলীল আলী (রা)-এর এই উক্তি— কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ক্বারীগণকে বলবেন ঃ তোমাদের জন্যে লোকেরা কি পণ্যদ্রব্যের দাম হালকা করে দিত না? তোমাদেরকে কি প্রথমে সালাম করতো না? তোমাদের অভাব-অনটন কি দূর করতো না? অতএব, আজ তোমাদের জন্য কোনো পুরস্কার নেই। তোমাদের পুরস্কার তোমরা দুনিয়াতেই আদায় করে নিয়েছ।

হাদিস শরিফে বিবৃত হয়েছে তোমরা কোনো সাওয়াব পাবে না। তোমাদের প্রতিদান তো (পার্থিব জীবনেই) চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (র) বলেছেন, ওহাব ইবনুল মুনাব্বিহ (র) বলেন, এক পরিব্রাজক তার সঙ্গীদের বললো, আমরা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ করেছি। কিন্তু বর্তমানে তো আমরা সম্পদশালীদের চেয়েও বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছি। আমাদের অবস্থা হয়েছে এমন যে কারও সাথে সাক্ষাৎ হলে আমরা সম্মান কামনা করি । কারও কাছে কোনো প্রয়োজন নিয়ে গেলে ধর্মীয় অবস্থানের কারণে প্রয়োজন পূরণের আশা করি। দোকানে সদাই কিনতে গেলে মনে করি তারা আমাদের থেকে দাম কমিয়ে রাখবে।

লোকটির এই কথা দেশের বাদশার কানে গেলো। বাদশা বিশাল দলবল নিয়ে পরিব্রাজকের সাথে সাক্ষাৎ করতে চললো।

সংসারত্যাগী পরিব্রাজক লোকটি বিশাল বহর নিয়ে কাউকে আসতে দেখে জানতে চাইলেন, কে আসছে এদিকে? বলা হলো দেশের মহানুভব বাদশা আসছেন। লোকটি তখন খাদেমকে ডেকে বললেন, আমাকে খাবার দাও। খাদেম তার জন্য তরকারি তেল ও মাথি (খেজুর বা নারকেল জাতীয় গাছের অংশ বিশেষ) নিয়ে এলো। লোকটি পেট ভরে আহার করলো। এবং খাবার দিয়ে গলা পর্যন্ত ভরে ফেললো।

বাদশা এলেন, জানতে চাইলেন, তোমাদের প্রধান কে? ডাকো তাকে। সবাই পেটপুরে খেয়ে এক দিকে বসে থাকা লোকটিকে ইশারায় দেখিয়ে দিলো এ আমাদের প্রধান। বাদশা তার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, কেমন আছেন আপনি? দরবেশ উত্তর দিলো, আর সবার মতোই আছি।

অন্য হাদিসে আছে, দরবেশ উত্তরে বললো, ভালোই আছি...।

কিন্তু দরবেশের ভাবগতি দেখে বাদশার ভালো লাগলো না। সে বললো, এটা কোনো দিন ভালো থাকার নমুনা হতে পারে না।

তারপর পেছন দিকে চলে গেলো। বাদশার প্রস্থানে পরিব্রাজক দরবেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা। যিনি বাদশাহকে আমার থেকে প্রশংসাহীন মনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। (ইবুনূর মুবারক কিতাবুয যুহদ : ১৪৬৪)

তাই যারা মুখলিস, আজীবন তারা নিজেদের বিষয়ে গোপন রিয়ার ভয়ে থাকে। তারা নিজেদের কল্যাণকর্মগুলোকে সবসময় আড়াল করতে সচেষ্ট। সাধারণ একজন মানুষ যতটা না নিজের দোষ আড়াল করতে চায় তারা তাদের চেয়েও বেশি নিজেদের পুণ্যের বিষয় গোপন রাখতে চায়। যাতে তাদের সমুদয় আমল আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ থাকে। তাতে যেনো লৌকিকতার ছিটে না লাগে। তাদের ইখলাসের কারণে কেয়ামতের দিন আল্লাহ সমুদয় সৃষ্টির সামনে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। কারণ সেদিন আল্লাহ খালেস দিলের ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করবেন না। তারা জানে কেয়ামতের দিন কল্যাণ কর্মই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। কারণ সেদিন কাজে আসবে না কোনো ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি। বাবা উপকার করতে পারবে না সন্তানের। সন্তান উপকার করতে পারবে না বাবার। সাধারণ মানুষের কথা বাদই দিলাম, সেদিন সিদ্দিকরা পর্যন্ত বলতে থাকবে ইয়া নাফসী... ইয়া নাফসী..!! অথচ তারা আল্লাহর কাছে অনন্য মর্যাদার অধিকারী। কারণ তারা দান করতো মানুষের প্রয়োজন বুঝে। যেমন তারা যখন বায়তুল্লাহ যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করতো তখন সাথে করে মরোক্কোয়ান খাঁটি স্বর্ণ নিত এবং বেদুঈনদের দান করতো। কারণ, ভেজাল বা খাদযুক্ত ধাতু তাদের কোনো উপকার করে না। আর তাদের নির্দিষ্ট কোনো আবাস ভূমি নেই। কোনো সুহৃদ প্রতিবেশি নেই। কাজেই খাটি বস্তু দিয়ে তারা শুধু প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে না। এভাবে কেয়ামতের দিন মানুষের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। আর সেদিনের পাথেও হবে তাকওয়া।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেলো, গোপন রিয়ার পঙ্কিলতার বিস্তৃতি অনেক বেশি। যখন মনে এই বিভাজক ভাবনা আসে যে, মানুষ কিংবা কোনো প্রাণী, কেউ তাকে কি ইবাদত করতে দেখেছে তখনই সে সুপ্ত রিয়ার স্বীকার হয়েছে বলে মনে করা হবে। কেননা, প্রাণিকে দেখিয়ে ইবাদত করার বাসনা যেহেতু সে করে না তাই কোনো প্রাণী কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশু তাকে দেখলো কি দেখলো না তা নিয়ে সে ভাবে না। সত্যবিচারে সে যদি ইবাদতে মুখলিস হতো তাহলে আকেল বা জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে ইবাদত করতে দেখলেও তার মনে কোনো ভাবান্তর হতো না। (তার ভাবনা হতো এমন, মানুষ যেই হোক, বুদ্ধিমান অথবা নির্বোধ কেউ তার রিযিকের ব্যবস্থা করে না। তার জীবন মৃত্যুর হিসাব নেয় না। কমাতেও

পারে না। যেমন পারে না পশু পক্ষীরা। কিন্তু ব্যক্তির মনে যদি এই ভাবনা না আসে তাহলে বুঝতে হবে তার মনে সুপ্ত রিয়ার পঙ্কিলতার আঁচড় লেগেছে। তবে সামগ্রিকভাবে সুপ্ত রিয়ার সব স্তরকেই অবৈধ বলা যাবে না। কারণ বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

কথা হলো, ইবাদত জাহির হয়ে পড়লে খুশি হয় না— এমন মানুষের দেখা পাওয়া কঠিন। বরং এ ব্যাপারে সকল ইবাদতকারীই কিছু না কিছু আনন্দ অনুভব করে। সুতরাং সকল প্রকার আনন্দই কি খারাপ, না কিছু খারাপ ও কিছু ভালো আছে? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, সকল প্রকার আনন্দই খারাপ নয়। ইবাদত জাহির হয়ে পড়ার আনন্দ পাঁচ প্রকার হতে পারে। এর মধ্যে চার প্রকার প্রশংসনীয় আর একটি নিন্দনীয়। প্রশংসনীয় চার প্রকারের প্রথম প্রকার এই যে, ইবাদত গোপন থাকুক— এটাই আবেদের কাম্য। তবে জাহির হয়ে পড়ার পর আবিদ এই ভেবে খুশি হয় যে, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে চান। সেজন্য আমার গুনাহসমূহ আড়াল করেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করে দেন। আমার ইচ্ছা ছিল গুনাহ ও আনুগত্য উভয়টি লুক্কায়িত থাকুক। এরচেয়ে বড় সদয় আর কী হবে যে, তিনি গুনাহকে ঢেকে রেখেছেন এবং ইবাদতকে জাহির করে দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতের কথা ভেবে আবেদের এ আনন্দ খারাপ নয়; বরং ভালো। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا.

বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহে ও রহমতে। অতএব এতেই খুশি হওয়া উচিত। (সূরা ইউনুস : ৫৮)

এ খুশির কারণ এই যে, আবেদ বুঝতে পারল সে আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যেমন আমার গুনাহ গোপন রেখেছেন এবং ইবাদত প্রকাশ করে দিয়েছেন, তেমনি পরকালেও করবেন— এ মনে করে খুশি হওয়া। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

مَاسَتَرَ اللهُ عَلٰى عَبْدٍ ذَنْبًا فِى الدُّنْيَا اِلَّا سَتَرَهٗ عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرَةِ.

আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যে বান্দার গুনাহ ঢেকে রাখেন, পরকালেও তার গুনাহ ঢেকে রাখবেন। (সহিহ মুসলিম : ২৫৯০)

বোঝা গেল, এ আনন্দের কারণ হলো ভবিষ্যতে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার আশা।

তৃতীয়ত, এই ভেবে খুশি হওয়া, এই আনুগত্য প্রকাশিত হলে মানুষ আমার অনুকরণ করবে এবং এমনি ধরনের আনুগত্য করবে। ফলে আমার সওয়াব আরও বৃদ্ধি পাবে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন— যে কোনো সওয়াবের কাজ করে এবং মানুষ তার অনুকরণ করে, সে অনুকরণকারীদের সমান সওয়াব পেতে থাকে এবং তাদের সওয়াব কমিয়ে দেওয়া হয় না। বলাবাহুল্য, নেকি বৃদ্ধির আশা করা আনন্দদায়ক। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইবাদতকে ঢেকে রাখার সওয়াবও পাবে এবং পরে জাহির হয়ে পড়ার কারণেও সওয়াব পাবে।

চতুর্থত, এই ধারণা করে খুশি হওয়া, যারা তার ইবাদত সম্পর্কে জেনে তার প্রশংসা করেছে, তারা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেছে। কারণ, তারা তাঁর অনুগত বান্দাকে প্রিয়পাত্র মনে করেছে। এতে বোঝা যায়, তাদের মন-মেজায আনুগত্যশীল। এছাড়া কতক ঈমানদার এমনও আছে, যারা ইবাদতকারীদেরকে দেখলে হিংসা করে, নিন্দা করে এবং রিয়াকার বলে ঠাট্টা করে। সুতরাং প্রশংসা দ্বারা জানা গেল, প্রশংসাকারীদের ঈমান ঠিক। এক্ষেত্রে ইবাদতকারীর মনের গতির নিদর্শন এই যে, মানুষ অন্য কোনো ইবাদতকারীর প্রশংসা করলেও সে সেই পরিমাণ খুশি হয়, যে পরিমাণ নিজের প্রশংসার জন্যে খুশি হয়।

পঞ্চমত, স্তুতিলাভের মন্দ আনন্দ হচ্ছে, এই ভেবে খুশি হওয়া যে, ইবাদতের কারণে মানুষের মনে আমার সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ফলে, তারা আমার প্রশংসা করতে শুরু করেছে, ওঠাবসায় আমাকে প্রাধান্য দিচ্ছে এবং আমার প্রয়োজনে সাহায্য করছে। ইবাদতকারীর এই প্রকার আনন্দ নিঃসন্দেহে অপরাধ।

জাহির ও বাতিন রিয়ার মধ্যে যেগুলো বাতিল

মনে রাখতে হবে বান্দা যখন কোনো ইবাদতকে ইখলাস তথা আন্তরিকতার সাথে আদায় করে, এরপর তার মধ্যে রিয়া চলে আসে, তখন এই রিয়া হয় ইবাদত শেষ করার পরে, না হয় আগে, না হয় ইবাদতের সাথে সাথে আসবে। যদি ইবাদত শেষ করার পর শুধু তা জাহির হয়ে পড়ার আনন্দ হয় এবং নিজে জাহির না করে, তাহলে এই আনন্দ ইবাদতকে বাতিল করবে না। কেননা, ইবাদত তো রিয়া ব্যতীত ইখলাস সহকারে খতম হয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে যে রিয়া হবে, তার প্রভাব আশা করা যায় ইবাদত পর্যন্ত

পৌছবে না। বিশেষ করে যখন ইবাদতকারী নিজে তা জাহির করেনি; বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জাহির করার কারণে প্রকাশ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যদি রিয়া ব্যতীতই ইবাদত করা হয়, কিন্তু ইবাদতকারী পরে তা স্বেচ্ছায় জাহির করে দেয়, তবে এতে ভয়ের কারণ আছে এবং হাদিস ও বুযুর্গদের বাণী থেকে জানা যায় যে, এটা ইবাদতকে বাতিলও করে দেবে। তাই ইবনে মাসউদ (রা) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, আমি গত রাতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করেছি। তিনি বললেন, এই ইবাদতে এই ব্যক্তির অংশ এতটুকুই। (আর রিআয়া : ২১০)

প্রিয়নবী (স)-এর দরবারে এসে এক ব্যক্তি নিবেদন করল, আমি আজীবন রোযা রেখেছি। তিনি বললেন, তুমি রোযাও রাখনি এবং রোযাহীন অবস্থায়ও জীবন কাটাওনি। কেউ কেউ এই কথার কারণ এটাই বর্ণনা করেন যে, লোকটি তার ইবাদত প্রকাশ করে দিয়েছিল। কারও মতে এর কারণ এই ছিল যে, আজীবন রোযা রাখা অপছন্দনীয়।

যা হোক, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ও ইবনে মাসউদ (রা)-এর উক্তি এ কথা প্রমাণ করে যে, ইবাদত করার সময় লোকটির অন্তর রিয়া থেকে খালি ছিল না। কেননা, সে নিজে বলে তা জহির করে দিয়েছে। যে রিয়া ইবাদতের পরে প্রকাশ পায়, তা ইবাদতের সওয়াব বাতিল করে দেবে— এটা অবশ্য কিয়াস তথা অনুমানের পরিপন্থি। কিয়াস বলে, রিয়ার পূর্বে সম্পন্ন আমলের সওয়াব সে পাবে এবং আমলের পরে যে রিয়া অবশিষ্ট থাকবে, তার কারণে শাস্তি পাবে।

কেউ একনিষ্ঠভাবে যদি নামায আদায় করে; কিন্তু আদায় করার সময় কিছু রিয়াও হয়ে যায়, তাহলে নামাযের নেকি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন, এক ব্যক্তি যখন নফল নামায আদায় করছিল, তখন তার নিকট কিছু লোক অথবা কোনো শাসক পর্যায়ের কেউ আসল, আর তার মনে বাসনা দেখা দিল যে, লোকেরা তাকে দেখুক। অথবা নামাযের মধ্যে কোনো বিস্মৃত বস্তু স্মরণ হলো এবং তা অন্বেষণ করার বাসনা জাগ্রত হলো। এমনকি লোকজন না থাকলে নামায ছেড়ে দিয়েই তা খোঁজ করতে প্রবৃত্ত হতো। শুধু লোক লজ্জার ভয়েই নামায পূর্ণ করল। এমতাবস্থায় তার নামাযের সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। ফরয নামাযে এরূপ হলে সেই ফরয নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে,

اَلْعَمَلُ كَالْوِعَاءِ إِذَا طَابَ اٰخِرُهُ طَابَ اَوَّلُهُ.

আমল পাত্রের মতো। তার শেষটা ভালো হলে শুরুটাও ভালো হবে।

এই হাদিস থেকে জানা গেল, শেষ পর্যন্ত ভালো করা উচিত। এক বর্ণনায় আছে— যে লোক সামান্য পরিমাণও রিয়া করবে তাঁর পূর্বে কৃত সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ১৫০)

এ বর্ণনাটি শুধু নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- সদকা ও তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, সদকা ও তিলাওয়াতের প্রত্যেকটি অংশ পৃথক। সুতরাং যে অংশে রিয়া হবে, তা এবং তার পরবর্তী অংশ বাতিল হবে— পূর্ববর্তী অংশ বরবাদ হবে না। তবে রোজা ও হজের মতো ইবাদত নামাযের হুকুমে আসবে।

কিন্তু যদি রিয়াকারী এমন হয়, তাকে সাওয়াবের জন্য কাজ সমাধা করার ইচ্ছা থেকে বিরত রাখা যাচ্ছে না, যেমন, নামাযের মাঝখানে একদল লোক চলে এলো। নামাযী ব্যক্তি তাদের দেখে আনন্দিত হয়ে উঠলো। রিয়ার ভাব জেগে উঠলো এবং লোকদের দৃষ্টি তার উপর পড়ার কারণে সে সুন্দরভাবে নামায আদায় করতে শুরু করলো, যদিও লোকেরা না আসলেও সে নামায পূর্ণভাব আদায় করতো। এটাও কর্মকে প্রভাবক রিয়া। যা কর্মের জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে উজ্জীবিত করে। কিন্তু রিয়া যদি বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, ব্যক্তি ইবাদতের উদ্দেশ্যই বিস্মৃত হয়ে পড়ে তখন ইবাদতের নিয়তটা ধোঁকা বলে বিবেচিত হবে। এভাবে যদি ইবাদতের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে ইবাদতের মধ্যে এক রোকন পরিমাণ সময় কেটে যায় তাহলে তার ইবাদত ফাসেদ বলে গণ্য হবে। কারণ নামাযে তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাধার সময় পূর্বের নিয়তকে কার্যকর করার মানে হচ্ছে, নামাযের মধ্যে খলল সৃষ্টি হয় এমন কর্ম না করা।

একথা বলার সুযোগও আছে যে, কর্ম শুরু করার বিবেচনায় ও সাওয়াবের নিয়তে ইবাদত ফাসেক বলে গণ্য হবে না। যদিও শক্তিশালি অন্য বিষয় সামনে চলে আসার কারণে তার ইবাদত দুর্বল হয়ে পড়বে।

কিন্তু হারিস আল মুহাসাবি (র)-এর চেয়ে কম মন্দ কারণে ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে বলে মত দিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি ইবাদতের মাঝ পথে সে মানুষকে দেখিয়ে নিছক আনন্দ লাভের নিয়ত করে। তাহলে ইবাদতের কি হুকুম হবে।

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তার ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ সে প্রথম অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং বান্দার প্রশংসা পাওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং তার আমলের সমাপ্তি ইখলাসের মাধ্যমে হয়নি। আর সমাপ্ত করার মাধ্যমেই যে কোনো কাজ সম্পূর্ণ হয়। (আর রিআয়া : ২৩৩)

হারিস আল মুহাসাবি আরও বলেন, আমি নিশ্চিতভাবে বলছি না যে, তার আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং তার আমল শুদ্ধ হয়েছে একথাও বলতে পারছি না। আলেমগণের ইখতিলাফের সামনে আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। তবে আমার কাছে যা মনে হয় তা হলো লোকটি যদি রিয়ার সাথে আমল সমাপ্ত করে তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। (আর রিয়া : ২৩৪)

তারপর তিনি বলেন, হাসান বসরি (র) বলেন, এ দুটির প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে তাই নামাযের নিয়ত যদি আল্লাহর জন্য একনিষ্ট করে নামাযে দাঁড়ায় তাহলে পরবর্তীতে আসা রিয়ার পঙ্কিলতা নামায নষ্ট করতে পারবে না। (আর রিআয়া : ২৩৩; আসারটি উল্লেখ করেন শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬৪৭৪)

বর্ণিত রয়েছে, এক সাহাবি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, 'আমল' আমাকে আনন্দ দেয়। আমি চাই না কেউ আমাকে দেখুক। কিন্তু কারও চোখে আমার আমল করার বিষয়টি পড়ে গেলে আমার মনে আনন্দ অনুভব হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এতে চিন্তার কিছু নেই। তুমি দুইটা প্রতিদান পাবে। একটা সওয়াব গোপন করার। অন্যটা প্রকাশ করার।

(জামে তিরমিযী : ২৩৮৪; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২২৬)

এরপর হারিস মুহাসাবি (র) আসার ও হাদিসের ব্যাখ্যা করে বলেন, হাসান বসরি (র) لَا يَضُرُّهُ বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে আমল করা ছাড়বে না। আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করলে কোনো ঝুঁকি তার জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হবে না। হাসান বসরি (র) একথা বলেননি, মুখলিস দিলে আমল শুরু করার পর মনে রিয়ার ভাব আসলে তা ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হবে না। (আর রিআয়া : ২৩৪)

আর হাদিসের বিষয়ে রিআয়া গ্রন্থকার হারিস মুহাসাবি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যার সারমর্ম হলো তিনটি কথা।

১. হয়তো সাহাবি আমল সমাপ্ত করার পর লোকদের দেখাতে চেয়েছেন। নামাজের ভেতরেই তার এমন ইচ্ছা হয়েছে হাদিসের কোথাও একথা উল্লেখ নেই।

২. সাহাবী বলতে চেয়েছেন, মানুষ আমল দেখে তার অনুসরণ করলে তার মনে আনন্দ দেখা দেয়। কিংবা অন্য ব্যক্তি তাকে ইকতিদা করে যে আনন্দ পায় সে আনন্দ তাকেও ছুঁয়ে যায়।

বিষয়টি অন্যের প্রশংসা প্রীতির কারণে সৃষ্ট আনন্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর দলিল হলো আল্লাহর রাসূল (স) তার জন্য দুটি প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। আর এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, মানুষের মুখ থেকে স্তুতি বাক্য শোনার জন্য যে আমল করে সে কোনো সওয়াবই পাবে না। বেশি হলে তার জন্য ক্ষমার ঘোষণা আসতে পারে। তাহলে এমন কি করে হতে পারে যে, মুখলিস ব্যক্তি একটা প্রতিদান পাবে আর রিয়াকার পাবে দুইটা!!

৩. যারা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাদের অনেকেই একে রাবি আবু হুরায়রা (রা) এর সাথে সংযুক্তভাবে বর্ণনা করেননি। বরং অধিকাংশই আবু সালাহ (র) পর্যন্ত মাওকুফ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তবে কেউ কেউ হাদিসটি মারফু সনদেও উল্লেখ করেছেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এই রেওয়াতের উপর রিয়ার অন্যান্য হাদিস প্রাধান্য পাবে। (আর রিআয়া : ২৩৫)

এটা হলো হারেস মুহাসাবি (র) এর নিজস্ব একটা অভিমত। তার যেটাকে সঠিক বলে মনে হয়েছে তিনি সেটা এখানে বলেছেন। অকাট্য কোনো দাবী তিনি এখানে করেননি।

আর আমাদের কাছে যে মত সবচেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়, সেটা হলো, আমলের মধ্যে যদি রিয়ার প্রভাব কম থাকে এবং সে দীনি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমল করে এবং সাথে সাথে অন্য কেউ তাকে আমলরত দেখলে মনে আনন্দ আসে তাহলে আমল ফাসেদ হবে না। বিনষ্ট হবে না। কারণ তার মন থেকে মূল নিয়ত একদম অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং সে পূর্বের নিয়তের প্রেরণাতেই আমল করছে এবং আমল পরিপূর্ণ করতে পারছে।

আর যে সকল হাদিসে রিয়ার বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়েছে সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বান্দার এমন আমল যেগুলো সে অন্যকে দেখানোর নিয়তেই শুরু করে আর যদি কোনো আমলের মধ্যে ইখলাস ও লৌকিকতা মিলে মিশে থাকে তাহলে বিষয়টি আপেক্ষিক হবে। আমলের

ক্ষেত্রে তখন নিয়তের গণ্যতা বেড়ে যাবে। তার মনে যদি সওয়াব পাওয়ার নিয়ত প্রবল থাকে তাহলে এক হুকুম। লৌকিকতার প্রভাব বেশি থাকলে এক হুকুম। আর দুটো সমান সমান থাকলে হবে অন্য হুকুম।

সওয়াবের তুলনায় যদি লৌকিকতা দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে আমলের সওয়াব নষ্ট হবে না এবং তার নামাযও ফাসেদ হবে না।

একথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করতে বলেছেন। আর ইখলাসের অর্থ হলো, যা অন্য কোনো কিছুর মিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকে। কাজেই যার আমলের মধ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য যুক্ত হবে তাকে ওয়াজিব আদায় করেছে বলে বিবেচনা করা হবে না। আর কার আমল সন্দেহ মুক্ত, কে অন্য উদ্দেশ্য নিজের আমলের সাথে মিলিয়ে আমল করেছেন, তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

কিতাবুল ইখলাসে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারে।

এই হলো ইবাদতের ভেতর আগত লৌকিকতার হুকুমের বিবরণ। হতে পারে এটা ইবাদতের মধ্যে। কিংবা ইবাদত শেষ করার পরে সে রিয়ার শিকার হয়েছে।

লক্ষ রাখতে হবে, যে লোক নামাযের নিয়ত করার সঙ্গে সঙ্গে রিয়ার ইচ্ছা করে এবং তা সালাম ফিরানো পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তার নামায মূল্যহীন। সকল ইমামের একই মত যে, এরকম নামায মূল্যহীন। এ নামাযের কাযা করতে হবে। আর নামায শেষ হওয়ার আগেই যদি নামাযের মধ্যে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং রিয়া ত্যাগ করে, তাহলে তার নামায সম্পর্কে তিন ধরনের বক্তব্য বর্ণিত আছে।

১. কেউ কেউ বলেন, সে রিয়ার ইচ্ছা নিয়ে নামায শুরু করেছিল সেজন্য তার নামাযই হয়নি। সুতরাং নতুনভাবে নিয়ত করা প্রয়োজন।

২. কারও মতে এমন ব্যক্তির নিয়ত ঠিক থাকবে এবং রুকু, সিজদা ইত্যাদি গৃহীত হবে না। সেজন্য রুকু, সিজদা পুনরায় করতে হবে।

৩. অনেকে বলেন, কিছু করতে হবে না; বরং মনে মনে তাওবা করে একনিষ্ঠভাবে নামায শেষ করবে। কেননা, শেষ অবস্থাটিই গণ্য

হবে। যদি ইখলাস সহকারে নামায আরম্ভ করে রিয়ার উপর শেষ করে, তবে নামায বরবাদ হয়ে যাবে। এখানে এর বিপরীত হয়েছে; অর্থাৎ রিয়া দ্বারা আরম্ভ করে ইখলাসের উপর সমাপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং নামায বরবাদ না হওয়া উচিত। এটা এমন, যেমন কোনো পবিত্র কাপড়ে নাপাকী লেগে গেল। এরপর সেই নাপাকী দূর করা হলো। এমতাবস্থায় কাপড়টি পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।

ফিকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মতে উল্লিখিত দুটি উক্তিই বাতিল। বিশেষ করে যারা বলে, আবার শুধু রুকু-সিজদা করে নেবে— তাকবীরে তাহরীমার পুনরাবৃত্তির দরকার নেই। কেননা, রুকু-সিজদা শুদ্ধ না হলে এগুলোকে নামাযে অতিরিক্ত কাজ হিসেবে গণ্য করতে হবে, যা নামাযকে ফাসিদ করে দেয়। এই উক্তিটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, শুরুতে রিয়া থাকার কারণে নিয়তে ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে।

কাজেই ফিকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিষয়টি সহীহ , তা এই যে, যদি এই নামাযের প্রেরণাদাতার সওয়াব না হয়ে শুধু রিয়া হয়— তবে তাহরীমাই সহীহ হবে না। সুতরাং এর পরে যা কিছু করবে, তার কোনোটিই সহীহ হবে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি একাকী থাকলে নামায পড়তো না; কিন্তু জনসমাবেশ দেখে নিয়ত বেঁধে নিল। তার এই নামাযে নিয়তই নেই। মূলত নিয়ত সেই ইচ্ছাকে বলা হয়, যার উৎসাহদাতা হয় আল্লাহর হুকুম পালন। এখানে এই উৎসাহদাতা অনুপস্থিত। হ্যাঁ, যদি অবস্থা এমন হতো যে, জনসমাবেশ না থাকলেও নামায পড়ত; কিন্তু জনসমাবেশ থাকায় তাদের ভালো বলারও প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাহলে এক্ষেত্রে দুটি উৎসাহদাতা একত্রিত হয়— ধর্মের আদেশ পালন এবং লোকের ভালো বলার আকাঙ্ক্ষা। এখানে যে পরিমাণে নিয়ত সহীহ হবে, সে পরিমাণে সওয়াব পাওয়া যাবে এবং যে পরিমাণে নিয়ত ভেজাল হবে, সেই পরিমাণে শাস্তি ভোগ করবে।

যে নামায নিয়তে ত্রুটির জন্য ফাসিদ হয়ে যায়, তা নফল নামায, তবে তার বিধান সদকার মতো। অর্থাৎ, এটা একদিক দিয়ে আনুগত্য এবং একদিক দিয়ে নাফরমানি। কারণ, এ ধরনের নামাযির অন্তরে ভালো ও মন্দ দুটি উৎসাহদাতা রয়েছে। সুতরাং এমন কথা বলা যায় না যে, তার নামায সহীহ নয় এবং তার ইমামের আনুগত্যও সহীহ নয়। যেমন, কেউ

তারাবীর নামায আদায় করল এবং অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা জানা গেল যে, তার ইচ্ছা ছিল শুধু সুন্দর কিরাত পড়ে শুনানো। যদি জামাত না হতো এবং সে তার ঘরে একা থাকতো, তবে তারাবীহ পড়তো না। এখানে এটা বলা যাবে না যে, এই লোকের পেছনে নামায পড়া জায়েয নয়। তার সম্পর্কে এরকম ধারণা করা অবান্তর; বরং মুসলমান সম্পর্কে এ ধারণাই করতে হবে যে, সে নফল নামাযের মাধ্যমে সওয়াবের ইচ্ছা রাখে। সুতরাং ইচ্ছার দিক দিয়ে তার নামাযও সহীহ এবং তার পিছনে নামায পড়াও জায়েয, যদিও সওয়াবের ইচ্ছার সাথে অন্য ইচ্ছাও যুক্ত হয়েছে।

কিন্তু যদি ফরয নামাযে দুই প্রেরণাদাতা একত্রিত হয়ে নামায আদায় করার কারণ হয়, তাহলে নামায ফরয হতে মুক্ত হবে না। কেননা, ফরযের প্রেরণাদাতাটি তার মধ্যে ভিন্নভাবে ছিল না।

আর এটা যদি হয়, কোনো ফরয আমলের ক্ষেত্রে এবং তাতে প্রেরণাদাতা দুটি বিষয় এমনভাবে থাকে যে, একটাকে অন্যটা থেকে আলাদা করা যায় না; বরং প্রভুর সন্তুষ্টি ও লৌকিকতা প্রদর্শন উভয় কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আমল করে তাহলে তার ফরযিয়্যাত আদায় হবে না। কারণ আমি প্রভুর আদেশ পালন করছি, শুধু এ নিয়তে সে আমল করেনি। বরং তার সাথে অন্য উদ্দেশ্যও ছিলো।

কিন্তু নামায আদায়ের পেছনে যদি প্রেরণাদায়ী কারণগুলো ভিন্ন ভিন্ন থাকে তাহলে নিয়তের উপর ভিত্তি করে আমলের হুকুম বিন্যস্ত হবে। কেউ লৌকিকতাহীন ভাবে ইবাদত করলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কারও মনে ফরয আদায়ের নিয়ত না থাকলে তার নামায নফল হিসেবে গণ্য হবে।

তবে এটা অনেক তর্কপূর্ণ স্থান। এখানে বেশ কিছু মতামত উপস্থাপন করার সুযোগ রয়েছে।

কেউ বলতে পারে ফরয হলো এমন নামায যা নিয়তকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি একনিষ্ট রেখে আদায় করা হয়। এখানে তা পাওয়া যায়নি।

বলা যায় ওয়াজিব ইবাদত হলো নিজের মধ্যে ভিন্ন এক ধরনের প্রেরণা অনুভব করে আল্লাহর হুকুম পালন করা। আর এটা এখানে পাওয়া গেছে। ফলে তার সাথে অন্য কোনো বিষয়ের উপস্থিতি তার ফরযিয়্যাতকে বাতিল করে না। যেমন অবৈধভাবে দখল করা স্থানে নামায আদায় করলে

ফরযিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে। স্থান কেড়ে নিয়ে সেখানে নামায আদায় করার কারণে যদিও সে গুনাহগার কিন্তু শুধু নামায আদায়ের বিবেচনায় সে আল্লাহর আনুগত্যই করছে এবং নিজের উপর আবশ্যক হওয়া বিধান পালন করছে। কাজেই মূল নামাযের মধ্যে প্রেরণাদায়ী হুকুমের বিপরীতমুখিতার কারণে হুকুমের মধ্যে বৈপরীত্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

আর যদি রিয়া মূল নামাযে নয় বরং নামাযের পারিপার্শ্বিক বিষয়ে হয় যেমন কেউ সবার সাথে থাকলে প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে গিয়ে জামাতের জন্য বসে থাকে। কিন্তু একা থাকলে ওয়াক্ত আছে না গেছে তার কোনো খবর থাকে না। আর নামায ফরয না হলে কোনোদিন সে নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আসতো না।

এগুলো আসলে মূল নামাযের ভেতরগত বিষয় নয়। বরং তার সাথে সম্পর্কিত একটা বিষয়। তাই এর কারণে তার ফরয্যিাত আদায়ের পথে বাধা হবে না। কারণ সে সালাত আদায়ের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে লৌকিকতা করেছে আর বিষয়টি নামাযের নিয়তকে কলুষিত করার কারণ হিসেবে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

উপরে এমন রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো যা মানুষকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে আমল করতে বাধ্য করে। কিন্তু রিয়াটা যদি এমন হয় ইবাদত করার পেছনে প্রেরণাদানের ভূমিকা পালন না করে অন্যকে দেখিয়ে শুধু আনন্দ উপভোগ করা হয় তাহলে সেটা ইবাদতকে বিনষ্ট করবে না।

ফিকহের রীতি হিসেবে এতটুকু আলোচনা করাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। মাসআলাটি এই দিক থেকে বিশাল যে, ফিকহবিদগণ এক্ষেত্রে আলোচনার অবতারণা করেননি। আবার যারা এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এমন হলে নামাযের কি হুকুম হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট মতামত তুলে ধরেননি। বরং তাদের ভাবনার এ বিষয়টি তেমন বিবেচ্য বলে মনে হয়নি। তবে শেষ কথা হলো পূর্বে আমার করা আলোচনাই এক্ষেত্রে যথার্থতার দাবী রাখে।

আর এ বিষয়ে সঠিক ও নিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে আল্লাহর কাছে। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় ধরণের জ্ঞাণের মালিক। তিনি চির দয়াময়। পরম দয়ালু।

রিয়ার প্রতিকার

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মানবাত্মার উপর রিয়া খুব জঘন্যভাবে প্রভাব ফেলে। তার যাবতীয় আমল নষ্ট করে দেয়। আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করা হয় সর্বোপরি রিয়াকারকে সবসময় আত্মবিধ্বংসি কবিরা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকতে হয়।

প্রতিটি মুসলিমের জন্য রিয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষয়। তাই একে প্রতিরোধ করতে, মনকে রিয়া থেকে পরিশুদ্ধ করতে সবার উচিত কোমর বেধে নেমে পড়া এবং কষ্টকর হলেও তাকে দূর করতে সচেষ্ট হওয়া। সে জন্য যদি তেতো গান্ধা ওষুধও গলাধঃকরণ করতে হয় তাহলে তাই সই! প্রতিটি মানুষেকে বাধ্য হয়ে হলে ও রিয়ার বিরুদ্ধে মুজাহাদায় নামতে হয়।

একজন শিশু যখন জন্ম হয় তার জ্ঞান থাকে অপূর্ণাঙ্গ। বুদ্ধি থাকে অপরিপক্ক। ভালোমন্দের মধ্যে বিভাজন করার মতো মেধা তার থাকে না। সে তখন অন্যদের দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তাদের কাছেই তার সব চাহিদার কথা বলে। সব আবদার জানায়। তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতার প্রলেপ থাকে না। এভাবে ধীরে ধীরে শিশু বড় হয়। তার দেখার শক্তি বাড়ে। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা সে বুঝতে পারে। অন্যদের কাজ কর্ম বিচার করতে পারে। তখন চারপাশে সে কতগুলো মুখোশ পরা মুখ দেখতে পায়। দেখতে পায় তারা একে অন্যের সাথে ভান করছে। মনে বিদ্বেষ জমিয়ে রাখলেও মুখে হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে।

তখন সদ্য বড় হওয়া শিশুটি ভান বিষয়টাকে ভালোবেসে ফেলে। এবং সেও ভান করতে থাকে। একসময় সেও নিজের মুখের বিভিন্ন মুখোশ বানাতে পারদর্শি হয়ে ওঠে।

এক সময় সে জ্ঞানে গুণে বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন সে মুখ ও মুখোশের মধ্যে বিপুল ব্যবধান বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, অন্যের দেখাদেখি ভান বা ভনিতার আশ্রয়ে নিজেকে ঠেলে দিয়ে প্রকারান্তে সে ধ্বংসের পথেই হেঁটেছে। কিন্তু ততোদিনে লোক দেখানো মনোভাব তার হৃদয়ে শেকড় গেড়ে বসে পড়েছে। তখন মুখ থেকে মুখোশকে বাদ দিতে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। সাধনা করতে হয়। প্রবৃত্তির দুয়ারে অর্গল তুলে দিতে হয় এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাধনায় মগ্ন থাকতে হয়। এভাবে

একদিন তার দেখার চোখ বদলে যায় এবং সে হয়ে ওঠে ভানমুক্ত ভনীতাহীন নিখাদ একজন মানুষ।

রিয়ার প্রতিকার : রিয়া প্রতিকারের দুটি স্তর,

১. রিয়ার উৎসমূল কেটে দেওয়া।

২. পরিস্থিতি বিচারে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়কে তাৎক্ষণিকভাবে দমন করা।

প্রথম মাকাম : রিয়ার উৎসমূল কেটে দেওয়া

রিয়া বা লৌকিকতার মূল উৎস হলো সম্মান ও খ্যাতি প্রীতি। কিন্তু ব্যাখ্যা করে বললে এখানে তিনটা উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

ক. স্তুতি প্রীতি।

খ. নিন্দার অপছন্দনীয়তা।

গ. অন্যের কাছে থাকা বস্তুর প্রতি লোভ।

এগুলোই হলো মানুষকে রিয়ার দিকে প্ররোচনাদায়ক।

আবু মুসা আশআরি (রা) বলেন, একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে জানতে চাইলেন— এক লোক জাত্যাভিমানের কারণে জিহাদ করে। (অর্থাৎ সে পরাজিত হতে এবং তাকে কেউ পরাজিত বলেছে এটা অপছন্দ করে।) কোনো ব্যক্তি নিজের মর্যাদা প্রকাশের জন্য জিহাদ করে। (অর্থাৎ অন্যকে নিজের সক্ষমতা দেখাতে চায়।) কেউ জিহাদ করে প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে। এদের কি হবে? এরা কি জিহাদের সওয়াব পাবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে আল্লাহর দীনকে উচ্চমর্যাদায় আসীন করার জন্য জিহাদ করে সেই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। (সহিহ বুখারি: ১২৩; সহিহ মুসলিম : ১৯০৪)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যখন দুই দল যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয় তখন একদল ফেরেশতা সেখানে অবতরণ করেন। তারা যুদ্ধরত মানুষের স্তর লিখে রাখে, এভাবে অমুক যুদ্ধ করেছে প্রশংসা পাওয়ার জন্য, অমুক যুদ্ধ করছে রাজত্বের লাভের জন্য। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১৪২)

রাজত্বের জন্য যুদ্ধ করার অর্থ হলো দুনিয়ার প্রতি লোভী হয়ে পড়া। ওমর (রা) বলেন, লোকেরা বলে অমুক শহিদ হয়েছে। তাদের বলার ভাব দেখে মনে হয় সে যেনো বিপুল পরিমাণ রূপার মালিক হয়েছে। (বায়হাকি : আস সুনানুল কুবরা : ৬ : ৩৩২)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে গনিমত লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে সে আপন নিয়ত অনুসারে প্রতিদান পাবে। (সুনানে নাসায়ী : ৬ : ২৪)

(এই হাদিসে লোভের দিকে ইশারা করা হয়েছে)

এমনও মানুষ আছে যারা প্রশংসা চায় না এবং প্রশংসা পাওয়ার লোভও করে না। যেমন অনেক দানশীলের মধ্যে যখন একজন কৃপণ থাকে তখন দানশীলদের অনেককে দান করতে দেখে সেও অল্প বিস্তর দান করে। যাতে কেউ তাকে কৃপণ না ভাবে। কিছু মানুষ রয়েছে যারা প্রশংসা লাভের আশাকে করে না। যেমন যুদ্ধের ময়দানে সাহসী বীরদের মধ্যে যখন একজন ভীরু ব্যক্তি থাকে তখন অন্যের থেকে কটু বাক্য শোনার ভয়ে ময়দান ছেড়ে পালায় না।

কিছু মানুষ আছে যারা প্রশংসার উদ্দেশ্যে না হলেও নিন্দা থেকে বাঁচার জন্য রিয়া করে। যেমন তাহাজ্জুদগুজার লোকদের মাঝে একজন ঘুমকাতুরে ব্যক্তি থাকলে সেও রাত জেগে কাটায়; যাতে কেউ তার নিন্দা করতে না পারে।

মানুষ অন্যের মুখের প্রশংসা বাক্য না শুনেও থাকতে পারে। কিন্তু কখনো সে নিন্দা শুনে ধৈর্য ধরে থাকতে পারে না। তাই অনেক সময় মূর্খতার অপবাদ জোটার ভয়ে জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন করতে সে কুণ্ঠাবোধ করে। ফলে না জেনেই সে ফতোয়া দেয়।

অনেকে আছে, মানুষের নিন্দার ভয়ে হাদিস না জেনেই নিজেকে সে মুহাদ্দিস ভাবে।

ওপরে বর্ণিত তিনটি কারণে মানুষ লৌকিকতা প্রদর্শন করে।

প্রতিকার : এ বিষয়ে প্রথম দিকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করেছি। সেখানে খ্যাতিপ্রীতির বিষয়টিও ছিলো। এখানে আমরা শুধু রিয়ার প্রতিকারের বিষয়েই আলোচনা করবো। মানুষের মনের বস্তুর সুস্বাদু উপকারী ও কল্যাণকর হওয়ার বিবেচনায় সে বস্তুটা অন্বেষণে প্রলুব্ধ হয়। হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে, কিংবা বিলম্বে। কিন্তু যদি সে জানতে পারে বস্তুটা বর্তমানে ভালো, তবে কিছুদিন গেলে তা ক্ষতিকারক রূপ ধারণ করবে, তাহলে সেটার আশা ত্যাগ করা সহজ হয়। যেমন সর্বজনবিদিত যে, মধু সুস্বাদু পানীয়। কিন্তু কেউ যদি জানতে পারে মধুতে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে কেউ তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে না।

কাজেই বোঝা গেলো যে, রিয়া থেকে বাঁচার উপায় হলো তার ক্ষতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা।

অনেক সময় বান্দা রিয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত থাকে। সে জানে, রিয়া তার সমস্ত কল্যাণ কর্ম বরবাদ করে দেয়। বর্তমানে অনেক কাজ করার তাওফিক তার হয় না। আখেরাতে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা কমে যায়। তাকে সেখানে ভোগ করতে হবে অনন্ত আযাব। শিকার হতে হবে অশেষ ক্রোধের, সবার সামনে লজ্জিত হতে হবে। সেদিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে সম্বোধন করা হবে ফাজের, গাদ্দার, রিয়াকার বলে।

তোমার কি লজ্জা করে না আল্লাহর আনুগত্যের সাথে দুনিয়ার সওদা করতে? বান্দার মন জয় করার চেষ্টা করতে? তুমি তো আল্লাহকে উপহাস করলে! আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে বান্দার ভালো কথার পেছনে ছুটলে! আল্লাহর দরবারে নিজের মর্যাদা কমিয়ে দিয়ে বান্দার জন্য বাহুডোর উন্মুক্ত করে দিলে! আল্লাহর কাছে নিজেকে তুচ্ছ করে বান্দার সামনে নিজেকে সুশোভিত করে তুললে! আল্লাহর কাছে নিন্দিত হয়ে বান্দার কাছে নন্দিত হতে চাইলে! বিদ্বেষ পোষণ করার জন্য তোমার সামনে কি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ছিলো না?

কখনো কখনো বান্দা এই লাঞ্ছনার কথা ভাবে এবং আখেরাতের হারানো বিলাসিতার সাথে মানুষের মুখের দুটি কথা বা সামান্য কিছু উপহারের সাথে তুলনা করে, পৃথিবীতে রিয়া করার কারণে যে পরিমাণ সওয়াব সে হারাচ্ছে তা নিয়ে ভাবে। একনিষ্ট মনে আল্লাহর জন্য করা একটি আমলই হতে পারে মিজানে পুণ্যের পাল্লা ভারী হওয়ার কারণ। আর সেই আমলই রিয়ার কারণে মন্দে পরিণত হয়। জীবনের সব আমল আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার পরও রিয়ার কারণে যদি তার একটা মাত্র আমল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটাই রিয়া ক্ষতিকর হওয়ার জন্য যথেষ্ট। হতে পারতো, এই পুণ্যের কারণে সে আল্লাহর কাছে নবী কিংবা সিদ্দিকদের কাছাকাছি মর্যাদা লাভ করতো। কিন্তু রিয়ার কারণে সে এই মর্যাদা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং সে সাধারণ স্তরে এসে অলিদের সমান মর্যাদা লাভ করেছে। তাছাড়া রিয়ার আরও ক্ষতিকর দিক রয়েছে। তা হলো মানুষের হৃদয় কাড়তে ব্যস্ত থাকার কারণে পৃথিবীতে বিস্তার বিপক্ষে ঘটে। কারণ মানুষের মন এমন যাকে সহজে সন্তোষজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় না,

একই কাজ একজনের ভালোলাগে, অন্য জনের মনে কষ্টের কারণ হয়। আর যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে বান্দার মন জয় করতে চায়, আল্লাহ তাকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং মানুষের মনেও তার প্রতি বিদ্বেষ ঢেলে দেন। এতো কিছুর পরও আল্লাহর কাছে নিন্দিত হয়ে বান্দার মুখ থেকে দু চারটি প্রশংসা বাক্য শুনে কি লাভটা হলো রিয়াকারের? মানুষ কি তার জীবিকার জোগানি বাড়িয়ে দেবে? না তার মৃত্যুর সময় কিছুটা পিছিয়ে দেবে? কেয়ামতের দিন তারা কোনো উপকারই করতে পারবে না।

অন্যের কাছে থাকা বস্তুর প্রতি লোভ। এটা হলো রিয়া করার আরেকটা মূল কারণ। এর প্রতিকার হলো, অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল রাখা যে, মানুষকে দিয়ে অথবা না দিয়ে আল্লাহ নিজের বশে রাখেন। এক্ষেত্রে কোনো কিছু করার ক্ষমতা বান্দার নেই। আল্লাহই একমাত্র রিযিকদাতা। তাই অন্যের কাছে ভালো কিছু দেখে লোভের হাত বাড়ালে নিজেকে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিতই হতে হয়। আর কোনো ভাবে যদি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় তাহলে অক্লান্ত কষ্ট সহ্য করে তবেই সম্ভব হয়। কাজেই পাওয়া না পাওয়ার দোলায় দুলতে থাকা একটা বস্তুর পেছনে ছুটে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা থেকে আমাদের কি সতর্ক থাকা উচিত নয়?

মানুষের নিন্দার কথা যদি বলো : তাহলে বলবো, কি হবে তাদের নিন্দার কথা ভেবে? আল্লাহ তাআলার আমার জন্য যা লিখে রেখেছেন তার চেয়ে কোনো কিছুর বেশি কম তো সে করতে পারবে না। মৃত্যুকে তো এগিয়ে আনতে পারবে না। পারবে না রিযিকের পথ রুদ্ধ করে রাখতে। জান্নাতিকে জাহান্নামি বানাতে পারবে না। আল্লাহর কাছে প্রশংসীত থাকলে কারও নিন্দা তাকে খারাপ বানাতে পারবে না।

আর আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় থাকলে তার ক্ষতিবৃদ্ধি কেউ করতে পারবে না। মুখে যতই ভালো খারাপ বলুক, মানুষ আসলেই অক্ষম। নিজেদের জন্য ভালো বা খারাপ কোনো ফয়সালা করার অধিকার তাদের নেই। তাদের না আছে নিজ ইচ্ছায় মরে যাওয়ার অধিকার না আছে বেঁচে থাকার অধিকার।

মানুষের মনে যখন বসে যাবে যে, লৌকিকতা করে অন্যের বস্তু হাসিল করতে চাইলে এই এই বিপদে পড়তে হয় তাহলে মন থেকে তার লোভের প্রকোপ কমে যাবে। মন আল্লাহর দিকে ঝুঁকে যাবে। কারণ বুদ্ধিমান

মাত্রই যাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হয় তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে যাতে নিজের লাভ সে দিকে ধাবিত হয়। আর রিয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই ভাবনাই যথেষ্ট যে, মানুষ যখন জানতে পারবে, বাইরে বাইরে সে যতই মুখলিস হওয়ার চেষ্টা করুক, ভেতরে ভেতরে সে রিয়াকার তখন সব মানুষ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। আল্লাহ তার মনের কথা সবার সামনে প্রকাশ করে দিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করবেন। রিয়াকার হিসেবে তার পরিচয় চারদিকে ছড়িয়ে দেবেন।

আর বাস্তবিকই যদি সে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ থেকে ইবাদত বন্দেগি করে আল্লাহ তার ইখলাসের কথা চারদিকে ছড়িয়ে দেবেন। মানুষের মনে তার ভালোবাসার বার্তা পৌঁছে দেবেন। তাদের মনকে বিগলিত করে দেবেন। তাদের মুখে মুখে মুখলিস ব্যক্তির প্রশংসা ছড়িয়ে দেবেন। যদিও মানুষের মুখের প্রশংসার বিশেষ কোনো দাম নেই। প্রশংসা পাওয়া বিশেষ কোনো সফলতা নয়। আবার প্রশংসা না পাওয়া বড় কোনো অসফলতা নয়।

যেমন বনি তামিমের জনৈক কবি বলেছিলেন আপনার মুখের প্রশংসা অন্যের জন্য শোভা। আর আমার মুখের নিন্দা অন্যের চরিত্রের উপর কলো একটা দাগ। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, তুমি মিথ্যা বলছো। এমন অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার রয়েছে। এই হাদিসের কথক হলেন আকওয়া ইবনে হাবিস (রা)। (মুসনাদে আহমদ : ৬/৩৯৩ তবে সেখানে كَذَبْتَ (মিথ্যা বলেছো) এই অংশ নেই। হাদিসটি পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন রুয়ানি তার মুসনাদ গ্রন্থে : ৩০৭)

কাজেই একমাত্র আল্লাহর প্রশংসাই মানুষকে শোভিত করে। আল্লাহর নিন্দাই তর্কে নিন্দিত করে। তোমার বিষয়ের অনন্ত জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর কি করবে তুমি মানুষের গালভরা প্রশংসা দিয়ে। আল্লাহর কাছে বিলাস মধুর জান্নাতের মালিক হয়ে কিনা তুমি অন্যের নিন্দায় মন খারাপ করতে যাবে?

কাজেই কারও যদি আখেরাতের চিরদিনের নিয়ামত ও আল্লাহর কাছে অসীম মর্যাদার বিষয়টি স্মরণে থাকে তাহলে মানবজীবনের সাথে সম্পর্কিত সবকিছু তার সামনে তুচ্ছ হয়ে যাবে। তার ভাবনা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে। মন আল্লাহর দিকে ঝুঁকে যাবে। মানব মনের বিচার ও রিয়া থেকে সে মুক্তি পাবে। তার হৃদয় থেকে ইখলাসের নূর বিচ্ছুরিত হয়ে তার

বক্ষকে বড় করে তুলবে। তার হৃদয় দুয়ার খুলে যাবে যার দ্বারা আল্লাহর সাথে তার মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। বান্দাদের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা আসবে।

দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে যাবে। আখেরাত তার দৃষ্টিতে বড় হয়ে যাবে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তার মন থেকে দূর হয়ে যাবে। রিয়ার দিকে প্রলুব্ধকারী বিষয়গুলো থেকে তার দূরত্ব বেড়ে যাবে। তখন ইখলাসই হয়ে উঠবে তার জীবনের একমাত্র চলার পথ।

এগুলো ও অধ্যায়ের প্রথম পর্বে বর্ণিত বিষয়াবলি হলো রিয়ারোধে জ্ঞান ভিত্তিক প্রতিষেধক।

রিয়া প্রতিরোধে কর্মভিত্তিক প্রতিষেধক

এর কয়েকটি পথ্য রয়েছে। যথা— ইবাদত করে তা গোপন রাখার অভ্যাস করা। মনে রিয়ার ভাব আসার সমস্ত দরজায় অর্গল তুলে দেওয়া। যেমন বন্ধ করে দেওয়া হয় মন্দ কর্মের দুয়ার। বিষয়টি যেনো এমন হয় যে, আমার ইবাদতের কথা শুধু আমার আল্লাহ জানবে। অন্যকে জানানো নিয়ে দড়ি টানাটানি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ আছে, একবার আবু হাফস তার সামনে হাদ্দাদের এক সাথি দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের নিন্দা করে কিছু বললো। তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যা গোপন রাখা দরকার ছিলো তা প্রকাশ করে দিলে। তুমি আজকের পর আর আমাদের এই মজলিসে এসো না।

দেখুন, সামান্য দুটি কথা প্রকাশ করার কারণে শায়খ তার মুরিদকে সামান্য ছাড় ও দেননি। কারণ মানুষ যখন দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের মন্দ চোখে দেখে ও মুখে তাদের নিন্দা করে, তখন এই কথা ও মনোভাবের পেছনে এই বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকে, যেনো সে নিজেকে যাহেদ বলতে চাচ্ছে।

কাজেই রিয়ার সর্বোত্তম প্রতিষেধক হলো গোপনীয়তা অবলম্বন করা। মুজাহাদার প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয়টি কষ্টসাধ্য মনে হতে পারে। কিন্তু কিছুকাল যদি এভাবে সে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারে। তাহলে বিষয়টি তার কাছে হালকা মনে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরবিচ্ছিন্ন সাহায্য লাভের মাধ্যমে আমলকে গোপন রাখা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আমল গোপন করার বিষয়ে প্রথমে নিজেকে উদ্যোগী হতে হবে। কারণ কোনো জাতি নিজেরা পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট না হলে আল্লাহ তাদের

মধ্যে রাতারাতি পরিবর্তন করে দেন না। তাই বান্দার কর্তব্য চেষ্টা করে যাওয়া। পথ আল্লাহই দেখাবেন। বান্দার দায়িত্ব দরজায় কড়া নাড়া। আল্লাহ দরজা খুলে দেবেন। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ সদাচারীর প্রতিদান দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। বরং কল্যাণ কর্মের চেয়ে তিনি সাওয়াব বাড়িয়ে দেন এবং তার পক্ষ থেকে দান করেন অশেষ সওয়াব।

দ্বিতীয় মাকাম : ইবাদতের মাঝখানে রিয়ার প্রতিবন্ধকতা দূর করা। ইবাদতের মাঝখানে মানব মনে রিয়ার যেসব বিষয় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তা দূর করার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করা জরুরি। কারণ, যে নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা করে, মনকে অল্প দিয়ে তুষ্ট রাখে, লোভলালসা ত্যাগ করে, মানুষের সামনে যে নিজেকে তুচ্ছ করে উপস্থাপন করে, সে লোকদের ভালোমন্দ কথাবার্তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মনকে সর্বপ্রকারের রিয়া থেকে দূরে রাখে।

তারপরও সে নিজেকে ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়ে রিয়ামুক্ত রাখতে পারে না। শয়তান তাকে রিয়ামুক্ত থাকতে দেয় না। বরং শয়তান তার মনে রিয়ার ভাবনা প্রবেশ করায়। রিয়ার দিকে ঝুঁকাতে চেষ্টা করে, ফলে প্রবৃত্তির বিনাশীভাব সর্বোতভাবে দূর হয় না। তাই মনের কোণে ভেসে ওঠা রিয়ার ভাবনা থেকে মনকে পরিষ্কার রাখতে হবে।

রিয়ার কল্পনা হয় তিনভাবে—

তিনটি পর্ব হলো নিজের ইবাদতের বিষয়ে মানুষকে জানানো কিংবা ইবাদতের বিষয়টি মানুষ জানুক সে আশা করা, তারপর সে মানুষের মুখ থেকে প্রশংসা শুনতে চায় এবং তাদের মাঝে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

তারপর সে চায়, লোকদের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ুক। সবাই ছুটে ছুটে তার কাছে আসুক।

এর প্রথম পর্বকে বলে মারিফাত। দ্বিতীয় পর্বকে বলে রাগবত ও শাহওয়াত। তৃতীয় পর্বকে বলে আযম ও তাসমিমে ক্বলব।

শক্তির পূর্ণতা তখনই উপলব্ধি করা যাবে, যখন রিয়ার প্রথম পর্ব মনে আসলেই মন থেকে তা মুছে ফেলবে। মনকে দ্বিতীয় পর্বের দিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ দিবে না। মনে যদি কখনো এই উপলব্ধি আসে যে, কেউ

তার আমল দেখছে। তখন এর প্রতিকার সে করবে এই বলে— কি হলো তোমার? লোকদের নিয়ে তুমি এতো ভাবছো কেনো? তারা তোমার আমল জানলে কি আর না জানলেই বা কি? আল্লাহ তো তোমার সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তাই অন্যদের জানিয়ে তুমি কি এমন উপকার পাবে বলো দেখি!!

কিন্তু মন যদি না মানে, সে যদি অন্যের প্রশংসা পেতে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে, তখন আগে থেকেই তোমার জানা রিয়ার আপদসমূহের কথা ভাবো। ভাবো, রিয়া করলে কেমন শাস্তি পেতে হয় আল্লাহর কাছে কিয়ামতের ময়দানে। ভাবো আখেরাত দিবসে রিয়ার কারণে আমলের অপর্যাপ্ততার কথা। এসব কথা ভাবলে ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করি। কারণ নিজের ইবাদত অন্য কেউ দেখার অনুভূতি মনকে যেমন রিয়ার দিকে ধাবিত করে, তেমনি রিয়ার ক্ষতি-চিন্তা মানুষের মুখে সেদিক থেকে ফিরিয়ে রাখার পক্ষে সহায়ক হয়।

মানুষ যখন আল্লাহর বিদ্বেষের বিষয়ে ভাবে এবং তার শাস্তি নিয়ে চিন্তা করে তখন শাহওয়াত রিয়া গ্রহণ করার প্রতি প্রলুব্ধ করে। আর অপছন্দভাবে তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দেয়। আর এ দুটির মধ্যে যে দিকটার শক্তি বেশি থাকে নফস তারই পক্ষ অবলম্বন করে।

কাজেই রিয়া থেকে বাঁচতে হলে তিনটি বিষয় আবশ্যক— ১. মারেফাত বা উপলব্ধি। ২. কারাহাত বা অপছন্দ। ৩. ইবা বা প্রত্যাখ্যান।

আর বান্দা ইবাদাত শুরু করে ইখলাসের নিয়তে। তারপর এসে যোগ হয় রিয়ার ভাবনা। অন্তরে ধারণাকারী উপলব্ধি বা অপছন্দ তখন মনে আসে না। এর পেছনের অন্যতম কারণ হলো, মানুষের কাছ থেকে মন্দ শোনার ভয়ে থাকা এবং অন্যের মুখ থেকে ভালো কথা শোনার প্রত্যাশী হওয়া। এর জন্য আকাঙ্খিত হওয়া। সেটা এভাবে যে, মন সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া। তখন পূর্বে আহরিত রিয়ার ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান মনে একা পড়ে থাকে। তার মন প্রশংসা প্রীতি ও নিন্দা ভীতিতে ভরে থাকে। তার অবস্থা হয় এমন- এক ব্যক্তি নিজেকে সহনশীল দাবী করে বেড়ায়। দাবী করে ক্রোধের যত কারণই আসুক সে সহনশীলতার পরিচয় দেবে। কিন্তু একদিন সে এমন কিছু বিষয় অবলোকন করলো যা তার মন উত্তপ্ত করে তুললো। তার পূর্বে প্রতিজ্ঞা ভুলে সে রেগে গেলো এবং তার মন রাগে এমনভাবে পূর্ণ হয়ে উঠলো যে, তার মন আর রাগের ক্ষতি সম্পর্কে ভাবার সুযোগই পেলো না।

এভাবেই প্রবৃত্তির বাহ্যিক মিষ্টভাব হৃদয়কে গ্রাস করে নেয় এবং উপলব্ধির জ্যোতিকে নির্বাপিত করে ফেলে। এদিকে ইঙ্গিত করে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) (হুদাইবিয়ার দিন) বৃক্ষের নিচে বসে আমাদের থেকে এই মর্মে শপথ নিয়েছেন, আমরা পলায়ন করবো না। তিনি আমাদের থেকে মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি নেননি। হুনাইনের দিন এ বিষয়টি আমাদের বিস্মৃত করে দেওয়া হয়েছিলো। একসময় আমাদের ডাকা হলো; হে বৃক্ষতলে হাতে হাত রেখে শপথ করা ব্যক্তিরা (ফিরে এসো তোমরা যুদ্ধের ময়দানে!) তখন সকলে ফিরে এলো। (আর রিআয়া : ১৭৬; মূলত এটি সহিহ মুসলিমে বর্ণিত দুটি হাদিসের সমষ্টিগত রূপ। হাদিস নম্বর : ১৮৫৬ ও ১৭৭৫)

এটা একারণে হয়েছিলো যে, হুনাইনের গিরি অঞ্চলে বিধর্মীদের আচমকা আক্রমণে সাহাবায়ে কেরাম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তারা পূর্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন সে কথা মনে করিয়ে দেওয়া হলো সাহাবারা সবাই যুদ্ধের ময়দানে ফিরে এলেন। যে প্রবৃত্তি হঠাৎ অপতিত হয় তা এভাবেই হয়ে থাকে।

অনেক সময় মানুষ মনের অবস্থার পর্যালোচনা করে বুঝতে পারে তার মনে উদয় হওয়া ভাবনা, আসলে প্রভুর ক্রোধ ডেকে আনা রিয়ার একটা সূরত। কিন্তু প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নার কারণে সে এটা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। ফলে বিবেকের উপর প্রবৃত্তি চড়াও হয়ে বসে। প্রবৃত্তির মজা সে আর ভুলতে পারে না। ফলে তার পক্ষে আর তাওবা করাও সম্ভব হয় না। কিংবা তওবা করবো করবো করেই কেটে যায় তার দিনরাত। কত আলেম রয়েছে যারা জেনে শুনে রিয়া করে লোকদের সামনে কথা বলতে দাঁড়িয়ে যায়। একাজ সে বারবার করতে থাকে। ফলে একাজের সপক্ষে মনে জোড়ালো যুক্তি চলে আসে। তখন রিয়ার নিকৃষ্টতা ও আল্লাহর কাছে পাপী হওয়ার বিষয়ে জেনে শুনেও সে রিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ফলে উপলব্ধি যখন অপছন্দকে সঙ্গে নিয়ে চলে তখন একা উপলব্ধি মানুষের জন্য বিশেষ কোনো ফায়দা নিয়ে আসতে পারে না।

কখনো কখনো মানব মনে উপলব্ধি ও অপছন্দবোধ দুটোই থাকে। তারপরও মন রিয়াকে মেনে নেয় এবং তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে।

এটা তখনই হয় যখন প্রবৃত্তির শক্তিমত্তার তুলনায় অপছন্দবোধ দুর্বল হয়ে থাকে। রিয়ার বিরুদ্ধে এটাও কোনো ফলদায়ক বিষয় হলো না। যখন অপছন্দ দ্বারা উদ্দেশ্যই হলো কর্ম থেকে বিরত থাকা।

কাজেই বোঝা গেলো যতক্ষণ না মারিফাত ও উপলব্ধি, কারাহাত ও অপছন্দ এবং হক ও প্রত্যাখ্যান এই তিনটি বিষয় একসাথে পাওয়া না যাবে ততক্ষণ রিয়ার বিরুদ্ধে এটা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে না। কারণ প্রত্যাখ্যান হলো অপছন্দের ফল আর অপছন্দ হলো উপলব্ধির নির্যাস।

আর মানুষের উপলব্ধি কতটা দৃঢ় তা নির্ভর করে তার ঈমানি শক্তি ও ইলমি নূরের কম বেশি হওয়ার উপরে। আর উদাসিনতার কারণে মানুষের উপলব্ধি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। সাথে সাথে দুনিয়াপ্রীতি ও আখেরাত ত্যাগ, আল্লাহর সন্ডার নিয়ে ভাবনা চিন্তা কম করা, দুনিয়ার আপদ বিপদ ও আখেরাতের সমৃদ্ধির বিষয়ে কম ভাবা। এসব কিছুও মানুষের উপলব্ধিকে কমজোর করে দেয়। আর কিছু কিছু বিষয় থেকে আবার অন্য অনেক শাখা প্রশাখা বের হয়। আর উপলব্ধি দুর্বল হয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো দুনিয়াপ্রীতি ও প্রবৃত্তির প্রাবল্য। এটা হলো সব গুনাহের গোড়া। সব অপরাধের উৎস। কারণ খ্যাতি প্রীতি ও দুনিয়ার ভোগ বিলাস মানব হৃদয়কে অজ্ঞ করে করে ফেলে ও তা দখল করে রাখে এবং ব্যক্তি ও অপরাধবোধের মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। তখন তার চোখে কুরআন সুন্নাহর নূর তুচ্ছ হয়ে যায়।

ধরুন, হঠাৎ করে কারও মনে হলো রিয়া খুবই খারাপ একটি বিষয়। এটা মানুষের জীবনকে হতাশায় নিমজ্জিত করে ফেলে। সে রিয়াকে অপছন্দ করতে শুরু করলো। কিন্তু তার মনে অনেক দিন ধরে বাসা বেধে থাকা প্রবৃত্তির কোনো নড়চড় হয়নি। মনের গভীরে ভালোবাসার স্থান দখল করে সেটা রয়েই গেছে। তবে পার্থক্য এতটুকুই যে, এখন সেই ভালোবাসার উপর ঘৃণার একটা প্রলেপ পড়েছে মাত্র।

এমন পরিস্থিতির শিকার লোকের ক্ষেত্রে কি বলা হবে?

এই ক্ষেত্রে আমি বলবো আল্লাহ মানুষকে সাধ্যাতীত কোনো কাজ করতে বাধ্য করেননি। আর মানুষের সাধ্য নেই যে, সে শয়তানকে প্রবঞ্চনা দেওয়া থেকে বিরত রাখবে। এবং স্বভাবকে প্রবৃত্তির প্রতি আকর্ষিত হওয়া

থেকে দূরে রাখবে। মানুষের সর্বোচ্চ সাধ্য হলো দীনি ইলম ও অপরাধের শাস্তির বিধান জেনে, আল্লাহ তাআলা ও আখেরাত দিবস সম্পর্কে অবগত হয়ে পাপ কাজকে ঘৃণা করা। এটাই হলো আল্লাহর বিধান পালনের সর্বোচ্চ সীমা।

এ বিষয়টি আমরা জানতে পারি সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত হাদিস থেকে। একবার সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে শেকায়েত বা অভিযোগ করে বললেন, আমাদের মনে মাঝে মাঝে এমন ভাবনা আসে যেগুলো মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আমরা আসমান থেকে পড়ি আর কোনো পাখি এসে আমাদের খুবলে খাবে কিংবা বাতাস আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়েও ভয়ের বিষয় মনে হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এমন ভাবনা কি তোমাদের মনে এসেছে?

তারা বললেন, হ্যাঁ এসেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এটাই সুস্পষ্ট ঈমান। (সহিহ মুসলিম : ১৩২; সহিহ ইবনে হিব্বান : ১৪৯। এই হাদিসকে হাদিসে ওয়াসওয়াসা বলে)

মূলত সাহাবিদের মনে ওয়াসওয়াসার প্রতি অপছন্দবোধ দেখা দিয়েছিলো।

একথা বলা কখনোই সম্ভব নয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) 'সরিহুল ঈমান' শব্দ দিয়ে ওয়াসওয়াসা বুঝিয়েছেন। বরং ভাবনার পরে পরে অন্তরে স্থিত অপছন্দটাই হলো "সরিহুল ঈমান" ফলে তাদের মনে শুধু ওয়াসওয়াসার পরে আসা অপছন্দটাই থেকে গেলো।

রিয়া নিঃসন্দেহে বড় গুনাহ। কিন্তু যদি আমরা আল্লাহর হকের দৃষ্টিতে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো রিয়ার চেয়ে ওয়াসওয়াসার মধ্যে মন্দত্ব অনেক বেশি। মনের মধ্যে অপছন্দবোধ আসার কারণে যখন এমন মন্দত্ব থেকে মুক্তি মিললো, তখন ধরে নেয়া যায় যে, আল্লাহর হকের বিচারে তার চেয়ে কম খারাপ গুনাহ রিয়া থেকে মুক্তি মিলবে।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত যিনি ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে আসা শয়তানের কূটচালকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। (সুনানে আবু দাউদ : ৫১১২; নাসায়ী, সুনানে কুবরা : ১০৪৩৪। পূর্বে বর্ণিত হাদিসের সাহাবিদের অভিযোগের প্রতি উত্তরের একাংশ এটা)

আবু হাযেম (র) বলেন, তোমার মনে যে মন্দ ভাবনা আসে। তা অপছন্দ করলে তুমি শত্রু (নফস) থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

আর তোমার মন্দ ভাবনাগুলো যদি তুমি মেনে নাও; তাহলে নিজেকেই তুমি কলুষিত করলে। (আর রিআয়া : ১৮৮; বলা হয় যায়েদ ইবনে আসলামও একই কথা বলেছেন, যা বর্ণনা করেন কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ৮৩১; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ২২১)

তুমি যখন অপছন্দ ও প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে ওয়াসওয়াসাকে প্রতিহত করবে, ওয়াসওয়াসা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর মনে যে মন্দ ভাবনা আসে সেগুলো হলো শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষিপ্ত রিয়ার দিকে উদ্বুদ্ধকারী কিছু ভাবনা ও কল্পনা মাত্র। এরপর এসবের প্রতি ঝোঁক হলো নফসের প্রবঞ্চনা। আর এসবকে অপছন্দ হলো ঈমানের অংশ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

কিন্তু শয়তান এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। সে যখন দেখে মানুষ তার বিছানো জালে ধরা পড়ছে না, সে তখন নতুন করে চক্রান্তের জাল বোনে। মানুষের মনে সে এই ভাবনা প্রবিষ্ট করে দেয় যে, শয়তানের সাথে দীর্ঘ বহস মুবাহাসা করে সে অন্তরের মন্দ ভাবনাকে অপছন্দ করতে পেরেছে। ব্যক্তির এমন ভাবনাও কম ক্ষতিকর কিছু নয়। কারণ এতে সে অন্তরের একাগ্রতা ও ইখলাসের সওয়াব হারাবে। কারণ শয়তানের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি হলো সবার অলক্ষে আল্লাহর কাছে রোনাজারি করার পরিপন্থি, আর এর কারণে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদার পতন ঘটে।

মুখলিস ব্যক্তির রিয়ার শ্রেণি চারটি

রিয়ামুক্ত ব্যক্তির রিয়া থেকে মুক্তিলাভের চারটি শ্রেণি রয়েছে।

প্রথম শ্রেণি : শয়তানকে সে প্রতিহত করে এবং তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। শুধু তাই নয় বরং সে শয়তানের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। শয়তানের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে বিবাদ করতেই থাকে। সে মনে করে এটাই তার অন্তরের পক্ষে বেশি নিরাপদ। বস্তুত এটা ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়।

কারণ শয়তানের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে গিয়ে সে আল্লাহর কাছে দুআ মোনাজাত করতে পারে না। অনেক কল্যাণকর্ম তাকে ত্যাগ করতে হয়। যা তার জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য।

আজব! সে করছে কি? পথে পাধা হয়ে দাঁড়ানো বস্তুর পেছনে ছুটে ছুটে সময় নষ্ট করছে। সুলুকের ক্ষেত্রে যা স্পষ্ট ত্রুটি ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণি : সে বুঝতে পারে শয়তানের সাথে বিবাদে জড়ানোতে ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার নেই। তাই সে পথের বাধা দূর করেই সন্তুষ্ট থাকে। অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্তের কারণে মনে উদয় হওয়া ভাবনাকে সে মিথ্যা ভাবে এবং সেগুলো প্রতিহত করতে সচেষ্ট থাকে। পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো বস্তুর পেছনে ছুটে সে বৃথা সময় নষ্ট করে না।

তৃতীয় শ্রেণি : কিছু ব্যক্তি আছে যারা শয়তানের চক্রান্তকে মিথ্যা ভাবার জন্য সময় বের করতে চায় না। এটা সুলুকের একটা বিশ্রাম কেন্দ্র। যদিও খুব কম মানুষ সে স্তরে পৌঁছতে পারে। এসব ব্যক্তিরা এমন হয় যে, রিয়ার প্রতি বিরাগ ও শয়তানকে অবিশ্বাস করার বিষয়টি তাদের অন্তকরণে স্থায়ীভাবে নিবন্ধ থাকে। ফলে স্বয়ংক্রীয়ভাবে তার মনে অপছন্দবোধ চলে আসে। তাকে আর আলাদা সময় বের করে শয়তানের চক্রান্তকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে হয় না।

চতুর্থ শ্রেণি : ব্যক্তি জানে যখন রিয়ার কারণগুলোর প্রকোপ পরিলক্ষিত হবে তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, যখনই শয়তান তার সাথে বিবাদ করতে আসবে সে এমন সব কাজ করবে যাতে শয়তানের বিরোধীতা করা হয়। তখন সে সব কাজ ইখলাসের সাথে করবে। আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকবে। দান সদকা, ইবাদত বন্দেগি সে গোপনে পালন করবে। সব কাজে সে শয়তানের বিরোধীতা করার চেষ্টা করবে। সে এমন ব্যক্তি যে শয়তানের ক্রোধ বৃদ্ধি করে দেয় এবং শয়তানকে এমনভাবে হতাশার সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে যে, সে আর কোনোদিন কিনারা খুঁজে পায় না।

একবার ফুযাইল ইবনে আবওয়ানকে বলা হলো- অমুক আপনার প্রশংসা করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, এই কাজের আদেশদাতাকে আমি ক্রোধান্বিত করতে চাই। বলা হলো কে এই আদেশদাতা? তিনি বললেন, শয়তান। তারপর বললেন, হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করে দিন। (আর রিআয়া : ১৯৬; অনুরূপ অর্থে ইবনুল মুরাবাক : কিতাবু যুহদ : ৬৭০)

শয়তান অনেক সময় মানুষের ভেতরগত অবস্থা দেখে বুঝে ফেলে, এ লোককে কোনোভাবেই ফাঁদে ফেলা যাবে না তখন সে আর তাকে ঘাটায় না। কারণ এতে বান্দার সম্মানই শুধু বেড়ে যায়।

ইবরাহিম তাইমি (র) বলেন, শয়তান মানুষকে দ্বার খুলে গুনাহের সাম্রাজ্যের ভেতর ঢুকে পড়ার আহ্বান জানায়। কাজেই তার কথা মানা যাবে না। এসব ক্ষেত্রে কল্যাণকে স্মরণ করতে হবে। কারণ শয়তান তোমাকে এমন কাজ করতে দেখলে দূরে সরে যাবে। (আর রিআয়া : ১৯৫)

তিনি অন্যত্র বলেন, শয়তান যখন তোমাকে কোনো কাজ অনীয়মিতভাবে করতে দেখে, তখন তোমাকে মন্দের পথে নিয়ে যেতে সে আশাবাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ভালোকাজ করে গেলে তোমার বিষয়ে সে নিরাশ হয়ে পড়বে। (আর রিআয়া : ১৯৫)

হারেস মুহাসেবি সুন্দর একটা উদাহরণের মাধ্যমে রিয়া প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এই চার ব্যক্তির কৌশলকে চিত্রায়িত করেছেন, তিনি বলেন চার ব্যক্তি নিয়ত করলো তারা ইলম অন্বেষণ করবে। হাদিস শিক্ষা করবে। সে লক্ষ্যে তারা এক মুহাদ্দিসের কাছে যাবে বলে ঠিক করলো। কিন্তু তাদের সাথে পঞ্চম আরেকজন লোক ছিলো। তার মন ছিলো হিংসার কালো মেঘে ছাওয়া। সে ঠিক করলো, কিছুতেই চারজনকে গন্তব্যে পৌঁছতে দেবে না।

প্রথম ব্যক্তি ইলম শেখার নিমিত্তে পথে বের হলো। মুখোমুখি হলো হিংসুকের। হিংসুক তাকে ইলমের মজলিস ছেড়ে দিতে আহ্বান জানালো। কিন্তু ইলম অন্বেষণকারী ব্যক্তি তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। কিন্তু হিংসুটে ব্যক্তি তার পিছু ছাড়লো না। তার সাথে বিবাদে জড়াতে চাইলো। ইলম অন্বেষী ব্যক্তি আগ পিছ না ভেবে তার বিতর্কে সাড়া দিলো এবং হিংসুটের সাথে তর্ক করে কালক্ষেপণ করতে লাগলো।

ইলমের অন্বেষায় বের হওয়া ব্যক্তি এই তর্কবিতর্ক করাকে নিজের জন্য উপকারী বিষয় বলে ভাবলো। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে গন্তব্যই বিস্মৃত হতে চলেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হিংসুকের সামনে এলো। হিংসুটে ব্যক্তির বাধা পেয়ে সে থেমে গেলো। হিংসুটে ব্যক্তি তাকে মন্দের দিকে ঠেলে দিতে চাইলো কিন্তু সে তার কথা শুনলো না, তার সাথে তর্কেও জড়ালো না।

সে তাড়াতাড়ি নিজ গন্তব্যের দিকে চলে গেলো।

এক্ষেত্রেও হিংসুটে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সফল বলা যায়। কারণ পথরোধ করে দাঁড়িয়ে লোকটার কিছু সময় তো সে নষ্ট করতে পেরেছে।

তৃতীয় ব্যক্তি আসে। হিংসুটে ব্যক্তি নিজের কথা বলে যায়। কোনো কথার উত্তর সে পায় না। সে চলতেই থাকে। এক্ষেত্রে এসে হিংসুটে ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা মুখ থুবড়ে পড়ে।

তারপর আসে চতুর্থ ব্যক্তি। হিংসুটে ব্যক্তির কোনো কথাই সে কানে তোলে না। হিংসুক ব্যক্তি তাকে পথ ভোলানোর চেষ্টা করলে সে পথ চলার গতি আরও দ্রুত করে দেয়।

এই হলো রিয়া প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চার পদ্ধতির বাস্তব চিত্রায়ন।

কিন্তু পরবর্তীতে যদি এই চারজন ব্যক্তি এই পথ দিয়ে যায়। হিংসুটে ব্যক্তি সবাইকে আটকাবে। কিন্তু চতুর্থ নম্বর ব্যক্তিকে আটকাবে না। কারণ এতে হীতে বিপরীত হয়ে যায়। কল্যাণলাভের পথে সে বাধার সম্মুখীন হলে সে আরও দ্রুতগতিতে কল্যাণের দিকে ছুটে যায়। (আর রিআয়া : ১৯৫)

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, শয়তানের প্রবঞ্চণা থেকে কোনো মানুষই মুক্ত নয়। তাহলে আমাদের কী করণীয়? আমরা কি কোমর বেঁধে শয়তানের চক্রান্ত আসার অপেক্ষায় থাকবো, যাতে সহজে তা প্রতিহত করতে পারি? নাকি আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকবো। আর তিনি আমাদের রক্ষা করবেন। নাকি আমরা শয়তানকে শয়তানের জায়গায় ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মতো করে ইবাদত করে যাবো? কি করবো আমরা? এই বিষয়ে আলেমরা তিনটি মত পেশ করেন—

বসরার একদল আলেম বলেন, যার মনোজগৎ শক্তিশালী ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে, তাদের জন্য শয়তানের চক্রান্তরোধে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকার কোনো মানে হয় না। কারণ তারা দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক গুটিয়ে নিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তারা সবসময় আল্লাহ্ প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে থাকেন।

তখন শয়তান তাদের পিছু নেওয়া ছেড়ে দেয়। তাদের থেকে নিরাশ হয়ে দূরে সরে যায়। ফলে তারা নিজেদের জন্য পার্থিব জীবনের বৈধ স্বাদকেও হারাম করে নেয়। এভাবে তারা যখন সার্বিকভাবে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তখন শয়তান তাদের পিছু ছেড়ে দেয়।

এমন যাদের অবস্থা শয়তানের চক্রান্তে পড়ে যাওয়ার বিষয়ে তাদের কখনো ভাবতে হয় না। শামী আলেমদের একটি দল বলেন, যাদের ঈমান

দুর্বল, অন্তরে বিশ্বাসের স্বল্পতা রয়েছে তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুতি নিয়ে শয়তানের চক্রান্তের অপেক্ষা করা ভালো।

কাজেই যার মনে এই বিশ্বাস থাকবে যে, কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তাকে অন্য কারও ক্ষতি থেকে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে না। কারণ তার জানা আছে, শয়তান হলো আল্লাহ তাআলার তুচ্ছ এক সৃষ্টি। নিজ আদেশ বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা তার নেই। আল্লাহর আদেশেই সে পরিচালিত হয়। তাই সে মানুষের ক্ষতি যেমন করে, কখনো কখনো তার থেকে উপকারও পাওয়া যায়।

আর যারা আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত অন্য কাউকে নিয়ে সে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকবে- এই ভাবনাও তাকে লজ্জিত করে। কাজেই আল্লাহর একত্ববাদে যারা বিশ্বাস রাখে তাদের অন্য কারও ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক থাকার কোনো প্রয়োজন হয় না।

আলেমদের আরেকটি দল বলেন, শয়তানের চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকা সব মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

এখন আসা যাক মন্তব্য বিশ্লেষণে মনের দিক থেকে যারা শক্তিমান, যারা দুনিয়ার সব মোহমায়া ত্যাগ করেছে শয়তানের চক্রান্ত থেকে তাদের সতর্ক থাকার দরকার নেই। এটা ছিলো বসরার আলেমদের অভিমত। আমার কাছে একে নিছক ধোঁকা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কারণ যেখানে নবীরাই শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না সেখানে অন্যরা কি করে এর থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে?

শয়তান যে মানুষকে সবসময় প্রবৃত্তি ও দুনিয়া প্রীতি দিয়ে ওয়াসওয়াসা দেয় তা কিন্তু নয়। কখনো কখনো আল্লাহর নাম ও সিফাত নিয়ে ও মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। বিদআতের মত মন্দ কাজকে তারা চোখের সামেন মোহীত করে উপস্থাপন করে। কোনোমানুষই এ ধরনের প্রবঞ্চণার ধোঁকা থেকে মুক্ত নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

(হে নবী!) আমি আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাঁরা যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে, কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হজ : ৫২)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِيْ সে আমার হৃদয়ে প্ররোচনা দেয়। (সহিহ মুসলিম : ২৭০২)

অথচ শয়তান রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলো এবং তাঁকে ভালো ছাড়া মন্দ কোনো কিছুর নির্দেশনা দিতো না।

তাই যার মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) ও অন্যান্য নবীদের চেয়ে তার মনে আল্লাহ প্রেমের নিমগ্নতা বেশি, তাহলে বুঝতে হবে সে ধোঁকায় পড়ে আছে। আর মোটেও সে শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ নয়।

এ কারণেই জান্নাতের মতো নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাপূর্ণ স্থানে অবস্থানরত অবস্থায় শয়তান আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে ধোঁকা দিয়েছিলো। এই ঘটনার বিবরণ কুরআনে আল্লাহ এভাবে দান করেন—

اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى. اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى . وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى.

নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে তুমি দুর্ভোগের শিকার হবে। তোমার জন্য এই সুবিধা থাকল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না এবং এখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ-ক্লিষ্টও হবে না। (সূরা ত্বহা : ১১৭-১১৯)

তারপরও তারা একটি মাত্র বৃক্ষের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেননি। কারণ, নেপথ্যে থেকে শয়তান নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছিলো খুবই নিপুণভাবে। যার শিকার হয়েছিলেন একজন নবী। মহাবিশ্বের অন্যতম পবিত্র স্থান থেকে নবীর মতো একজন নিষ্পাপ মানুষ থাকতে পারেননি; তাহলে কি করে মেনে নেওয়া যায় যে, দুনিয়ার মতো পঙ্কিলতার পিচ্ছিল জগতে থেকে মানুষ শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার আশা করে।

মুসা (আ) এর মন্তব্য এমন— যা আমরা কুরআনের বিবরণিতে জানতে পারি,

هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ.

এটা শয়তানের কাজ। (সূরা কাসাস : ২৭)

এ কারণে আল্লাহ তাআলা মনবজাতিকে সতর্ক করে বলেন,

يٰبَنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا أَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ.

হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে— যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হতে বের করেছে। (সূরা আরাফ : ২৭)

একই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ.

সে নিজে এবং তার দল তোমাদের এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদের দেখতে পাও না। (সূরা আরাফ : ২৭)

কাজেই দেখা গেলো যে, শুরু থেকে শেষ পুরো কুরআনেই আল্লাহ তাআলা মানুষকে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তাহেল কীভাবে মানুষ নিজেকে শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্ত ভাবতে পারে?

আল্লাহর আদেশ অনুসারে শয়তানের মোকাবেলায় সতর্কতা অবলম্বন করা কখনোই 'ইশকে ইলাহি পরিপন্থি নয়; বরং এক্ষেত্রে তার আদেশ মেনে আল্লাহর আনুগত্যই প্রকাশ করা হলো। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কাফেরদের আক্রমণ থেকে সতর্ক অবস্থানে থাকতে বলেছেন। তেমনি অন্যসব শত্রু থেকেও বেখবর থাকতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ.

এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। (সূরা নিসা : ১০২)

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ.

তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো। (সূরা আনফাল : ৬০)

আল্লাহ এখানে দৃশ্যমান কাফের শত্রুদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং যে শত্রুকে চোখে দেখা যায় না তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য চেষ্টা করা কি বেশি জরুরি নয়?

এজন্যই ইবনু মুহাইবিজ (র) বলেন, যে প্রাণিকে শিকারি দেখে কিন্তু প্রাণী শিকারিকে দেখে না তাকে শিকার করা সাজে। কিন্তু শিকার যদি শিকারির থেকে অদৃশ্য থাকে, তাহলে শিকারির প্রাণ সংশয়ে পড়ে যায়। (আর রিআয়া : ২০০)

এই বাক্যের শেষাংশ দ্বারা ইবনে মুহাইবিয (র) শয়তানকে বুঝিয়েছেন। কেনই বা এমন হবেন না অথচ কাফের শত্রুর থেকে অসতর্ক থাকলে মৃত্যু মুখে পতিত হতে হয়। আর শয়তান শত্রুর থেকে উদাসীন হলে ভয়াবহ শাস্তির স্থান জাহান্নামে যেতে হয়।

দ্বিতীয় ফেরকার মত ছিলো, যারা পূর্ণ বিশ্বাস অন্তরে ধারণ কর তাদের প্রয়োজন নেই শয়তান থেকে সতর্ক থাকা। কিন্তু দুর্বল মুমিনদের সতর্ক থাকতে হবে।

তাদের মতও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। কারণ আল্লাহ যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন তা ভুলে থাকা কোনোদিনই আল্লাহ প্রেমের দাবী নয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঈমানে আল্লাহর প্রতি ভরসার স্থানে সামান্য পরিমাণ বিচ্যুতি সৃষ্টি করেননি। তাহলে আল্লাহ যেসব বিষয়ে মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন সেগুলোকে ভয় করা কখনোই ভরসার স্খলন হিসেবে ধরা হবে না। এ বিষয়ে আমি তাওয়াক্কুল অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করেছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ.

তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো। (সূরা আনফাল : ৬০)

এই আয়াতে আল্লাহ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি কোনো কিছু বলেননি। আর এটা তাওয়াক্কুলের খেলাপও নয়। তবে শর্ত হলো। অন্তরে এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, মূলগতভাবে লাভ-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যান, জীবন-মৃত্যু সবকিছুর অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এমনিভাবে সে শয়তান থেকে সতর্ক থাকবে এবং মনে মনে এই বিশ্বাসও রাখবে যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ দানের মূল অধিকার হলো একমাত্র আল্লাহর। আর আসবাবকে সে মনে করবে বাধ্যগত মাধ্যমে। এটা হলো হারিস আল মুহাসাবির মতে।

ইলমের নূরের আলোকে বিচার করলে এই মতকেই সঠিক বলে বিবেচিত হয়। আর পূর্বের মতগুলো শুনলে মনে হয়, তা হলো স্বল্প জ্ঞানী কর্তৃক আবেদের অভাবনায় বলা কথা মালা। তারা মনে করে, তারা বর্তমানে আল্লাহর ইবাদতে যেমন হস্তপদসহ ডুবে আছে। সারা জীবন তারা এভাবেই থাকতে পারবে। যা তাদের অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপর সতর্ক থাকার পন্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এই দলটি তিনটি মত পেশ করেছেন।

১. তাদের মধ্যে একটি দল বলেন, যখন আল্লাহ আমাদের শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকার আদেশ করেছেন, তখন আমাদের উচিত হবে হৃদয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করে যাওয়া। সতর্কতা অবলম্বন করা এবং শয়তানের প্ররোচনা মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকা। কারণ হতে পারে মুহূর্তের অসতর্কতা আমাদের জীবনের বিনাশ ডেকে আনবে।

২. আরেকদল লোক বলেন, শয়তানের উদ্দেশ্য হলো আমরা তাকে নিয়ে পড়ে থাকি। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র তৈরি করতে গিয়ে আল্লাহর স্মরণকেই ভুলে যাই বরং আমরা সবদিক বিবেচনা করেই চলবো। আমরা আল্লাহর ইবাদত করবো। তার জিকির করবো। শয়তানের শত্রুতা বিস্মৃত থাকবো। তাহলে এমন দুটি বিষয়ের উপর আমল করা হবে যার একটা সম্পর্কে বেখবর থাকলে আমরা অন্ধকারের আতলে পতিত হবো। কাজেই দুটোকে সমন্বয় করে আমল করার মধ্যে রয়েছে চূড়ান্ত স্বার্থকতা।

কিন্তু মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন— উপরে বিবৃত দুটি মতই ভুল।

প্রথম দলের ভুল : তারা এমনভাবে শয়তানের মোকাবেলায় আত্মনিয়োগ করেছে যে, তারা আল্লাহর যিকিরকেই ভুলে গেছে। এটা তাদের সুস্পষ্ট ভুল।

আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে শয়তানের চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকতে; যাতে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর ইবাদত করে যেতে পারি, তাকে যথাযথভাবে স্মরণ করতে পারি। তাহলে আমরা কি করে শয়তানের দিকে লক্ষ রাখাকেই অন্তরের সবচেয়ে বড় ব্যস্ততা সাব্যস্ত করতে পারি? অথচ শয়তান আমাদের দিয়ে এই লক্ষ্যই পূরণ করতে চায়। এই মতের উপর দীর্ঘদিন আমল করলে হৃদয় আল্লাহর নূর থেকে খালি হয়ে যায়। আর শয়তান খুব সহজেই আল্লাহর নূর শূন্য অন্তরসমূহকে গ্রাস করে নিতে পারে। তখন মানুষের সামর্থ্য থাকে না তাকে বাধা দেওয়ার।

দ্বিতীয় দলের ভুল : তারাও প্রথম দলের মতো ভুল করে বসেছে। তারা হৃদয়ে আল্লাহর জিকির ও শয়তানের স্মরণকে একসাথে স্থান দিয়েছে। তার হৃদয়ে শয়তানের স্মরণ যতটা স্থান দখল করে নিয়েছে, আল্লাহর জিকিরের পরিমাণ তার অন্তর থেকে এতটাই কমে গেছে। অথচ আল্লাহর নির্দেশ হলো অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে হৃদয়কে শুধু আল্লাহর জিকিরের অধিষ্ঠান করে রাখতে হবে।

এ বিষয়ে বাস্তবসম্মত ও সত্য বিষয় হলো, বান্দার কর্তব্য হলো অন্তরকে সর্বদা শয়তানের শত্রুতার বিষয়ে সতর্ক রাখা এবং মননে তার সাথে শত্রুতার বিষয়টি বদ্ধমূল করে নেওয়া। যখন এই বিশ্বাস অর্জিত হয়ে যাবে, তখন সর্বান্তকরণে আল্লাহর জিকিরে মনোনিবেশ করতে হবে এবং তার জন্য নিজের সবটুকু শক্তি ব্যয় করতে হবে। তখন আর মনে শয়তানের ভাবনা উদয় হবে না। কারণ ব্যক্তি যখন শয়তানের প্রতি শত্রুতা নিয়ে আল্লাহর জিকিরে মশগুল হবে তখন শয়তান তাকে প্ররোচিত করতে চাইলে অবচেতন মনেই তাকে শয়তানের বিষয়ে সতর্ক করে দেবে এবং তাকে প্রতিহত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আর আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকার মানে এই নয় যে, কোনো মন্দ বিষয়কে সে সময় প্রতিহত করা যাবে না। বরং শয়তানের আক্রমণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জিকরুল্লাহর পরিপন্থি নয়।

বাস্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টি হয়তো সবার সামনে স্পষ্ট হবে।

কোনো ব্যক্তি ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভয় নিয়ে ঘুমালো যে, আজ ফযরের ওয়াক্তে হয়তো সে নামাযের জন্য জাগতে পারবে না। তখন সে সতর্ক থাকে, যাতে কোনোভাবেই ফযরের নামায সে না হারায়। এই সতর্কতা বোধ তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। ফলে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই বারবার তার ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু ঘুমের মধ্যে সে পুরোপুরি গাফেল ছিলো। তাহলে আল্লাহর জিকির কি করে শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে?

এমন হৃদয়ের অধিকারী সেই হতে পারে, যে নিজ বুকে প্রবৃত্তির কবর রচনা করেছে। জ্ঞান ও বিবেকের আলোয় যে আলোকিত হয়েছে এবং শাহওয়াতের চাহিদাকে দমন করতে পেরেছে।

সুতরাং জ্ঞানী তারাই যারা শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে। তবে শয়তানকে নিয়ে সারাক্ষণ পড়ে থাকে না। বরং তারা আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে। আর আল্লাহর জিকিরই তাদের জন্য শয়তানের বিপক্ষে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহর জিকির তাদের অন্তরকে এমন আলোকিত করে যে, শয়তানের পদক্ষেপ সম্পর্কে তারা আগে থেকেই ধারণা লাভ করতে পারে।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বোঝাই : ধরুন অন্তর হলো একটা কূপ। যাতে অনেক ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে। তাই কূপের সব পানি তুলে ফেললে তবেই তাতে স্বচ্ছ পানি পাওয়া যাবে। এখন আসুন, তিনটি দলের তিনটি মতকে এই কূপের সাথে প্রতিতুলনা করে দেখি, কে কতটা স্বচ্ছ পানি কূপের ভেতরে জমা করতে পারে।

প্রথম মত : যারা শয়তানকে প্রতিহত করার কাজে সর্বোতভাবে ব্যস্ত থাকতে চায় তারা যেন কূপের সব পানি না তুলেই তা থেকে স্বচ্ছ পানির উৎসরণের আশা করছে।

দ্বিতীয় মত : যারা আল্লাহর জিকির ও শয়তানের স্মরণকে একই সাথে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। তারা যেনো কূপ থেকে বালতি ভরে ময়লা পানি তুলে তা আবার কূপেই ঢালছে এবং বেহুদা পরিশ্রমে তারা শ্রান্ত হচ্ছে। কোনো দিনই তারা কূপের ময়লা শেষ করতে পারবে না।

তৃতীয় মত : যারা বলে, মনে শয়তানের শত্রুতা সম্পর্কে সতর্কতা রেখে শুধু মাত্র আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতে হবে। এরা আগে কূপের চারপাশে বাধ দেয়। তারপর পানি সব তুলে ফেলে। তখন কূপ ভরে ওঠে স্বচ্ছ পানিতে।

তাই তারা মন্দ পানির স্রোতকে কোনো কষ্ট ক্লেশ ছাড়াই বাধের মাধ্যমে প্রতিহত করে।

যেসব স্থানে ইবাদত জাহির করা জায়েয ঃ ইবাদত গোপন করার মধ্যে যেমন ইখলাস রক্ষা করা এবং লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতা রয়েছে, এমনিভাবে প্রকাশ করার মধ্যেও উপকারিতা রয়েছে। তা হলো মানুষের অনুসরণ করা এবং তাদের মধ্যে সৎকাজের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু তাতে লৌকিকতারও বিপদ আছে। হাসান (র) বলেন, মুসলমানগণ

জানে যে, ইবাদত লুক্কায়িত রাখার মধ্যে অনেক সতর্কতা। (আর রিআয়া : ২৬৪; অনুরূপ অর্থে আহমাদ : আয যুহদ : ২১২)

কিন্তু প্রকাশ করার মধ্যেও অনেক উপকারিতা রয়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা গোপন ইবাদত ও প্রকাশ্য ইবাদত উভয়ের প্রশংসা করে বলেন,

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.

যদি প্রকাশ্যভাবে তোমরা দান-খয়রাত করো, তবে তা খুব ভালো কথা। আর যদি গোপনে ফকীরদের দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম। (সূরা বাকারা : ২৭১)

দুইভাবে ইবাদত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এক, মূল ইবাদতকে প্রকাশ করা এবং দুই, ইবাদত করার পর তা মানুষের কাছে প্রকাশ করা। প্রথম প্রকারের উদাহরণ যেমন মানুষের সামনে দান করা, যাতে মানুষও দান করতে উৎসাহিত হয়। বর্ণিত আছে যে, তখন জনৈক আনসারী সবার আগে একটি টাকার প্যাকেট দান করেন। এরপর অন্যরা তার দেখাদেখি দান করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ اَتْبَعَهُ.

যে লোক সৎকাজের প্রচলন করে, এরপর মানুষ তা করে, সে সেই কাজের সওয়াব পাবে এবং যারা এর অনুসরণ করে তাদের সওয়াব পাবে। (সহিহ মুসলিম : ১০১৭)

নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের অবস্থাও একই রকম। কিন্তু দান-খয়রাতে মানুষ একজন অন্যজনের অধিক অনুসরণ করে থাকে। মুজাহিদ যখন জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন সর্বপ্রথমে সওয়ারি প্রস্তুত করবে, যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়। কেননা, জিহাদে যাওয়া মূলত প্রকাশ্য ইবাদত। এটা গোপনে করা সম্ভব নয়। একইভাবে মানুষ মাঝে মধ্যে শব্দ করে তাহাজ্জুদ পড়ে, যাতে ঘরের অন্যরা জেগে উঠে এবং তার অনুসরণ করে। মোটকথা, হজ্জ, জিহাদ, জুমআ ইত্যাদির ন্যায় যে সমস্ত ইবাদত গোপনে করা সম্ভব নয়, সেগুলোতে রিয়ার মিশ্রণ না থাকার শর্তে প্রকাশ্যে পালন করা উত্তম।

পক্ষান্তরে যে সকল ইবাদত গোপনে করা সম্ভব যেমন দান-খয়রাত, সেগুলো প্রকাশ্যে পালন করলে যদিও অন্যকে উৎসাহিত করা হয় কিন্তু

মিসকীন কষ্ট পায়, তবে গোপনে দান-খয়রাত গোপনে করাই ভালো। মিসকীন যদি কষ্ট না পায়, তবু অনেকের মতে গোপনে দেওয়াই উত্তম এবং কারও কারও মতে গোপনে দেওয়া সেই প্রকাশ্যে দেওয়ার চেয়ে ভালো, যার মধ্যে কারও অনুকরণ নেই। কিন্তু যে প্রকাশ্যে দানের মধ্যে অন্যজনের অনুসরণ আছে, সেই দান প্রকাশ্যে হওয়াই ভালো। কেননা, আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে প্রকাশ্যে আমল করতে আদেশ করেছেন, যাতে অন্যরা তাঁদের অনুসরণ করে। তাছাড়া لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا তার নেকির সওয়াব এবং যে অনুসরণ করে, তার সওয়াবও পাবে— উল্লিখিত হাদিস থেকেও জানা গেল, প্রকাশ্যে আমল করার ফযিলত।

অপর এক হাদিসে রয়েছে— গোপন আমলের সওয়াব প্রকাশ্য আমলের তুলনায় ৭০ গুণ বেশি। তবে যে জাহেরি আমলের অনুসরণ করে, তার সওয়াব বাতেনি আমলের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি। হাদিসের প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন, (বায়হাকি : শুআবুল ইমান : ৬৩৯৪ ও ৬৬১২)

এই হাদিস সম্পর্কে মতানৈক্যের সুযোগ নেই। কেননা, রিয়ার মিশ্রণ হতে অন্তর মুক্ত হলে এবং প্রকাশ্য ও গোপন দুই অবস্থায় ইখলাস সহকারে আমলটি শেষ হলে প্রকাশ্য আমলই উত্তম হবে। কারণ, এতে অন্যরা অনুসরণ করবে। প্রকাশ্যে আমলের একমাত্র ভয় হচ্ছে রিয়া। যদি রিয়ার মিশ্রণ থাকে, তাহলে নিজে ধ্বংস হয়ে অপরের অনুসরণে কোনো লাভ নেই। এমতাবস্থায় প্রকাশ্যে আমলের চেয়ে গোপনে আমল করা সকলের মতেই ভালো।

তবে যে লোক তার আমলকে প্রকাশ করতে চায়, দুটি বিষয় তার চিন্তা করতে হবে। প্রথমত, এমন স্থানে প্রকাশ করতে হবে, যেখানে অপরের অনুসরণের নিশ্চিত অথবা গভীর বিশ্বাস থাকে। কিছু লোক পরিবারের অনুসরণীয় হয়, প্রতিবেশীর অনুসরণীয় হয় না। কিছু লোক প্রতিবেশীরও অনুসরণীয় হয়, মহল্লাবাসীর অনুসরণীয় হয় না। কখনো মহল্লাবাসীও তাকে অনুসরণ করে বরং অনুসরণীয় হিসেবে মান্য করে। আর প্রকৃত আলেম সকল মানুষের কাছে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন। আলেম নয় এমন ব্যক্তি যদি লোকসম্মুখে কোনো নফল ইবাদত করে, লোকজন তার ইবাদতকে রিয়া ও নিফাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। তাকে মন্দ বলে এবং তাকে অনুসরণীয় মান্য করে না। লোকসম্মুখে উপকার ছাড়া নিজের

নফল আমল প্রকাশ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য হিসেবে মান্য, কেবল তার জন্যই লোকজন তাকে অনুসরণ করবে এ নিয়তে লোক সম্মুখে আমল করা জায়েয।

দ্বিতীয়ত, নিজের নফসের প্রতি নজর রাখবে। অনেক সময় অন্তরে গোপন রিয়ার প্রতি মোহ থাকে যা তাকে লোকসম্মুখে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে। অধিকাংশ মানুষই সমাজে অনুকরণীয় হওয়ার উদ্দেশ্যে লোকসম্মুখে আমল করে। প্রকৃত মুখলিসগণ এমনটি করেন না। যদিও তাদের সংখ্যা অতি অল্প। দুর্বল ইখলাসের অধিকারী কেউ যেন নফসের ধোঁকায় না পড়ে। অন্যথা নিজের অজান্তেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো, সাতারে অদক্ষ এক ব্যক্তি দেখলো, বহুলোক সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। তাই সে তাদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হলো, ফলে যারা ডুবে যাচ্ছিলো তারা তাকে আঁকড়ে ধরলো, এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি নিজেও ডুবে মরবে অন্যদেরকেও ডুবিয়ে মারবে। ডুবে মরার কষ্ট তো সামান্য সময়ের জন্য অনুভূত হয়। কিন্তু রিয়ার শাস্তি তো চিরকালব্যাপী ভোগ করতে হবে।

রিয়া এমন এক ব্যাধি, যে ব্যাধিতে আলেম ও আবেদ সকলেই আক্রান্ত। রিয়াকারী নিজেকে প্রকৃত মুখলিস মনে করে সাধারণের সামনে প্রকাশ্যে আমল করে। অথচ তার অন্তর ইখলাস দ্বারা পূর্ণ নয়। ফলে তার সেই আমলের সওয়াব রিয়ার কারণে বাতিল হয়ে যায়।

বস্তুত লোকসম্মুখে আমল করার মাঝে রিয়া আছে কিনা তা অনুধাবন করা কিছুটা জটিল। তা বোঝার পদ্ধতি হলো, নিজেকে প্রশ্ন করবে, যদি আমি গোপনে আমল করি তাহলে আমি প্রতিদান পাবো কিন্তু মানুষের কাছে অনুসরণীয় হতে পারবো না। এমতাবস্থায় নফস যদি অনুসরণীয় হওয়ার প্রতি আগ্রহী হয়। তাহলে বুঝতে হবে অন্তরে রিয়া রয়েছে। এই আমলের উদ্দেশ্য সওয়াব নয় বরং মানুষের কাছে অনুসরণীয় হওয়া।

যা হোক, নফসের প্রবঞ্চনা থেকে নিজেকে হেফাজত করা উচিত। প্রকাশ্য আমল কম বিপদমুক্ত থাকে। গোপনে আমল করার মধ্যেই মুক্তি রয়েছে। আমল প্রকাশ করলে এমন বিপদাশঙ্কা রয়েছে, যা অতিক্রম করার যোগ্যতা আমাদের মতো লোকদের নেই। সুতরাং আমাদের এবং সকল দুর্বলমনা মুমিন লোকদের কর্তব্য হচ্ছে জাহেরী আমল করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

গোপনে আমল করার পর তা মানুষের নিকট প্রকাশ করা। এর বিধানও প্রকাশ্যে আমল করার মতো। অর্থাৎ, যার মন শক্ত ও পরিপূর্ণ ইখলাসের অধিকারী এবং যার নিকট মানুষের নিন্দা ও প্রশংসা সমান, সে এমন লোকদের নিকট নিজের আমলের কথা প্রকাশ করতে পারে, যাদের পক্ষ থেকে অনুসরণ আশা করা যায় এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহ জানা যায়। নিয়ত বিশুদ্ধ এবং মন নিরাপদ থাকলে প্রকাশ করায় ক্ষতি নেই; পূর্ববর্তী বুযুর্গরা এ ধরনের জাহির করতেন বলে বর্ণিত আছে। সাদ ইবনে মুয়ায বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এমন কোনো নামায আদায় করিনি, যাতে নামায ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের চিন্তা আমার মনে জাগ্রত হয়েছে এবং এমন কোনো জানাযার পিছনে যাইনি, যাতে তার সওয়াল-জওয়াব ব্যতীত অন্য কিছু মনে মনে ভেবেছি। আমি নবী কারীম (স)-এর নিকট থেকে যখনই কোনো কথা শুনেছি, তাকে সত্য বলেই বিশ্বাস করেছি। (অনুরূপ অর্থে : আর রিআয়া : ২৬১; বায়হাকি শুআবুল ঈমান)

উমর (রা) বলেন, আমি কখনো এ বিষয়ের পরওয়া করি না যে, আমি ধনী না গরীব। কেননা, ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতার মধ্যে কোনটি আমার জন্য মঙ্গলজনক, তা আমার জানা নেই। (আর রিআয়া : ২৬১)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, প্রতিদিন আমি আত্মোন্নয়ন কামনা করেছি। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১২৫)

উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়আত হওয়ার পর থেকে আমি কখনো যিনা করিনি, মিথ্যা বলিনি এবং ডান হাতে আপন লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। শাদ্দাদ ইবনে আওস (র) বলেন, মুসলমান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোনো অনর্থক কথা বলিনি। আমি কোনো কথা বলার পূর্বে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে নেই।

তিনি তার সেবককে বলেছিলেন, খাদ্য সংগ্রহের জন্য দস্তরখান নিয়ে এসো।

আবু সুফিয়ান (রা) মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তার পরিবারের লোাকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা আমার জন্য কেঁদো না। আমি তো ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে কোনো মিথ্যা কথা বলিনি।

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য যে ফয়সালাই করেছেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছি এবং এর বিপরীতটি

কখনো কামনা করিনি। আমি কেবল সেসব ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছি যা আল্লাহ তাআলা আমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩১১)

নিঃসন্দেহে এসব রেওয়ায়েত নিজের উত্তম অবস্থা প্রকাশ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। প্রকাশকারী অনুসৃত ব্যক্তিত্ব হলে এসব বিষয় প্রকাশ করা উত্তম। পক্ষান্তরে রিয়াকারের মুখ থেকে এসব কথা বের হলে সে ঘৃণ্য রিয়াকারী ছাড়া কিছুই নয়। অতএব, আমল প্রকাশ করার দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা সমীচীন নয়। কেননা, মানুষের মন দেখাদেখি কাজ করা ও অনুসরণ করা পছন্দ করে। এটা তার মজ্জার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, রিয়াকারও যদি তার ইবাদত প্রকাশ করে এবং মানুষ তার রিয়ার কথা না জানে, তবে এতেও মানুষের অনেক উপকার হয়ে থাকে। কিন্তু এটা বিশেষ করে তার নিজের জন্যে ক্ষতিকর। অনেক ইখলাস সম্পন্ন ব্যক্তির ইখলাসের কারণ রিয়াকারের অনুসরণ হয়ে থাকে। যদিও সে আল্লাহর কাছে রিয়াকার; কিন্তু তার অনুসরণ দ্বারা অপরের উপকার হয়ে যায়।

বসরার রাস্তাঘাট দিয়ে এক সময় ফজর নামাযের পর কেউ যাতায়াত করলে সে চতুর্দিক থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেত। কিন্তু যখন এক আলেম রিয়ার সূক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে একটি কিতাব রচনা করলেন, তখন সকলেই তিলাওয়াত বর্জন করে বলতে লাগল, এ কিতাবটি রচিত না হলেই ভালো হতো। (কূতুল কুলূব : ৮ : ৩০৫)

মোটকথা, রিয়াকারের প্রকাশ করার দ্বারাও ফায়দা হয় যদি মানুষ না জানে, সে রিয়ার কারণে আমল করছে। এ সম্পর্কে একটি হাদিসে বলা হয়েছে—

إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَ بِأَقْوَامٍ لَاخَلَاقَ لَهُمْ.

আল্লাহ তাআলা অপরাধী এবং এমন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করেন যারা আখিরাতের প্রাপ্তি থেকে মাহরুম। (সহিহ বুখারী : ৪২০; সহিহ মুসলিম : ১১১; সুনানে নাসায়ী (কুবরা) ৮৮৩৪)

মানুষের নিন্দার ভয়ে অপরাধ গোপন করার বৈধতা

ইখলাসের ভিত্তি হলো, কাজটি প্রকাশ্যে ও গোপনে বরাবর হওয়া। যেমন ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, তুমি প্রকাশ্যে আমল করাকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নাও। লোকটি বললো, হে আমীরুল মুমিনীন!

প্রকাশ্যে আমল কোনটি? তিনি বললেন, তুমি এমনভাবে আমল করো যেন লোকেরা সেই আমল সম্পর্কে জানলে তোমার লজ্জিত হতে না হয়।

আবু মুসলিম খাওলানী (র) বলেন, স্ত্রী-সহবাস ও পেশাব-পায়খানা ব্যতীত আমার অন্য কোনো আমল সম্পর্কে লোকেরা জানলে আমি তার পরোয়া করি না।

বস্তুত ইখলাসের এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং প্রতিটি মানুষই অন্তর বা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এমন অনেক গুনাহ করে থাকে যা সে মানুষদেরকে জানাতে লজ্জাবোধ করে। যদিও আল্লাহ তাআলা এসব গুনাহ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। মানুষদের থেকে গুনাহ গোপন করাকে রিয়া মনে হলেও বস্তুত তা রিয়া নয়। বরং মানুষ মুত্তাকী ও খোদাভীরু বলবে এ উদ্দেশ্যে গুনাহ গোপন করা রিয়া। মানুষদের থেকে গুনাহ গোপন করা নিম্নোক্ত আটটি কারণে বৈধ।

এক. এই ভয়ে গুনাহ প্রকাশ হয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করা যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার গুনাহ প্রকাশ করে দিলে কেয়ামত দিবসেও হয়তো সবার সামনে তা প্রকাশ করে দিবেন। কারণ হাদিস শরিফে এসেছে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় যার গুনাহকে গোপন রাখেন, আখেরাতেও তার গুনাহকে গোপন রাখবেন। আর এই ভয় ঈমানের শক্তি থেকে সৃষ্টি হয়।

দুই. একথা জানা যে, আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য গুনাহকে অপছন্দ করেন। আর তা গোপন রাখাকে ভালোবাসেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো একটি নোংরা কাজে লিপ্ত হয় সে যেন আল্লাহ তাআলার পর্দা দ্বারা তা আবৃত রাখে।" এই ব্যক্তি গুনাহের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হলেও ওই পন্থা অবলম্বন করেছে যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। এটাও ঈমানী শক্তির ফসল। এ ব্যাপারে সত্যবাদিতার আলামত হলো, নিজের গুনাহের মতো অন্যের গুনাহ প্রকাশ হয়ে যাওয়াকেও অপছন্দ করা।

তিন. মানুষের নিন্দা ও তিরস্কারের ভয়ে গুনাহ প্রকাশ হওয়াকে অপছন্দ করা। কারণ এ নিন্দা কখনো কখনো নফস ও কলবকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ করে দেয়। মানুষ স্বভাবত নিন্দা ও তিরস্কারে কষ্ট পায়। আর এই কারণে মানুষের এমন প্রশংসাকেও অপছন্দ করা উচিত, যা আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ করে দেয়। এটাও ঈমানী শক্তির ফসল। কারণ আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অন্তরের আগ্রহ ঈমান থেকেই সৃষ্ট হয়।

চার. মানুষের ভর্ৎসনা ও নিন্দার ভয়ে গুনাহ গোপন করা। কারণ স্বভাবত মানুষ এর দ্বারা কষ্ট পায়। আঘাত পেলে যেমন শরীরে ব্যাথ্যা অনুভূত হয় তদ্রূপ নিন্দা ও ভর্ৎসনায় অন্তর ব্যথিত হয়। আর নিন্দার কারণে অন্তর ব্যথিত হওয়া হারাম নয়। এর কারণে গুনাহও হয় না। গুনাহ তখনই হয় যখন এই নিন্দার কারণে অন্তর হারাম কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

বস্তুত ঈমান তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন নিন্দুক ও প্রশংসাকারী বরাবর হয়ে যায়। কারণ বান্দা তো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। এর মালিক তো একমাত্র আল্লাহ তাআলা, এরপরও অধিকাংশ মানুষ নিন্দার কারণে কষ্ট পায়। তবে নিন্দুক মুসলিম ও বিচক্ষণ হলে তার নিন্দা কাঙ্ক্ষিত ও প্রশংসনীয় হয়ে থাকে। কারণ এমন ব্যক্তির নিন্দা দীনের ব্যাপারে সতর্ক করে।

যদি কেউ নিজের তাকওয়া ও খোদাভীরুতার ব্যাপারে মানুষের প্রশংসা কামনা করে। আর মানুষ প্রশংসা না করলে কষ্ট পায়। তাহলে এটা বড়ই নিন্দনীয় কাজ। এই ব্যক্তি তাকওয়ার ব্যাপারে মানুষের প্রশংসা কামনা করছে। অথচ খোদার আনুগত্যের ব্যাপারে প্রশংসা কামনা করা হারাম। অন্তরে এ ধরনের ইচ্ছা জাগ্রত হলে তাকে বারবার সতর্ক করে তার মোকাবেলা করা ওয়াজিব।

মোটকথা, গুনাহের ব্যাপারে মানুষের নিন্দাকে বড় মনে করা স্বভাবগত বিষয়। এটাকে নিন্দনীয় বলা যাবে না। কেননা, মানুষের নিন্দা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে গুনাহ গোপন করা জায়েয।

অনেক সময় বান্দা প্রশংসিত হতে চায় না। কিন্তু নিন্দাকেও অপছন্দ করে। সে প্রশংসিত বা নিন্দিত কোনোটিই হতে চায় না। এমন অনেক মানুষ আছে যারা প্রশংসার স্বাদ নেয় না। আবার নিন্দার যাতনাও সহ্য করতে পারে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে মানুষের প্রশংসা কামনা করে, সে তার আনুগত্য তৎক্ষণাৎ লাভ করে। আর যে গুনাহ করে নিন্দিত হওয়াকে অপছন্দ করে তার কোনো অপরাধ নেই। তবে মানুষ তার গুনাহ সম্পর্কে জেনে যাবে, এই ভয়ে আল্লাহ তাআলা থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনটি হলে এটা হবে তার দীনের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতির কারণ।

পাঁচ. নিন্দুক নিজেই নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়ায় তার নিন্দাকে অপছন্দ করা। এটাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এর আলামত হলো, অন্যের ক্ষেত্রেও ওই

নিন্দুকের নিন্দাকে অপছন্দ করা। কারণ তার নিন্দাকে অপছন্দ করার কারণ একটিই। তা হলো তার নফরমানি।

ছয়. এই উদ্দেশ্যে গুনাহকে গোপন করা যেন অন্য কেউ তার গুনাহ সম্পর্কে জেনে তার সাথে অসদাচরণ না করে। এটা নিন্দা ভিন্ন অন্য এক জিনিস। নিন্দার যাতনা এজন্য অনুভূত হয় যে, এর মাধ্যমে নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রকাশ পায়। যদিও নিন্দুকের থেকে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, কিন্তু কখনো কখনো এই ভয় হয় যে, যদি কেউ তার গুনাহ সম্পর্কে জেনে ফেলে তাহলে তার ক্ষতি করবে। কাজেই লোকদের থেকে গুনাহকে গোপন করা জায়েয।

সাত. লজ্জায় গুনাহকে গোপন করা। নিন্দা ও অনিষ্টের ভয় ছাড়াও এটাও এক ধরনের যাতনা। লজ্জা একটি উত্তম স্বভাব। শৈশবে যখন জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হয় তখন মানুষের মাঝে এই গুণটি সৃষ্টি হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় গুণ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ অর্থাৎ, লজ্জার পুরোটাই কল্যাণময়।

অন্য এক হাদিসে রাসূলে কারীম (স) বলেন, اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

অন্যত্র তিনি বলেন, اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِيْ إِلَّا بِخَيْرٍ অর্থাৎ, লজ্জা শুধুমাত্র কল্যাণই বয়ে আনে।

তিনি আরও বলেন, اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْحَيِيَّ الْحَلِيْمَ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা লজ্জাশীল ও সহনশীলদের পছন্দ করেন।

যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং মানুষের মাঝে পাপ প্রকাশ হওয়ার পরোয়া করে না, সে তার পাপের সাথে সাথে নির্লজ্জতার দোষেও দুষ্ট হয়। তার অবস্থা পাপ গোপনকারীর চেয়ে গুরুতর। তবে লজ্জা রিয়ার সাথে অত্যধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। খুব কম লোকই উভয়টির মাঝে পার্থক্য করতে পারে। অধিকাংশ লোকই দাবি করে তারা লজ্জার গুণে গুণান্বিত আর আমলের সৌন্দর্য লজ্জার দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। অথচ তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বরং লজ্জা তো এমন একটি উত্তম স্বভাব যা সম্ভ্রান্ত ও সত্য লোকদের মাঝে জাগ্রত হয়। এরপর রিয়া এবং ইখলাসের উপকরণগুলো

সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো লজ্জার বদৌলতে মানুষ মুখলিস হয়ে যায় আবার কখনো এর কারণে রিয়াকার হয়ে যায়। এর দৃষ্টান্ত হলো, এক ব্যক্তি তার বন্ধুর কাছে ঋণ চাইলো। কিন্তু বন্ধুর মন ঋণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় আবার ফিরিয়ে দিতেও লজ্জাবোধ করছে। যদি ঋণ বন্ধু নিজে না চেয়ে কোনো প্রতিনিধি পাঠাতো তাহলে সে রিয়া করে বা সওয়াবের নিয়তে কোনোভাবেই ঋণ প্রদান করতো না। এমতাবস্থায় যদি সে লজ্জার পরোয়া না করে সরাসরি ঋণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। তাহলে এটি নির্লজ্জের মতো কাজ হবে। কারণ, যার লজ্জা আছে সে হয়তো ঋণ প্রদান করবে অথবা না করার ব্যাপারে আপত্তি পেশ করবে।

আর যদি সে ঋণ প্রদান করে তাহলে তার তিন অবস্থা,

প্রথমত, তার অন্তরে লজ্জার সাথে রিয়ার মিশ্রণ ঘটবে। অর্থাৎ প্রথমে লজ্জার কারণে তাকে ফিরিয়ে দেওয়াকে অশোভনীয় মনে করবে। এরপর তার মনে রিয়ার উদয় হবে এবং মনে হবে, তাকে ঋণ প্রদান করা উচিত। যাতে সে তার প্রশংসা করে এবং দাতা হিসেবে তাকে স্মরণ করে। এমতাবস্থায় যদি সে ঋণ প্রদান করে তাহলে এই প্রদানে সে রিয়াকারী বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয়ত, লজ্জার কারণে সে বন্ধুকে ফিরিয়ে দিতে পারছে না। অপরদিকে কৃপণতার কারণে তাকে ঋণ প্রদানও করতে পারছে না। এরপর অন্তরে ইখলাসের উদয় হলো। ফলে তার মনে হলো, ঋণ প্রদানে সদকার চেয়ে আঠারো গুণ বেশি সওয়াব রয়েছে এবং এর মাধ্যমে বন্ধুকেও খুশি করা যায়। যা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। অবশেষে সে ঋণ প্রদান করলো। এই ব্যক্তি মুখলিস। লজ্জা তার ইখলাসকেও জাগিয়ে তুলেছে।

তৃতীয়ত, সওয়াবের প্রতি আগ্রহ থাকবে না। নিন্দার ভয় অথবা প্রশংসিত হওয়ার প্রতি মোহও থাকবে না। এমনকি ওই বন্ধু যদি নিজে ঋণ না চেয়ে কোনো প্রতিনিধি পাঠাতো তাহলে সে ঋণ প্রদান করতো না। এমতাবস্থায় সে ঋণ প্রদান করলে তা হবে নিছক লজ্জার কারণে। লজ্জা না থাকলে সে তাকে ফিরিয়ে দিতো। যদি এমন অপরিচিত কোনো ব্যক্তি তার কাছে ঋণ চাইতো যাকে প্রদান না করলে সে লজ্জা পায় না। তাহলে সে তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতো। এ ধরনের লজ্জা কেবল কৃপণতা ও অন্যায় কাজের মাঝেই প্রকাশ পায়। আর রিয়াকারী বৈধ বিষয়াদিতেও লজ্জা

পায়। এজন্য কেউ তাকে দাঁড়াতে দেখলে সে ধীরে ধীরে চলতে থাকে অথবা কেউ তাকে হাসতে দেখলে সে চুপ হয়ে যায়। সে এটাও লজ্জা মনে করে। অথচ এটাই হলো রিয়া।

বলা হয়, অনেক সময় লজ্জা মন্দ গুণও হয়ে থাকে একথাটি সঠিক। আর তা হলো, ভালো কাজে লজ্জা করা। যেমন মানুষকে ভালো কাজের নসীহত করতে লজ্জা পাওয়া, নামাযের ইমামতি করতে লজ্জা পাওয়া। মহিলা ও শিশুদের ইমামতি করার ক্ষেত্রে এই লজ্জা প্রশংসনীয় হলেও অন্যান্যদের বেলায় তা নিন্দনীয়। বৃদ্ধাদেরকে অন্যায় কাজ করতে দেখলে তাদের নিষেধ করতে যে লজ্জা অনুভূত হয় তা প্রশংসনীয়। কারণ বৃদ্ধাদেরকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার নামান্তর। তবে এর চেয়েও উত্তম হলো, আল্লাহকে লজ্জা করে তাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া। এজন্যই প্রকৃত মুমিনগণ এসব ক্ষেত্রে মানুষের লজ্জার পরোয়া না করে আল্লাহকে লজ্জা করেন।

মোটকথা এসব কারণে মানুষদের থেকে গুনাহকে গোপন করা জায়েয।

আট. এই আশঙ্কায় গুনাহ গোপন করা যে, সাধারণ মানুষ তার গুনাহ দেখে গুনাহের প্রতি প্ররোচিত হবে। এটি ইমাম অথবা অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এ কারণেই পরিবারের কর্তার তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানসন্ততি থেকে গুনাহ গোপন করা উচিত। কারণ তারা তার আদর্শেই গড়ে ওঠে।

উপরিউক্ত আটটি কারণেই গুনাহ গোপন করা বৈধ। আর লোকসম্মুখে ইবাদতের বেলায় কেবল শেষোক্ত কারণটিই বৈধ। অর্থাৎ, মানুষকে আমল শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সামনে ইবাদত করা বৈধ। আর মানুষ মুত্তাকি ও পরহেযগার বলবে এই উদ্দেশ্যে গুনাহ গোপন করা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন হয়, একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললো, আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দিন যাতে আল্লাহও আমাকে ভালোবাসেন, মানুষও আমাকে পছন্দ করে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ، وَانْبِذْ إِلَيْهِمْ هَذَا الْحِطَامَ يُحِبُّوْكَ.

তুমি দুনিয়ায় যুহদ অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর দুনিয়ার এই তুচ্ছ সম্পদ মানুষকে দান করো তাহলে তারা তোমাকে পছন্দ করবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১০২)

আলোচ্য হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, মানুষের প্রশংসা ও ভালোবাসা কামনা করা জায়েয।

এর উত্তর হলো, মানুষের প্রশংসা ও ভালোবাসা কামনা করা কখনো মুবাহ, কখনো প্রশংসনীয়, আবার কখনো নিন্দনীয় হয়।

যদি মানুষের ভালোবাসা দ্বারা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা বোঝা উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা প্রশংসনীয়। কারণ আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে পছন্দ করেন তখন তার বান্দাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।

আর যদি হজ, জিহাদ, নামায বা নির্দিষ্ট কোনো ইবাদতে মানুষের প্রশংসা ও ভালোবাসা কামনা করা হয় তাহলে তা নিন্দনীয়। কারণ এর মাধ্যমে দুনিয়াতেই আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিদান কামনা করা হয়; সওয়াব কামনা করা হয় না।

আর যদি নিজের প্রশংসনীয় গুণাবলীর ব্যাপারে মানুষের প্রশংসা ও ভালোবাসা কাম্য হয় তাহলে তা মুবাহ। এটা সম্পদ কামনা করার মতোই। কারণ সম্পদের মালিকানার মতো মানুষের অন্তরের মালিকানা দ্বারাও বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব। কাজেই উভয়টির মাঝে কোনো তফাৎ নেই।

রিয়ার ভয়ে সৎকাজ ত্যাগ করা : কিছু কিছু লোক রয়েছে রিয়াকার হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমল করাই ছেড়ে দেয়। এটা তাদের ভুল। মনে রাখতে হবে, আমল দু'প্রকার।

প্রথম প্রকার, যার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই; আছে কেবল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। যেমন নামায, রোযা, হজ ও জিহাদ। এসব আমল আনন্দদায়ক হয় তখন, যখন এগুলোর দ্বারা মানুষের প্রশংসা কুড়ানো যায়।

দ্বিতীয় প্রকার সেসব আমল, যেগুলো নিজেই আনন্দদায়ক। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই একজন মাত্র ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বসাধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন খলিফা হওয়া, বিচারক হওয়া, শাসক হওয়া, নামাযের ইমাম হওয়া, উপদেষ্টা ও শিক্ষক হওয়া ইত্যাদি। এসব আমল জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার কারণে বিপদাপদ থেকে মোটেও নিরাপদ নয়।

প্রথম প্রকার আমল যেমন নামায, রোযা ও জিহাদ— এগুলোর মধ্যে তিনভাবে রিয়া হতে পারে।

প্রথম, আমলের আগেই রিয়া আসে এবং মানুষকে দেখানোর জন্য। এর সাথে কোনো ধর্মীয় কারণ থাকে না। রিয়ার ভয়ে এ ধরনের আমল ত্যাগ করা উচিত। কেননা, এটা পরিষ্কার গুনাহ। এতে ইবাদত হয় না; বরং এটা ইবাদতের বেশে মানুষের মধ্যে মর্যাদা হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়। যদি অন্তর থেকে এই রিয়াকে প্রতিহত করা সম্ভব হয় এবং অন্তর লোক দেখানোর পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য ইবাদত করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তাহলে এসব আমল করতে কোনো অসুবিধা নেই।

দ্বিতীয়, আমল আল্লাহর জন্যই করতে প্রস্তুত থাকার পর মধ্যখানে অথবা সূচনাতে রিয়া আসা। এমতাবস্থায় আমল ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা, এতে ধর্মীয় কারণ পাওয়া যায়। এখানে রিয়া দূর করা আবশ্যক অধ্যবসায়ের মাধ্যমে।

তৃতীয়, ইখলাসের সাথে আমলের নিয়ত করা, এরপর রিয়া ও রিয়ার কারণগুলো আমল করার সময় আত্মপ্রকাশ করা। এমতাবস্থায়ও রিয়া দূর করার জন্য অধ্যবসায় অপরিহার্য এবং আমল ত্যাগ করা অনুচিত। কেননা, শয়তান প্রথমে তাই কামনা করে, মানুষ আমল ছেড়ে দিক। যদি কেউ শয়তানকে পরিত্যাগ করে আমল করতে থাকে, তখন শয়তান তাকে রিয়ার দিকে আকৃষ্ট করে। কেউ তাও উপেক্ষা করলে শয়তান বলে, তোর আমলে ইখলাস নেই। তুই রিয়াকার, ইখলাসহীন আমল দ্বারা তোর কোনো ফায়দা হবে না। শয়তান এ কথাটি বারবার বলে যেতে থাকে, যে পর্যন্ত সে আমল ত্যাগ না করে।

রিয়ার আশঙ্কায় আমল পরিত্যাগকারীর দৃষ্টান্ত হলো, মুনিব তার গোলামকে আগাছাযুক্ত গম দিয়ে সেটাকে পরিপূর্ণভাবে আগাছামুক্ত করতে বললো, এরপর সেই গোলাম পরিপূর্ণভাবে আগাছামুক্ত হয় কিনা এ আশঙ্কায় কাজ বাদ দিল। আমল পরিত্যাগকারী এই গোলামের মতোই।

লোকেরা তাকে রিয়াকারী বলবে এই ভয়ে আমল পরিত্যাগকারীও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি শয়তানী ধোঁকা। প্রথমত, কোনো মুসলমানের ব্যাপারে অযথা কুধারণা করাই ঠিক নয়। এরপরও যদি কেউ এসব কথা বলে তাহলে তার কথার কারণে আমলের সওয়াব নষ্ট করার কী প্রয়োজন। তাছাড়া মানুষ বলবে এই ভয়ে আমল ছেড়ে দেওয়াও তো মূলত রিয়া। মানুষের প্রশংসার প্রতি আগ্রহ ও তাদের নিন্দার পরোয়া না

থাকলে লোকেরা তাকে রিয়াকারী বলুক অথবা মুখলিস, কোনো অবস্থাতেই আমল পরিত্যাগ করতো না। এসবই হলো শয়তানের ফাঁদ, মূর্খ আবেদরাই এই ফাঁদে পা দেয়।

অতঃপর আমল ছেড়ে দিলেও শয়তানের ধোঁকা থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব নয়। বরং তখন সে বলবে, মানুষ তোমাকে মুখলিস বলবে এই আশায়—তুমি আমল বর্জন করছো।

এক পর্যায়ে শয়তান তাকে শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এমনকি শহর ছেড়ে পালালেও সে ধোঁকা দিবে। শয়তানের এসব ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো, অন্তরে রিয়ার ক্ষতি উপলব্ধি করা যে, আখেরাতে তা কেবল অকল্যাণই বয়ে আনবে, আর দুনিয়াতেও এর কোনো ফায়েদা নেই এবং শয়তানী ওয়াসওয়াসার পরোয়া না করে ধারাবাহিকভাবে আমল করে যাওয়া। যদি এই ওয়াসওয়াসার কারণে আমল ত্যাগ করা হয় তাহলে কল্যাণের দুয়ার চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। যতক্ষণ আমলের কোনো দীনী উদ্দেশ্য বাকি থাকবে ততক্ষণ আমল করে যেতে হবে, রিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে এবং অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় ও লজ্জাকে আবশ্যক করে নিতে হবে। যদি অন্তর কখনো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বিপরীতে মানুষের প্রশংসার প্রতি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ সেই অন্তরের ব্যাপারে অবগত আছেন। যদি মানুষ জানতে পারে যে, অন্যরা তাদের প্রশংসা কামনা করে তাহলে তারা প্রশংসার পরিবর্তে নিন্দা ও সমালোচনা করবে। যদি আল্লাহ তাআলার ভয়ে আমল বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তাহলে তা-ই করা উচিত।

যদি শয়তান এই ওয়াসওয়াসা দেয় যে, তুমি রিয়াকারী, তাহলে অন্তরে রিয়ার প্রতি ঘৃণা, আল্লাহ তাআলার ভয় ও লজ্জা থাকলে তুমি তার মিথ্যা ও ছলনা ধরতে পারবে। কিন্তু যদি অন্তরে রিয়ার প্রতি ঘৃণা, আল্লাহ তাআলার ভয় না থাকে। বরং অন্তরে কেবল রিয়াই থাকে তাহলে সেই আমল বর্জন করতে হবে।

এমনটি হওয়া খুব মুশকিল, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো আমল আরম্ভ করে তার অন্তরে অবশ্যই সওয়াবের নিয়ত থাকে।

মানুষের নিকট খ্যাত হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমল ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ থেকে বর্ণিত আছে। এক বর্ণনায় আছে, ইবরাহীম নাখয়ী

(র) একদিন তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় এক লোক তার খিদমতে হাজির হলো। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করে বললেন, আগন্তুক যেন না জানে যে, আমি প্রতিনিয়ত তিলাওয়াত করি। (আর রিআয়াহ : ২৬৬)

ইবরাহীম তাইমী (র) বলেন, যখন কথা বলা তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয়, তখন চুপ থাকবে আর যখন চুপ থাকা আরামদায়ক মনে হয়, তখন কথা বলবে। (বায়হাকি : শুআবুল ইমান : ৪৫১৮)

হাসান বসরী (র) বলেন, কোনো কোনো মনীষী রাস্তায় কষ্টদায়ক জিনিস পড়ে থাকতে দেখেও লোকেরা প্রশংসা করার ভয়ে অনেক সময় সেটি সরাতেন না। কেউ কেউ ভাবাবেগে কান্না এলে তা হাসিতে রূপান্তরিত করে দিতেন। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১৩৮)

এ সম্পর্কে এ ধরনের আরও অনেক বর্ণনা আছে। এগুলোর জবাব এই যে, আমল বর্জনের বর্ণনাসমূহের মুকাবিলায় আমল জারি রাখার বর্ণনা অসংখ্য বুযুর্গ থেকে বিদ্যমান আছে। এছাড়া নফল আমল হলে তা ত্যাগ করা জায়েয।

আর আমাদের আলোচনা উত্তমের ব্যাপারে। আর শক্তিশালী ব্যক্তিরাই উত্তমের ওপর আমল করতে সমর্থ হন। উত্তম হলো আমল ত্যাগ না করে তা চালিয়ে যাওয়া এবং ইখলাস অর্জনের জন্য চেষ্টা করা এমন অনেক আমলকারী রয়েছেন, যারা উত্তমের বিপরীত আমলের মাধ্যমে আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা করেন। এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ দুর্বল। আর অনুসরণ শক্তিশালী ব্যক্তিদেরকেই করা উচিত।

আগন্তুকের আগমনে ইবরাহিম নাখয়ি (র)-এর তেলাওয়াত বন্ধ করে দেওয়ার কারণ হলো, সম্ভবত তিনি আগন্তুকের সাথে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং তার বিদায়ের পর পুনরায় তিলাওয়াত আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন।

আর রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু না সরানোর বিষয়টি ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধির আশঙ্কা করে এবং মনে করে, লোকেরা যদি তার কাছে আসতে থাকে তাহলে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করতে পারবে না। আর রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর চেয়ে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করা উত্তম।

আর ইবরাহিম তাইমি (র)-এর বক্তব্য "যখন কথা বলা তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় তখন চুপ থাকবে আর যখন চুপ থাকা আরামদায়ক মনে হয় তখন বলবে" এর ব্যাপারে কথা হলো, সম্ভবত এখানে তিনি মুবাহ কথা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যেমন ঘটনা বর্ণনায় ফাসাহাতপূর্ণ কথা দ্বারা তা ব্যক্ত করা। কারণ এটা আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি করে। এমনিভাবে চুপ থাকা মুবাহ এমন ক্ষেত্রে চুপ থাকার মাধ্যমে আত্মপ্রীতি লাভ করা নিষিদ্ধ। আর সত্য ও মুস্তাহাব কথা বলার ক্ষেত্রে বড় কোনো মুসিবতের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে বান্দার দেহ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে। যাতে মুসিবত কম হয়ে থাকে।

আর হাসান বসরী (র)-এর বক্তব্য, "পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ প্রসিদ্ধির ভয়ে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাতেন না এবং কান্নাকে হাসিতে রূপান্তরিত করতেন" এর উত্তর হলো, এটা ওই সকল দুর্বল লোকদের অবস্থা যারা উত্তম সম্পর্কে জানেন না এবং এসব সূক্ষ্ম বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারে না। হাসান বসরী (র) প্রসিদ্ধির মুসিবত থেকে সতর্ক করার জন্য তাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আমল এটি জনসাধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত, বিধায় তাতে রিয়ার বিপদাশঙ্কা বেশি। সবচে বেশি বিপদ শাসনকার্য, এরপর শাসনকর্তা হওয়ায় এবং উপদেশ, শিক্ষকতা ও ফতোয়াদানের মধ্যে। এগুলোর প্রত্যেকটি বিস্তারিতভাবে জানা আবশ্যক।

খিলাফাত বা শাসনকার্য পরিচালনা বলতে বুঝায় মুসলিম জন অধ্যুষিত অঞ্চলের নেতৃত্ব দেওয়া। এটা ইনসাফ ও একনিষ্ঠভাবে হলে উত্তম ইবাদত। হাদিসে বলা হয়েছে–

لَيَوْمٌ مِنْ اِمَامٍ عَادِلٍ خيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهٗ سِتِّيْنَ عَامًا.

ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন এক ব্যক্তির একা একা ৬০ বছর ইবাদতের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

এরচেয়ে বেশি ইবাদত আর কী হবে, যার একদিন ৬০ বছরের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। অন্য হাদিসে আছে–

اَوَّلُ مَنْ يَّدْخلُ الْجَنَّةَ ثَلَاثَةٌ اَلْاِمَامُ الْمُقْسِطُ اَحدُهمْ.

সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে। ন্যায়পরায়ণ শাসক তাদের একজন। (সহিহ মুসলিম : ২৮৬৫)

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ اَلْإِمَامُ الْعَادِلُ اَحَدُهُمْ.

তিন ব্যক্তির দুআ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক তাদের একজন। (জামে তিরমিযী : ২৫২৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৭৫২)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (স) বলেন,

اَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِمَامٌ عَادِلٌ

কিয়ামতের দিন আমার অধিক নিকটে বসবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। (জামে তিরমিযী : ১৩২৯)

মোটকথা, খিলাফত একটি মহান ইবাদত। এতে অনেক বেশি বিপদাশঙ্কা হওয়ার কারণে আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ সর্বকালেই এ থেকে দূরে থেকেছেন। কারণ, এর জন্য নিজের নাম কুড়ানো এবং বিজয়ী হওয়ার আনন্দ প্রবল হয়ে যায়, যা জাগতিক আনন্দসমূহের অন্যতম। সাধারণত শাসক ব্যক্তি তার মানসিক চাহিদা চরিতার্থ করতে তৎপর থাকে। ফলে, আপন খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে সে সত্য বিষয়কেও ত্যাগ করতে পারে— যদি তা তার নাম যশপ্রীতির বিপরীত হয়। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে খ্যাতি বেশি, তা বাতিল হলেও বাস্তবায়িত করতে পারে এবং বরবাদ হয়ে যেতে পারে। এমন বিপদাশঙ্কার জন্যই উমর (রা) বলতেন, এই পদে যখন এত বিপদ, তখন এটি কে গ্রহণ করতে পারে? (হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ৮০)

নবী কারীম (স) ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ وَالِيْ عَشَرَةٍ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلَةً يَدَاهُ اِلَى عُنُقِهِ اَطْلَقَهُ عَدْلُهُ اَوْ اَوْبَقَهُ جُوْرُهُ.

যে লোক দশজন লোকেরও শাসক, সেও কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উঠবে যে, তার হাত ঘাড়ের সঙ্গে বাঁধা থাকবে। সে মুহূর্তে তার ইনসাফ তাকে বাঁচাবে অথবা তার জুলুম তাকে ধ্বংস করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা : ৩৩২২২)

খলিফা উমর (রা) মাকাল ইবনে ইয়াসারকে কোনো এক প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি নিবেদন করলেন, আমীরুল মুমিনীন! এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে পরামর্শ দিন এ পদ কবুল করা আমার উচিত কি না? খলিফা বললেন, যদি আমার পরামর্শের উপরই নির্ভর করো, তাহলে আমার মতে গ্রহণ না করাই ভালো। কিন্তু আমার এ পরামর্শের কথা অন্য কাউকে জানাবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা : ৩৩২১৬)

হাসান বসরি (র) বলেন, কোনো এক সাহাবিকে রাসূলুল্লাহ (স) কোনো অঞ্চলের শাসনকার্যে নিয়োজিত করলেন। সাহাবি বলেন, রাসূলুল্লাহ, আপনি আমার জন্য একটা পছন্দ করুন। এই দায়িত্ব কি নেবো নাকি না নিলেই ভালো হয়? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, নেওয়ার দরকার নেই। (ইবনে আবি শায়বা : মুসান্নাফ : ৩৩২১৭)

আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, হে আবদুর রহমান! শাসক হওয়ার জন্য দরখাস্ত করবে না। যদি দরখাস্ত ছাড়াই পেয়ে যাও, তবে এর জন্য তুমি অদৃশ্য থেকে সহযোগিতা পাবে। আর দরখাস্ত করে পেলে সহযোগিতা পাবে না। (সহিহ বুখারী : ৬৬২২; সহিহ মুসলিম : ১৬৫২)

একদিন রাফে' ইবনে উমরকে আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, দু'ব্যক্তির উপরও শাসক নিযুক্ত হয়ো না। কিন্তু পরে যখন আবু বকর নিজেই খলিফা হলেন, তখন রাফে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাকে বলেননি যে, দু'ব্যক্তির উপরও শাসক নিযুক্ত হয়ো না? আজ তো আপনাকে সমগ্র উম্মতের শাসনভার দেওয়া হয়েছে। আবু বকর (রা) বললেন, আমি আজও সে কথাই বলি। যে লোক শাসক হয়ে ন্যায়বিচার করে না, তার উপর আল্লাহর লানত। (তাবরানি মুজামে কাবির : ৫ : ২১)

যে সকল হাদিসে শাসক হওয়ার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে এবং যে সকল হাদিসে শাসক হতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, কোনো স্বল্পজ্ঞানী লোক হয়তো সেগুলোকে পরস্পরবিরোধী মনে করবে। প্রকৃত ব্যাপার এমন নয়। এ সম্পর্কে প্রকৃত কথা হচ্ছে যে, সত্যই যারা ধার্মিক, তাদের শাসক হতে অস্বীকার করা উচিত নয়। আর যারা দুর্বল, তাদের অবশ্যই শাসনের ধারে-কাছে যাওয়ার দরকার নেই। তারপরও যদি এদিকে পা বাড়ায় তবে নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবে। শক্তিশালী ধার্মিক তারাই, যারা আল্লাহর কাজে

কারও বিদ্রূপকে ভয় করে না এবং দুনিয়া যেদিকেই যাক, তারা লোভ ও মোহের জালে আবদ্ধ হয় না। এ ধরনের লোকদের প্রতিটি নড়াচড়া ও উঠাবসা ন্যায়সঙ্গত হয়ে থাকে। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবননাশের আশঙ্কা থাকলেও তাতে তারা কিছুমাত্র পরোয়া করে না। সুতরাং শাসক হওয়া এ ধরনের ব্যক্তিদেরই কাজ।

যে ব্যক্তি নিজেকে সত্যের ওপর ধৈর্যশীল এবং প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে মনে করে। কিন্তু শাসনভার পেলে নিজের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ও ক্ষমতার মোহে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে। এমন ব্যক্তির শাসক হওয়া উচিত কি না— এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এমন ব্যক্তির শাসনভার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। কারণ, তার অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার আশঙ্কা ভবিষ্যতে। কিন্তু বর্তমানে একজন শাসকের যেসকল গুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক। তার প্রতিটি গুণ তার মাঝে বিদ্যমান।

তবে সঠিক কথা হলো, এমন ব্যক্তির শাসনভার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারণ নফস ধোঁকা দেয়। সে ভালো কাজের অঙ্গীকার করে। কিন্তু সে তার অঙ্গীকার পূরণ করবে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। শাসনভার পেলে তার অবস্থার পবিরর্তন হয়ে যেতে পারে। এই দায়িত্ব গ্রহণ না করলে কোনো ক্ষতিও নেই। বরং দায়িত্ব নেওয়ার পর বরখাস্ত হওয়ার চেয়ে দায়িত্ব গ্রহণ না করাই শ্রেয়। পদচ্যুতি একটি পীড়াদায়ক বিষয়। বলা হয়, পদচ্যুতি পুরুষের তালাকের ন্যায়। কেউ যখন কোনো পদে অধিষ্টিত হয় তখন আর সে পদচ্যুত হতে চায় না। বরং তার নফস চাটুকারিতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও সে সত্যপথ থেকে সরে যায়, সে জাহান্নামে যেতে রাজি হয় কিন্তু পদচ্যুত হতে রাজি হয় না। ফলে মৃত্যু অথবা বরখাস্ত হওয়ার মাধ্যমেই তার পদচ্যুতি ঘটে।

যে ব্যক্তি শাসক হতে চায় তার শাসনকার্যের ভিত্তি হয় মন্দের ওপর। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে আমাদের কাছে শাসনভার কামনা করে আমরা তাকে এই দায়িত্ব অপর্ণ করি না। (সহিহ বুখারি : ৭১৪৯)

শক্তিশালী ও দুর্বলদের মধ্যকার হুকুমের এই পার্থক্য বোঝার পর এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আবু বকর (রা) কেন রাফে' ইবনে ওমর (রা)-কে শাসনভার গ্রহণ করতে নিষেধ করে নিজে খেলাফতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

শাসনকর্তার অধীনে বিচারকের পদ হলেও এর হুকুমও শাসনকর্তার পদের মতোই। এতেও শাসনক্ষমতা আছে, যা স্বভাবতই প্রিয়। বিচারকের পদে যদি ন্যায়-নীতির অনুসরণ করা হয়, তাতে অনেক সওয়াব, আর যদি ন্যায় থেকে বিচ্যুতি ঘটে, তার শাস্তিও অনেক। হাদিসে বর্ণিত আছে, বিচারক তিন প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার জান্নাতে এবং দু'প্রকার জাহান্নামে যাবে। (সুনানে আবু দাউদ : ৩৫৭৩; জামে তিরমিযী : ১৩২২; নাসায়ী সুনানে কুবরা : ৫৮৯১; ইবনে মাজাহ : ২৩১৫)

অন্য হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি নিজে বিচারক হওয়ার আবেদন করে, সে ছুরি ছাড়াই জবাই হয়ে যায়। (আর-রিআয়া : ২৭৩; মুহাম্মদ ইবনে খালাফ : আখবারুল কুযাত : ১ : ১৩; অনুরূপ অর্থে— সুনানে আবু দাউদ : ৩৫৭১; জামে তিরমিযী : ১৩২৫; নাসায়ী : সুনানে কুবরা : ৫৮৯২; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৩০৮)

সারকথা, যারা দুর্বল ধার্মিক এবং যাদের দৃষ্টিতে জাগতিক সামগ্রীর কদর আছে, তারা বিচারকের পদ থেকে দূরে থাকবে। যদি শাসনকর্তা অত্যাচারী হয় এবং জানা থাকে যে, বিচারককে তার মর্জি মেনে চলতে হবে, তবে কোনোক্রমেই বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ হয়ে যায়, তবে তার কর্তব্য হবে বিচারকার্যে শাসনকর্তাকে সর্বসাধারণের মতো গণ্য করা। এক্ষেত্রে পদচ্যুতির অজুহাত মোটেই কল্যাণকর নয়। ন্যায়ানুগ বিচারকার্যের কারণে যদি বিচারক পদচ্যুতও হয়ে যায়, তবে এজন্য আনন্দিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তাআলা বিপদ দূর করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি পদচ্যুতিকে অসহনীয় মনে করে শাসনকর্তার মর্জি অনুযায়ী ন্যায়বিচার না করে এবং এতে কোনো দোষ না দেখে, তবে এরূপ বিচারক খেয়াল-খুশীর অনুসারী ও শয়তানের দোসর বলে গণ্য হবে। এমতাবস্তায় সওয়াবের আশা করা দূরের কথা, সে জালেমদের তালিকাভুক্ত হয়ে দোযখের নিম্নস্তরে স্থান পাবে।

এমনিভাবে ওয়াজ নসিহত, দরস তাদরিস ফতওয়া দান, হাদিস বর্ণনা করন, হাদিসের গ্রহণযোগ্য সনদসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও জমা করা, এর সবগুলোর বড় রকমের খ্যাতিপ্রীতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই এর বিপদও অনেক বড়। আমাদের সালাফে সালেহিন ফতওয়া প্রদান করা থেকে যথাসম্ভব নিজেকে বিরত রাখতেন। তারা বলেন, حَدَّثَنَا (অমুকের আমার

কাছে বর্ণনা করেছেন) এই বাক্যটি দুনিয়ালাভের প্রশস্ত একটি দুয়ার। কাজেই যে বললো حَدِّثْنَا প্রকারান্তে সে যেনো বললো, আমার জন্য স্থান খালি করে দাও। (বিশর ইবনে হারিসের বাণী কূতুল কুলূব : ১ : ১৩৫)

বিশর (র) অনেক হাদিস বর্ণনা না করে নিজের মধ্যে গোপন রাখেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, এভাবে হাদসি বর্ণনা করতে আমার মন সায় দেয় না। যদি মন মানতো তাহলে হাদিস বর্ণনা করতে আমার কোনো সমস্যা ছিলো না।

কোনো ওয়ায়েজ যখন ওয়াজ করেন, তখন তার কথা মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। তারা কাঁদে। ওয়াজের দিকে তখন শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট হতে থাকে। এসবের মধ্যে ওয়ায়েজ অন্য রকম স্বাদ খুঁজে পান। এ কারণে সে সবসময় মজাদার কথা বলতে থাকে, যা মানুষেরা পছন্দ করে। হোক সে কথা অসত্য। মানুষের অবোধগম্য বিষয়াবলি সে এড়িয়ে চলে। যদিও তা সত্য হোক। তখন ওয়ায়েজ নিজের সব চেষ্টা সাধনা লোকদের মন প্রভাবিত করার কাজে ব্যবহার করে। লোকদের মাঝে তার জনপ্রিয়তাই হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য বিষয়। তারা যখনই কোনো হাদিস পড়ে কিংবা কোনো প্রজ্ঞাময় বাণী সম্পর্কে অবগত হয় তার সাথে সাথে মনে হয়, ওয়াজের মধ্যে একই কথাটা বললে ভালো তো হয়।

সে সৌভাগ্যের সোপানে আরোহণ করেছে এই ভেবে তার আনন্দিত হওয়া উচিত। দীনের পথ সে আকড়ে আছে এই ভেবে খুশি হওয়া উচিত। তারপর বিষয়টিকে এভাবে ভাববে, যে কোনো বিষয়ের জ্ঞান আগে আমি অর্জন করবো। তারপর যদি দেখি এর দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করছেন। তখন সেটা আমি মুসলিম ভাইদের বলবো। যাতে তারা আমল করে এবং উপকার পায়। বিষয়টিও সেই একই হুকুমের আওতাধীন হবে।

কাজেই ওয়াজ নসিহত ও দরস তাদরিস দিয়ে যে মান সম্মান চায়, খ্যাতি চায়। ধর্ম বেচে পেট ভরাতে চায়, চায় অন্যের সাথে গর্ব করতে তার উচিত ওয়াজ নসিহত করা ছেড়ে দেওয়া। দরস তাদরিস থেকে অবসর নেওয়া। প্রভুর সন্তুষ্টির দিকে ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নফসের বিরোধীতা করে চলা। যাতে দীনের ছায়ায় থেকে আত্ম-শক্তি বেড়ে যায়। নিজেকে বিপম্মুক্ত রাখা যায়।

এরপর আবার এই কাজের সাথে ইচ্ছে হলে নিজেকে জড়াতে পারে।

কে বলতে পারে জ্ঞানীদের বিষয়ে এভাবে ফয়সালা দেওয়া মানব জগতসমূহকে বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাবে না। খ্যাতিপ্রীতির আশঙ্কায় আলেমরা জ্ঞানচর্চা দরুদ তাফসির, পঠন পাঠন ত্যাগ করলে সমগ্র পৃথিবী মূর্খতায় ভরে যাবে। তখন কি হবে?

এর উত্তরে আমি বলবো, রাসূলুল্লাহ (স) নেতৃত্ব চাইতে এবং নেতৃত্ব লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নিষেধ করতে বলেছেন, তোমরা নেতৃত্ব লাভের জন্য হাত বাড়িয়ে থেকো না। কারণ তা কেয়ামতের দিন লজ্জা ও আপসোসের কারণ হবে। তবে যোগ্য হওয়ার কারণে যদি কাউকে নেতৃত্ব দেওয়া হয় তাহলে তার কথা আলাদা (সহিহ বুখারী : ৭৪১৪৮; সহিহ মুসলিম : ১৮২৫)

এটা সর্বজনবীদিত যে, কোনো কারণে নেতৃত্ব অযোগ্য ব্যক্তির হাতে চলে গেলে দীন দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ, ঘটতে থাকে লড়াই ও হত্যাকাণ্ড। দেশ হয়ে পড়ে নিরাপত্তাহীন। হয়ে পড়ে জনশূন্য বিরাণ। জনজীবন হয়ে পড়ে স্থবির। তারপরও হাদিসে নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে?

এ কারণেই যখন ওমর (রা) দেখলেন, একদল লোক উবাই ইবনে কাবের অনুসরণ করছে, তখন তিনি বললেন, উবাই হলো মুসলিমদের নেতা। (আল আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী : ৪৭৬)

আর ওমর (রা) নিজে ওয়াজ করতেন, খুতবা দিতেন। নিজেকে কখনো এর থেকে বিরত রাখার কথা ভাবেননি।

একবার ফজরের নামাযের পর এক লোক ওমর (রা)-এর কাছে এসে ওয়াজ করার অনুমতি চাইলো। কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। লোকটা বললো, আপনি আমাকে নসিহত করার অনুমতিও দিচ্ছেন না। ওমর (রা) বললেন, আমার ভয় হচ্ছে তুমি হয়তো এতো পরিমাণ স্ফীত হয়ে যাবে যে, হতে পারে বৃহস্পতিতে পৌঁছে যাবে। (অনুরূপ অর্থে : জিয়া : আল মুখতারাহ : ১০৬; মুসনাদে আহমদ : ১ : ১৮)

ওমর (রা) এই লোককে ওয়াজ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, লোকটা খ্যাতি ও লোকদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য ওয়াজ করবে। আর আদালত ও খেলাফত এমন দুটি বিষয়, দরস তাদরিস ওয়াজ নসিহতের মতো দীন রক্ষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্বও

অপরিসীম। এগুলোর সবটার মধ্যেই রয়েছে স্বাদ ও বিপদের আশঙ্কা। কাজেই এ দুয়ের মাঝে ব্যাবধান খুবই কম।

পূর্বে আপত্তিকারী যে আপত্তি করেছে, খ্যাতি লাভের জন্য দরসদানকারীকে দরসদান থেকে অবসর নেওয়া উচিত। তার এ আপত্তি কার্যত ভিত্তিহীন।

বরং যদি মানুষকে ওই ইলম শেখা থেকে বিরত রাখার জন্য পায়ে শেকল বেধে জেল খানায় আটকে রাখা হয় যে ইলম দ্বারা লোকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ও নেতৃত্ব লাভ করা যায়, তাহলে মানুষ সব বাধা অতিক্রম করা হলেও লক্ষ্য পানে ছুটে যায়। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন তিনি এমন কিছু মানুষের দ্বারা এই দীনের সহায়তা করবেন, দীনের মধ্যে তাই লোকদের বিষয় নিয়ে ভেবে আমাদের মাথা নষ্ট করার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিপদমুক্ত রাখবেন। আমাদের উচিত নিজেকে নিয়ে ভাবা।

এরপর আমি বলবো, কোনো শহরে যদি অনেক ওয়ায়েজ থাকে তখন একজন ছাড়া বাকি সবাইকে ওয়াজ থেকে বিরত রাখা হবে। তা না হলে নিজের সম্মানের স্থান কেউ ত্যাগ করতে চায় না এটা সবারই জানার কথা।

আর যদি শহরে ওয়ায়েজ মোটে একজন, তবে তার আলোচনা দ্বারা মানুষেরা উপকার পায়। তার বলার ভঙি সুন্দর। তার বাহ্যিক বেশভূষাও সুন্দর। সে ওয়াজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। সে দুনিয়া লোভী নয়। দুনিয়ার বিষয়ে তার খুব বেশি আগ্রহ নেই, এমন ব্যক্তিকে ওয়াজ করা থেকে বিরত রাখা হবে না। বরং তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতে হবে—! তুমি ওয়াজ করো। সাথে সাথে নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা চালিয়ে যাও। সে যদি বলে, আমি নিজেকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

তাকে বলা হবে, তুমি চেষ্টা করতে থাকো, হাল ছেড়ো না এবং লোকদেরকে নসিহত করাও বন্ধ করো না। কারণ শহরে সে একমাত্র ওয়ায়েজ। সে ওয়াজ না করলে সাধারণ মানুষেরা অনেক ক্ষতির মুখোমুখি হবে।

কিন্তু শহরের একজন বক্তাই যদি এমন হয়, সে দুনিয়ার মোহ ও খ্যাতির লোভে পড়ে তাহলে তাকে ওয়াজ থেকে নিবৃত করা হবে না। কারণ ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে এখানে বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ রিয়া নিয়ে ওয়াজ করলে ওয়ায়েজ একাই ধ্বংসের দিকে চলে যাবে, আর যেহেতু সে শহরের একমাত্র বক্তা তাই সে ওয়াজ করা বন্ধ করে দিলে

শহরের অনেক মানুষ ক্ষতির শিকার হবে। বলা হবে, এই ওয়ায়েজের মতো ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ্য করেই হয়তো রাসুলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন "আল্লাহ এই দীনকে এমন কিছু ব্যক্তির দ্বারা সহায়তা করবেন দীনের বিষয়ে যাদের কোনো অংশ নেই। (সুনানে নাসায়ী : সুনানে কুবরা : ৮৮৩৪)

ওয়ায়েজের পরিচয়

ওয়ায়েজ হলেন এমন ব্যক্তি যে মানুষকে আখেরাতের দিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের ওয়ায়েজ যারা, তারা যেসব সাজানো কথা বলে, ছন্দবদ্ধ কবিতা আওড়ায়, যাতে না থাকে দীনের প্রতি শ্রদ্ধা, না থাকে মুসলিমদের সংশোধনের সদিচ্ছা। চিত্তাকর্ষী বিভিন্ন কথার মাধ্যমে তারা নিজেদের গুনাহের পাল্লাই শুধু ভারী করছে। দায়িত্বশীলদের উচিত দেশ থেকে তাদেরকে বিতাড়ন করা। কারণ তারা দাজ্জালের সহায়ক ও শয়তানের প্রতিনিধি।

কিছু ওয়ায়েজ আছে যাদের আলোচনা সুন্দর। বাহ্যিক বেশভূষাও মনোরম। তবে মনে মনে তার খ্যাতির লালসা ছাড়া আর কিছু নেই।

আগেই আমরা ওলামায়ে সূয়ের বিষয়ে শাস্তির ঘোষণা ও তার ফেতনা থেকে সতর্ক থাকার বিষয়ে "ইলম অধ্যায়ে" আলোচনা করেছি। ঈসা (আ) বলেন, "ওহে ওলামায়ে সূ...! তোমরা রোযা রাখো, জায়নামাযে সেজদা করো। অভাবীকে দান করো। তবে অন্যকে যা করতে বলো নিজে তার ধারে কাছেও যাওনা। নিজে যা জান না অন্যকে তা শেখাতে যেয়ো না। কতই না মন্দ তোমাদের এই মনোভাব। তোমরা মুখে তাওবার কথা বলো। মনে তাওবার আশা রাখো। কিন্তু কাজ করো প্রবৃত্তির চাহিদা মতো তোমাদের কি উচিত নয়, তোমাদের দেহ-মন থেকে ময়লা দূর করে পবিত্রতার মাঝে অবগাহন করা।

এমন ওলামায়ে সূ যারা তাদেরকে আমি বলবো। তোমরা চালনির মতো হয়ো না। যার মধ্যে দিলে ভালো আটা সব বের হয়ে যায়। থাকে শুধু ভূষিটুকু। এমনই তোমরা। মুখ থেকে তোমাদের ভালো কথা বের হয়ে কিন্তু মনে পড়ে থাকে একরাশ কালি, ময়লা।

ওহে দুনিয়াকামী, দুনিয়ার আগ্রহ যদি তোমার না ফুরায়, দুনিয়ার বাসনা থেকে যদি তুমি মুক্ত না হও, কি করে তুমি অনন্ত আখেরাতে কল্যাণের আশা করতে পারো?

আমি তোমাদের বলছি শোনো, তোমাদের কাজ দেখে তোমাদের অন্তর থেকে অশ্রু ঝরে। দুনিয়াকে পুরে রেখেছো জিহ্বার তলে। আর আমলকে ফেলে রেখেছো দুপায়ের নিচে।

তোমরা দুনিয়ার মেরামতে ব্যস্ত থেকে আখেরাতের গৃহকে বিরান করে ফেলছো। কারণ তোমাদের কাছে আখেরাতের চেয়ে দুনিয়া অনেক ভালো মনে হয়। সুন্দর মনোরম হয়। ভেবে দেখো, তোমরাই দুনিয়ার সবচেয়ে অধম মানুষ নও!! এটা বুঝতে পারলে কতইনা ভালো হতো? বিনাশ হোক তোমাদের। রাতভর জেগে জেগে তোমরা পথ হারাদের পথের দিশা দাও। অভিজাত পাড়ায় অবস্থান করো। যেনো তোমরা সব মানুষকে দুনিয়া বিমুখ করে দিয়ে সবটা পৃথিবী একাই দখল করার তালে আছো। কি নির্বোধ তোমরা! নিজের ঘর অন্ধকার রেখে অন্যের ঘরে প্রদীপ জালিয়ে রাখার কোনো ফায়দা নেই। তোমরা তো তাই করছো। মুখে ভালো কথার ফুল ঝুড়ি ছোটাচ্ছো আর মনের মধ্যে জমিয়ে রাখছো এত এত কদর্যতা।

হে পার্থিব জীবনের পূজারি! তোমরা মুত্তাকিদের মতো নও। নও স্বাধীন সম্মানি ব্যক্তিদের মতো। অচিরেই দুনিয়া তোমাদের কৃতকর্মকে তোমাদের মুখেই ছুড়ে মারবে। তারপর তোমাদের মাটিতে উপুড় করে ফেলবে। তারপর তোমাদের অপরাধসমূহ তোমাদের চুলোর ঝুটি ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকবে। আর ইলম তোমাদের এমন নিকৃষ্ট যাত্রার পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে মদদ জোগাবে। তারপর তোমাদের সোপর্দ করবে মহান আল্লাহ তাআলার সমীপে উলঙ্গ, নিঃসঙ্গ নগ্ন পদে। তিনি তোমাদের দাঁড় করাবেন তোমাদের অপরাধের সামনে এবং ঘোষণা করবেন তোমাদের মন্দ কর্মের প্রতিদান। (সাইয়েদুনা ঈসা (আ)-এর বাণী সংক্ষিপ্তরূপ। উল্লেখ করেছেন ইবনুল আসাফির : তারিখু দিমাশক : ৬৮ : ৫৯ ও ৪৭ : ৪ : ৪৬০)

হারিস মুহাসাবি (র) ঈসা (আ)-এর এই বাণী তার একটি কিতাবে উল্লেখ করে বলেন, এই হলো ওলামায়ে সূ। শয়তানের দোসর। মানুষের ঘাড়ের উপর চেপে বসা আপদ। তারা দুনিয়া কামাচ্ছে দু হাত ভরে। পেছনে ফেলে আসছে আখেরাতের বাসনা। দীনকে করছে অপছন্দ। এই পার্থিব জগতে তাদের দোষের কোনো শেষ নেই। আর আখেরাতেও তারা হবে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন।

প্রশ্ন আসতে পারে, এসব বিপদের বিষয়গুলো সবার সামনে স্পষ্ট কিন্তু তবুও তো ইলম ও ওয়াজের দিকে উৎসাহী করে বিপুল সংখ্যক বাণী বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দুনিয়ার সব সম্পদ লাভ করার চেয়ে তোমার মাধ্যমে একজন লোক হেদায়েতের পথে আসা আমার পক্ষে বেশি উপকারী। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১৩৭৫; সহিহ বুখারী : ৩৭০১; সহিহ মুসলিম : ২৪০৬)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোনো হেদায়েতের দিকে আহ্বানকারীর দাওয়াত শুনে মানুষ যদি সৎপথের অনুসরণ করে তাহলে সে দাওয়াত দেওয়ার সাওয়াবের সাথে সাথে অন্যদের অনুসরণের সাওয়াবও পাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ২০৫)

এমন আরও অনেক হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। ইলম ও ওয়াজের ফযিলত সম্পর্কে। তাই আমাদের উচিত হবে এমন কথা বলা, তুমি ইলম অন্বেষণ করো। কিন্তু রিয়ার আচরণ ত্যাগ করো। যেমনটা বলা হয় নামাযের মধ্যে রিয়ার অনুভূতি হওয়া ব্যক্তিকে নামায পড়া ছেড়ো না। তবে চেষ্টা করো রিয়ামুক্তভাবে নামায আদায় করতে।

উত্তর : ইলমের ফযিলত অনেক। ইলমের মধ্যে বিপদও অনেক। যেমনটা রয়েছে খেলাফত ও ইমারাতের দায়িত্বের মধ্যে।

আমরা কোনো মানুষকে বলি না, ইলম অন্বেষণ ছেড়ে দাও। কারণ মূলগতভাবে ইলমের মধ্যে কোনো বিপদ নেই। বরং ইলম মন্দ হয়ে যায় তার প্রকাশ ভঙ্গিতে। দরুস তাদরিস, ওয়াজ নসিহত কিংবা হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে। আর আমরা এটাও বলি না যে, যতক্ষণ তোমার মন রিয়ার দিকে আকর্ষিত হয় ততদিন তুমি ইলমের শিক্ষা বন্ধ রাখো।

কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে ইলম শিখতে এসেছে রিয়ার কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাহলে ইলম জাহির না করাই তার জন্য সবদিক থেকে উত্তম। তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য যদি কেউ নফল নামায পড়তে দাঁড়ায় তাহলে নফল পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

আর নামাযের মাঝখানে যদি সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওয়াসওয়াসার শিকার হয়, তাহলে সে নামায ছেড়ে দেবে না। কারণ ইবাদতের মধ্যে রিয়ার কারণে আপতিত বিপদ দুর্বল হয় যা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিরূপ রূপ ধারণ করে

থাকে। আর জ্ঞানের বড়পদ লাভের জন্য প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হওয়ার বিপদও কোনো অংশে কম নয়।

আমরা সামগ্রিকভাবে বলতে পারি এখানে স্তর তিনটি—

১. নেতৃত্বলাভ। এর মধ্যে বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশি। তাই সালাফের অনেক মহান ব্যক্তি নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

২. সালাত সিয়াম হজ যুদ্ধ। দুর্বল হোক কিংবা সবল, সালাফের সব ব্যক্তিই এসব আমল করেছেন। বিপদ আপতিত হওয়ার ভয়ে কেউ এসব আমল তরক করতেন না। কারণ এসব ইবাদতের অভ্যন্তরীণ বিপদ অনেক কম এবং ন্যূনতম শক্তি দিয়েও এই রিয়াকে দূর করে দিয়ে আমলকে আল্লাহর জন্য পরিশুদ্ধ রাখা যায়।

৩. উপরিউক্ত দুটি বিষয়ে মধ্যবর্তী একটি বিষয় হলো ওয়াজ নসিহত, দরস তাদরিস ও হাদিস বর্ণনার পদ লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া।

আর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও শক্তিমানদের সামনে এগিয়ে আসা উচিত। এর মধ্যে দুর্বলদের কোনো স্থান নেই। আর এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থায় রয়েছে ওয়াজ ও দরস তাদরিসের পদ লাভের বিষয়টি। যে ইলমের আফাতে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে সে জানে, এর সাথে নেতৃত্বের আদাতের অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে। সুতরাং যারা মানসিকভাবে দুর্বল তাদের জন্য ইলমের বিপদ আপদ থেকে সতর্ক থাকা একান্ত কাম্য।

আল্লাহ ভালো জানেন।

এখানে চতুর্থ আরেকটি স্তর রয়েছে। সেটা হলো সম্পদ একত্র করে দরিদ্রদের দান করা। কারণ হতে পারে সে অন্যের প্রশংসা পাওয়ার জন্য প্রকাশ্যে দান করে। আর অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে পারার মধ্যেও রয়েছে অপার্থিব এক ধরনের স্বাদ। ফলে এতেও লৌকিকতার আশঙ্কা কোনো অংশে কম নয়।

এ কারণে হাসান বসরি (র)-কে যখন প্রশ্ন করা হলো, দুজন ব্যক্তি, একজন যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই উপার্জন করে পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য খরচ করে। আর অন্য জন অতিরিক্ত অংশ দান করে। এদের মধ্যে কে উত্তম! এই প্রশ্নের জবাবে হাসান বসরি (র) বলেন, যে নিজের প্রয়োজন মতো উপার্জন করে (আর রিআয়া : ২৩৭)

হাসান বসরি (র) যে দান করে না তাকে বেশি ভালো বলেছেন, কারণ দুনিয়ার আপদ থেকে নিরাপদ থাকা সবার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

আর দুনিয়াবিমুখতার মূল অংশই হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য দুনিয়াকে ত্যাগ করা।

আবু দারদা (রা) বলেন, 'দামেশকের মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পঞ্চাশটি দিনার দান করা আমাকে আনন্দ দেয়। আমি ব্যবসা বাণিজ্যকে আরাম বলি না। তবে আমি সে লোকদের একজন হতে চাই ব্যবসা বাণিজ্য যাদের আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দেয় না। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ৮৪৭)

এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম উন্মুক্ত মতানৈক্য করেছেন। একদল বলেছেন, ঘরের কোণে বসে একা একা ইবাদত করার চেয়ে ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করে অন্যকে দান করা আমাদের কাছে বেশি ফযিলতপূর্ণ মনে হয়।

অন্যদল মত পেশ করেন, সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকা উত্তম। আর দান করা বা দান গ্রহণ মানুষকে আল্লাহর যিকির থেকে বিরত রাখে।

ঈসা (আ) বলেন, হে মানুষ, দুনিয়া থেকে মুক্তি পেতে যে দুনিয়ার পেছনে ছুটছো, দুনিয়া ত্যাগ করাই তোমার জন্য সহজ উপায়। (ইবনু আবিদ দুনাইয়া : যান্মুদ দুনইয়া) তিনি বলেন, দুনিয়ার পেছনে ছোটার ন্যূনতম ক্ষতি হলো, ব্যবসা বাণিজ্য দেখভাল করতে গিয়ে সে কিছু সময়ের জন্য হলেও আল্লাহকে ভুলে থাকে। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে মহান কোনো ইবাদত নেই।

এই তো যারা রিয়ামুক্ত তাদের ক্ষতির কথা আর যারা রিয়ার শিকার হয় তাদের জন্য দুনিয়াকে সর্বোতভাবে বিসর্জন দেয়াই হলো ন্যায়নিষ্ঠ কথা। সামগ্রিকভাবে বলা যায় সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত এমন সব বিষয় যা মনকে আরাম দেয়। প্রশান্ত করে এর সব কিছুই রিয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এখানে সবচেয়ে কষ্টকর বিষয় হলো কর্ম থেকে রিয়াকে দূরে রাখা।

এটা করতে সক্ষম না হলে নিজের বিষয়ে লক্ষ রাখবে, মুজাহাদা করবে, নিজের কাছে জানতে চাইবে কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা ভালো না, তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করবে। সর্বোপরি তাকে কাজ করতে হবে ইলমের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে। প্রবৃত্তির আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে নয়।

যে জিনিসকে সে মনের দিক থেকে হালকাভাবে নেবে সেই বস্তুই তার জন্য বেশি ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে। কারণ মানুষের নফস কখনো মন্দ ছাড়া ভালো কিছুর পরামর্শ দেয় না। খুব কম ক্ষেত্রে সে কল্যাণের দিকে ঝোঁকে। কখনো কখনো অবশ্য সে সত্যের কাছাকাছি যেতে পারে। আসলে এটা এমন বিষয় যার বিস্তারিত হুকুমের ক্ষেত্রে একে হালাল কিংবা হারাম স্পষ্টভাবে কোনো কিছুই বলা যায় না। বরং এর হুকুম দীনের বিষয়ে অন্তরের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করবে এবং কতটা কাজ সে সন্দেহ নিয়ে আর কতটা সন্দেহ ছাড়া করছে সেই ভিত্তিতে হুকুম প্রয়োগ হবে।

আগেই আমরা আলোচনা করেছি অনেক সময় মূর্খরা এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয়। তখন তারা সম্পদ নিজের কাছে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু রিয়া হতে পারে এই ভয়ে তারা খরচই করে না। এটা স্পষ্টতই কৃপণতা।

আর এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে, সম্পদ সদকা করা এমনকি বৈধ কাজে খরচ করা ও নিজের কুক্ষিগত করে রাখার চেয়ে উত্তম।

বরং বিতর্কের বিষয় এটা যে, যার উপার্জনের প্রয়োজন রয়েছে তার জন্য উত্তম কোনটা? কামাই করে দান করা নাকি আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকা? এটা এ কারণে যে, সম্পদ উপার্জন করতে গেলে অনেক বিপদের মোকাবিলা করতে হয়। আর হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদ নিজের কাছে না রেখে দান করে দেওয়াই উত্তম।

প্রশ্ন হতে পারে, কি আলামত দিয়ে আমরা চিনতে পারবো কোন আলেম তার ইলমের ব্যাপারে মুখলিস, কোন ওয়াজের মধ্যে ইখলাস রয়েছে?

উত্তর : কে মুখলিস আর কে মুখলিস নয় সেটা বোঝার জন্য তিনটি আলামত রয়েছে।

প্রথম আলামত : দেশে যদি এমন কোনো ওয়ায়েজ থাকে যে তার চেয়ে ভালো আলোচনা করে, যদি তার চেয়ে বেশি জ্ঞানবান কোনো আলেম সেখানে আসে আর সব মানুষ তাকে পছন্দ করছে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। এসব দেখে ও সে হিংসার আশ্রয় নেবে না। তবে হ্যাঁ, ঈর্ষা অর্থাৎ তার মতো ইলম নিজের জন্য কামনা করতে কোনো সমস্যা নেই।

দ্বিতীয় আলামত : বড় কোনো ব্যক্তি তার আলোচনার মজলিসে কিংবা দরস গাহে আসলে সে কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবেন না বরং

আলোচনার স্বাভাবিক গতি অব্যাহত রেখে সে মানুষ কুলের সবাইকে একই চোখে দেখে।

তৃতীয় আলামত : পথে ঘাটে কিংবা বাজারে লোকেরা তার সাথে সাথে আসুক বা তার পেছনে আসুক এটা সে চায় না।

মুখলিস মানুষ চেনার এছাড়াও আরও অনেক আলামত রয়েছে। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে মূল তিনটি আলামত মাত্র বিবৃত করা হলো।

সাইফ ইবনে আবু মারওয়ান বলেন, একদিন আমি হাসান বসরি (র)-এর পাশে বসে ছিলাম। মসজিদের দরজা দিয়ে তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রবেশ করে। তার সাথে প্রহরী। সে বসে আছে তুর্কি এক ঘোড়ার পিঠে। হাজ্জাজ ঘোড়া নিয়েই মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করে এদিক সেদিক তাকাতে শুরু করলো। মসজিদে সবচেয় লোকপূর্ণ ছিলো হাসান বসরি (র)-এর হালকা। হাজ্জাজ হাসান বসরি (র)-এর হালকার কাছে আসলো এবং নিতম্ব ঘুরিয়ে ঘোড়া থেকে নামলো তারপর হাসান বসরি (র)-এর কাছে গেলো। হাসান বসরি (র) হাজ্জাজকে আসতে দেখে মজলিসের এক পাশে সরে গেলেন।

সাইফ বলেন, আমিও কিছুটা সরে বসলাম। ফলে আমার আর হাসান বসরি (র)-এর মাঝখানে একজন ব্যক্তি বসার মতো জায়গা হলো।

হাজ্জাজ এসে। ফাঁকা জায়গাটুকুতে বসলেন। আর হাসান বসরি (র) অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক স্বরেই কথা বলে যাচ্ছিলেন তিনি এক বারের জন্যও কথা বলা বন্ধ করলেন না।

সাইফ বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, আজ আমি হাসান বসরি (র) কে পরীক্ষা করবো। দেখবো তিনি হাজ্জাজের নৈকট্য পাওয়ার জন্য তার পাশে বসে বেশি কথা বলেন, নাকি হাজ্জাজের আতঙ্কে তিনি বাক হারা হয়ে যান।

হাসান বসরি (র) প্রতিদিন যতটা কথা বলেন, আজ ঠিক ততটাই বললেন। দেখতে দেখতে তিনি শেষ কথার দিকে চলে এলেন এবং হাজ্জাজের বিষয়ে কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে তিনি কথা শেষ করলেন। তখন হাজ্জাজ নিজ হাত দিয়ে হাসান বসরি (র)-এর কাঁধে আঘাত করে বললেন, শায়খ সত্য কথাই বলেছেন। তোমাদের কর্তব্য হলো এমন আরও মজলিস গড়ে তোলা এবং একে তোমাদের চরিত্র ও অভ্যাসের অংশ করে নেওয়া।

কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটা বাণী আমার কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, জিকিরের মজলিস হলো জান্নাতের উদ্যান। (জামে তিরমিযী : ৩৫১০)

আমরা যদি রাজ্য শাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত না থাকতাম, আমরাই বেশি উপস্থিত হতাম এই মজলিসে। কারণ আমরা জানি কতটা তৎপর্যময় এসব মজলিস।

সাইফ বলেন, তারপর হাজ্জাজ সুন্দর করে হাসলো এবং এমন বালাগাতপূর্ণ কথা বললো হাসান বসরি (র)-সহ আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। কথা শেষ হলে সে চলে গেলো।

হাজ্জাজ চলে যাওয়ার পর হাসান বসরি (র)-এর মজলিসে শাম থেকে এক লোক এলো, এবং নিজের অসহায়ত্ব তুলে ধরে বললো, মুসলিম ভাইয়েরা, আমি অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। আমাকে দেখে তোমরা অবাক হয়ো না। আমাকে যুদ্ধে যেতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। সাথে নিতে বলা হয়েছে একটি ঘোড়া ও খচ্চর। আরও নিতে বলেছে তাঁবু। লোকেরা আমার কাছে তিনশত দিরহাম পাবে ঋণ বাবদ। আর আমার পরিবারে সাতটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। সে মনের সব অভিযোগ খুলে বললো, মজলিসের সবার মন আর্দ্র হয়ে উঠলো। হাসান বসরি (র) মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। বৃদ্ধ লোকটির কথা শেষ হলে তিনি বললেন, কি অবস্থা এসব লোকের! আল্লাহ তাদের মৃত্যুদান করুন। তারা আল্লাহর বান্দাদের মনে করে কেনা গোলাম। আল্লাহর সম্পদকে মনে করে বাপদাদার ভাণ্ডার। সামান্য দিনার দিরহামের কারণে লোকদের খুনে হাত রাঙায়। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামলে তারা চিকন তাঁবু নিয়ে যায়। দ্রুতগামী খচ্চর ছাড়া দু কদমও এগোতে পারে না। কিন্তু যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ লাগে তখন নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে গিয়ে যুদ্ধের উন্মাদনায় মেতে থাকে।

হাসান বসরি (র) এরপর শাসকগোষ্ঠীর খুব কড়া সমালোচনা করেন।

আমাদের মজলিসে শামের এক লোক উপস্থিত ছিলো। সে দৌড়ে গিয়ে হাজ্জাজের কাছে হাসান বসরি (র)-এর সমালোচনার বিষয়টি বলে দিলো, অল্পক্ষণের মধ্যেই হাসান বসরি (র)-এর কাছে হাজ্জাজের দূত আসলো। এবং বললো আমির (হাজ্জাজ বিন ইউসুফ) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।

হাসান বসরি (র) দূতের সাথে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন। ক্ষণিক আগে করা সমালোচনার কারণে আমরা হাসান বসরি (র)-এর জন্য মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

আমাদের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করে দিয়ে কিছুক্ষণ পর তিনি মজলিসে ফিরে এলেন। আর আমি কোনোদিন তাকে মুখ খুলে হাসতে দেখিনি। তিনি মৃদু হাসতেই ভালোবাসতনে। তিনি মজলিসে এসে নিজ স্থানে বসলেন এবং আমানতের গুরুত্বের বিষয়ে কথা বললেন, তিনি বললেন, তোমরা প্রত্যেকে যারা এই মজলিসে অবস্থান করছো তাদের সবাই খেয়ানতের সাথে বসবাস করছো। তোমরা মনে করে থাকো, খেয়ানত শুধু দিনার দিরহামের মধ্যেই হয়ে থাকে। না। খেয়ানত এতো সংক্ষিপ্ত কিছু নয়। বরং সবচেয়ে বড় খেয়ানত হলো আমাদের মজলিসে বসে আমাদের বিশ্বস্ততা অর্জন করে, আমাদের কথা শুনে তা অন্যের কর্ণগোচর করা। অন্য শব্দে বললে সবচেয়ে বড় খেয়ানত হলো আমাদের কথা অন্যদের কানে তুলে দিয়ে বিশ্বাসের বিনিময়ে আগুন খরিদ করা।

এই লোকটা আমাকে মাত্রই ডেকে নিয়ে বললো—

আপনি মুখে লাগাম পরান। কি বলছেন এসব? আপনি আমি ভাইদের সাথে একভাবে যুদ্ধ করি। ধর্মের বিষয়ে করি অন্যভাবে। আপনার জন্ম কোন ঘরে! মানুষকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন কেন? এ বিষয়ে আপনার কোনো উপদেশের দরকার আমাদের নেই। আপনার মুখে লাগাম পরিয়ে রাখুন।

হাসান বসরি (র) বলেন, এরপর আল্লাহ লোকটাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন।

একদিন হাসান বসরি (র) গাধার পিঠে চড়ে বাড়ির দিকে চলছিলেন। হঠাৎ দেখলেন একদল লোক তার পিছু পিছু আসছে। তিনি থেমে গেলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার? কোনো প্রয়োজন? না থাকলে চলে যাও। যে মানুষটি এমন চরিত্রবান হতে পারে কি মনে হয় সে কি কোনো দিন লোক দেখানো আমল করবে?

এই যে তিনটি আলামতের কথা বলা হলো এগুলো অন্তরের গোপন রহস্য উন্মোচন করে ফেলে। যখনই তুমি আলেমকে দেখবে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা না দেখিয়ে তাকে দেখছে হিংসার চোখে, বুঝে নেবে সে আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার সওদা করে ফেলেছে। তারাই হলো চূড়ান্ত ক্ষতির শিকার।

দয়াময়, আমাদের প্রতি দয়া করো।

অন্যকে দেখে নিজে আমল করার হুকুম

জেনে রাখা ভালো যে, পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের মধ্যে দুই রকমের চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। ঘরে তারা এক রকম থাকে লোকদের সাথে অন্য রকম।

তারা লোকদের সাথে যখন থাকে সারারাত জেগে ইবাদত করে। তা না পারলে অন্তত অর্ধরাত তো তারা ইবাদতে কাটায়ই। কিন্তু নিজ ঘরে তার অভ্যাস অন্য রকম। সেখানে ঘন্টা খানকের বেশি জায়নামাযে অবস্থান করে না। বরং লোকদের দেখলে সে আমলের প্রতি উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে। যাতে লোকরা একে নিজেদের দলের মনে করে। তাই সে স্বাভাবিক অভ্যাসের চেয়ে অধিক আমল করতে শুরু করে। কখনো কখনো এমন আমলেও লিপ্ত হয় জীবনে যা কোনো দিনই সে করেনি।

অন্য কোনো স্থানে গিয়ে যদি রোযাদার এক দলের সাথে সাক্ষাৎ করে তার মধ্যে রোযার প্রেরণা জেগে ওঠে। সে রোযা রাখে। একা থাকলে যা সে কোনো দিনই আদায় করতো না।

এদের আচরণও রিয়ার পর্যায়ে পড়ে। তাই অন্যের সাথে সমতা রক্ষা করতে গিয়ে আমল করতে প্রবৃত্ত না হওয়াই ভালো।

তবে এটা ব্যাপক কোনো হুকুম নয়। বরং এর বিশদ বিবরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কারণ মুমিন মাত্রই আল্লাহর ইবাদত করতে উদগ্রীব থাকে। সে নামায পড়তে চায়। রোযা রাখতে চায়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ব্যস্ততায় সে ইবাদত করতে পারে না। কিংবা মন নামানার কারণে বা উদাসীনতার কারণে তার পক্ষে আমল করা সম্ভব হয় না। ফলে অন্য কারও সাথে সাক্ষাৎ হলে তার মধ্য থেকে উদাসীনসতা দূর হয়ে যায়। কখনো কখনো তার ব্যস্ততা দূর হয়ে যায়। সে উদ্যমী হয়ে ওঠে।

কিন্তু বাড়িতে থাকলে সে তাহাজ্জুদ পড়তে পারে না। কখনো নরম বিছানায় বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকার কারণে, কখনো স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর কারণে। কখনো কখনো বাড়িতে থাকলে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে অনেক সময় কেটে যায়। বাড়িতে তাকে সন্তানদের সময় দিতে হয়, আয়ব্যায়ের হিসাব মেলাতে হয়।

কিন্তু সে যখন কোনো অচেনা স্থানে অবস্থান করে তার এসব কোনো ব্যস্ততা থাকে না। তখন সে মনকে কল্যাণমুখী করতে পারে অন্যকে নামাযে দাঁড়াতে দেখে সেও নামাযে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। দুনিয়ার মোহমায়া ভুলে আল্লাহর সমীপে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে। আর তার পাশের লোককে যখন সে দীর্ঘ রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে তখন সে বসে থাকতে পারবে না। সেও জায়নামাযে দাঁড়িয়ে খোদার কাছে নিজেকে সোপর্দ করবে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে প্রতিযোগিতা করে আল্লাহর ইবাদত করা যথেস্ট কস্টসাধ্য বিষয়। কিন্তু এখন অন্যকে দেখে মনে অনু প্রেরণা পাওয়ায় সে সহজেই কল্যাণের দিকে ছুটে যেতে পারছে। এ ক্ষেত্রে লোকটি রিয়াকার একথা বলা অনেক বড় ভুল হবে।

কখনো কখনো বিছানা পছন্দ না হওয়া বা অন্য কোনো কারণে সে ঘুমাতে পারে না। ব্যক্তি তখন এই ঘুমহীনতার সময়টাকে কাজে লাগায়। সে নামাযে দাঁড়িয়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

কিন্তু নিজ বাড়িতে সে এটা কখনোই করতে পারতো না। কখনো কখনো তার মনে হয় জীবনটা তো তাকে নিজ বাড়িতেই কাটাতে হবে। সেখানে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সময় পায় খুব কম। তাই আজকে পাওয়া সুযোগটাকে সে হাতছাড়া করতে চায় না। তখন সব বাধাকে পেছনে ফেলে সে জায়নামাযে নামাযের নিয়তে দাঁড়িয়ে যায়।

মানুষ যখন বাড়িঘরে থাকে তখন খাবার তার হাতের কাছেই থাকে। ইচ্ছা হলেই সে তা খেয়ে নিতে পারে। তাই বাড়িতে বসে রোযার নিয়ত করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে।

কিন্তু কোথাও যদি এসব খাবারের প্রাচুর্য না থাকে, আর থাকলেও তার হাতের বাইরে থাকে, তাহলে সে খুব সহজেই রোযা রাখতে পারবে। তখন ধর্মের আদেশ পালনের নিমিত্তেই সে রোযা রাখবে। কারণ প্রবৃত্তি সবসময় বিভিন্ন কারণ উপকারণ দেখিয়ে মানুষের মন থেকে দীনি উদ্দীপনা দূর করতে সচেস্ট হয়। তাই যেখানে প্রবৃত্তির পরাক্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তখন ধর্ম পালনের উদ্দীপনা প্রবল হয়ে উঠবে।

উপরের আলোচনার যে সুরতগুলো উপস্থাপন করা হলো তা মোটেও অবাস্তব কোনো বিষয় নয়। সেসব আমলের অনুপ্রেরণা দাতা হয়ে আমলকারী লোকদের দর্শন ও তাদের সাথে অবস্থান। তবুও শয়তান

মানুষের পিছু ছাড়ে না। আমল থেকে বিরত রাখার জন্য কানে কানে সে বলতেই থাকে লোকদের দেখে দেখে তুমি আমল করতে চাচ্ছো? বাড়িতে বসে যদি তুমি এমন কাজ না করে থাকো তাহলে তোমার স্বাভাবিক অভ্যাসের বাইরে গিয়ে নামায আদায়ের কোনো জরুরত নেই।

আমলকারী ব্যক্তির সঙ্গ, তার আমল পর্যবেক্ষণের সাথে ব্যক্তির কারণেও আমলে লিপ্ত হয় যে, সে হয়তো তাকে মন্দ বলবে। অলস ভাববে। তাদের চোখে সে খারাপ হয়ে যাবে। তখন ব্যক্তি নিজের মান বাঁচাতে নামায পড়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে শয়তান তার কানে মুখ লাগিয়ে বলে—

নামায পড়ো। বেশি বেশি নামায পড়তে থাকো। তুমি খালেস দিলে আল্লাহর জন্য ইবাদত করছো। কাউকে দেখানো তো তোমার উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া অন্যান্য দিন তোমার কতশত ব্যস্ততা থাকে। তাই নামাযে দাঁড়াতে পারো না। তাই আজ যেহেতু সুযোগ পেয়েছো নামায পড়ে নাও মন ভরে।

যারা অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখে, খোদার নূর যাদের দেখার চোখকে অনেক প্রশস্ত করে দিয়েছেন, তাদের কাছে এ বিষয়টি সহজ। তারা ছাড়া অন্যদের কাছে বিষয়টি খুব জটিল বলে মনে হয়।

তাই ব্যক্তি যখন বুঝতে পারবে, সে লৌকিকতার শিকার হয়ে নামাযে দাঁড়িয়েছে তখন সে স্বাভাবিক অভ্যাসের চেয়ে এক রাকাত বেশি নামায আদায় করবে না। কারণ এক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত কল্যাণ কর্ম দিয়ে মানুষের থেকে দু-চারটি ভালো কথা শোনার নিয়ত করে সে আল্লাহর নাফরমানির দিকে পা বাড়িয়েছে।

আর যদি বাধা ও ব্যস্ততা মুক্ত হওয়ার কারণে সে নামাযে দাঁড়ায় তাহলে তার নামায পড়ে যাওয়াই উত্তম।

কোনটা রিয়া আর কোনটা রিয়া না তা বোঝার উপায়

আমল করার পেছনে অনুপ্রেরণাদায়ক বস্তু কোনটি, রিয়া না ব্যস্ততা মুক্ত হওয়া এটা বোঝার একটা আলামত এখানে উল্লেখ করেছি—

ব্যক্তি এমন স্থানে নামাবে দাঁড়াবে যেখানে নামাযী ব্যক্তিরা তাকে দেখতে পাবে না। বরং উভয়ের মাঝে থাকবে আড়াল। এরপর মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, নামাযী লোকদের না দেখিয়ে ইবাদত করাটা কি তার মন স্বভাবিকভাবে নিয়েছে না অন্য কোনো ভাবনা মনে এসেছে?

তাদের না দেখার কারণে মন যদি স্বাভাবিক থাকে তাহলে তার উচিত নামায পড়তে থাকা। কারণ বাস্তবিকই সে নামায আদায় করতে চাচ্ছে। কাউকে দেখানো কারও চোখে ভালো সাজা তার উদ্দেশ্য নয়।

আর লোকদেরকে নিজের আমল না দেখাতে পারার কারণে যদি মনে কষ্টভাব আসে তাহলে তার বুঝতে হবে সে রিয়ার শিকার। কাজেই অভ্যাসের চেয়ে অতিরিক্ত নামায আদায় করা তার জন্য কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না।

এভাবেই মানুষ জুমার নামায আদায় করতে মসজিদে যায়। এক্ষেত্রে তার মনে এমন অনুপ্রেরণা কাজ করে যা তার মনে অন্য কোনোদিন থাকে না। হতে পারে মানুষের প্রশংসা পাওয়ার কারণে সে এদিন মসজিদে আসে। কিংবা মনের উপর চেপে বসা গাফলত ঝেড়ে ফেলে মন ভরা উৎসাহ নিয়ে সে আল্লাহর আদেশ পালনে ছুটে এসেছে।

তখন তার মনে অনুপ্রেরক কারণ হিসেবে থাকে ধর্মীয় আদেশ পালন। সাথে কম করে হলেও মানুষের মুখের প্রশংসা লাভের আকাঙ্খা যাকে। যখনই ব্যক্তির মনে হবে, সে ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইবাদতে আগ্রহী হয়েছে, তার উচিত মনে প্রশংসা লাভের ভাব আসলেও ইবাদত না ছাড়া। বরং সে প্রশংসা প্রীতিকে ঘৃণা দ্বারা প্রতিহত করে ইবাদতে মগ্ন থাকবে।

এমনিভাবে কেউ দেখলো, কোনো কারণে একদল লোক কাঁদছে। লোকদের কান্না দেখে তার মনে আল্লাহর ভয় বেড়ে গেলো। তার চোখ থেকে পানি ঝরতে শুরু করলো। এটা রিয়া নয়।

কিন্তু একা একা যদি সে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে চাইতো তাহলে তার চোখ থেকে কান্না ঝরতো না। কিন্তু লোকদের কান্না তার মন নরম করে ফেলেছে।

কখনো কখনো সে কাঁদতে পারে না। তখন সে কান্নার ভান করে। হয়তো লোক দেখাতে। অথবা সত্য মনে। কারণ মন কান্নায় ভেঙে পড়ে কিন্তু চোখ অশ্রু ঝরায় না। তখন তারা হৃদয় কঠোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে। তখন জোর করে তারা কান্নার ভান করে। এটা বহুলাংশে প্রশংসার দাবী রাখে।

সত্য কান্না বোঝা যাবে কখন সে কি সত্য ভয়ে কান্নার ভান করছে না লোক ভয়ে কাঁদছে সেটা বোঝার উপায় নিজেকে সে এমন স্থানে নিয়ে যাবে সাথের লোকেরা যাতে তার কান্না শুনতে পাবে কিন্তু তাকে দেখতে

পাবে না। দেখবে তার মনে কি ভাব আসে। তার চোখ থেকে পানি না ঝরার কারণে লোকদের নিন্দা শোনার ভয়ে যদি সে কান্নার ভান করে তাহলে তার না কাঁদাই ভালো। কারণ এতে রিয়া রয়েছে।

লুকমান (আ) পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন— মনে পাপাচারের ভাবনা নিয়ে মানুষের থেকে সম্মান পেতে তুমি নিজেকে আল্লাহভীরু প্রমাণ করতে যেয়ো না। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১৯২)

এমনই হুকুম হবে কুরআন তিলাওয়াত যিকির আযকার, কিংবা ওয়াজদের কোনো হালাতের সময় কান্না দীর্ঘশ্বাস ফোপানি ইত্যাদির।

কখনো কখনো এমন অবস্থা হয় সত্য দুঃখ, ভয়-অনুশোচনা ও আফসোসের কারণে। কখনো অন্যের এমন অবস্থায় নিজের অন্তরের কঠিনতা দেখে জোড় করে এমন আচরণ করে। এতে কোনো সমস্যা নেই। বরং এটা প্রশংসাযোগ্য কাজ।

কোনো কোনো মানুষ নিজেকে কান্না পীড়িত প্রমাণ করার জন্যও এমন আচরণ করে। আর নিছক কান্নাপীড়িত বলে প্রমাণ করাণ জন্য কান্নাকাটি করলে সে রিয়াকার বলে গণ্য হবে।

রিয়ার ভাব আসলেও সে যদি মন থেকে ঘৃণার মাধ্যমে তা দূর করে দেয় তাহলে বিপদ মুক্ত থাকতে পারবে।

আর রিয়ার ভাবনা যদি তার মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে থাকে তাহলে তার আমলের প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাবে। তার সাধনা বিনষ্ট হয়ে পড়বে। এর দ্বারা যেনো সে আল্লাহর অসন্তুষ্টিই খরিদ করে নিলো।

মানুষের চোখ থেকে কখনো কখনো দুঃখবোধেও কান্না ঝরে। কখনো উঁচু হয় কান্নার আওয়াজ, এটা ঠিকনয়, এতে রিয়া প্রকাশ পায়। রিয়ার নিয়তে শুরু করা আমলের মতোই হবে এর হুকুম।

কখনো বান্দার মনে এমন ভয় চলে আসে যে, সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। তার চোখ থেকে কান্না ঝরে আওয়াজও বের হয়। কিন্তু এর আগেই সে রিয়ার আক্রমণের স্বীকার হয়। রিয়ার কারণে কান্নাকে আরও দুঃখময় করে তোলে। আওয়াজ করে ওঠে। চোখে মুখে অশ্রুর ছাপ লাগিয়ে ফেলে।

কখনো কখনো মানুষ যিকিরের মজলিসে উপস্থিত হয়। তখন আল্লাহর ভয়ে তার অঙ্গ শিথিল হয়ে যায়, সে ভূপাতিত হয়। এরপর লজ্জা পেয়ে

সে ভাবে এখন তো মানুষ ভাববে সে বুদ্ধিলোপ কিংবা ওয়াজদের কঠিন কোনো অবস্থায় না পৌঁছে ও ভূপাতিত হলো। এই ভেবে সে ওয়াজদের ভান করতে শুরু করলো; যাতে লোকেরা বুঝতে পারে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সে পড়ে গেছে।

প্রথম অবস্থায় সে সত্য আসলেই পড়ে গিয়েছিলো। তবে দ্রুতই তার নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসে। সে ভাবে, তার ওয়াজদের হালতটা তো কারও কাছে প্রমাণিত হবে না। আকাশে চমকানো বিদ্যুতের মতো মুহূর্তেই যেনো সব মিলিয়ে গেলো। তার উচিত হবে আরও কিছুক্ষণ অঙ্গভঙ্গি করে সবার সামনে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করা। তাই সে লোক দেখানোর জন্য অঙ্গাভঙ্গি চালিয়ে যেতে থাকে।

ঠিক একই অবস্থা হয় অঙ্গ শিথিল হয়ে ভূপাতিত ব্যক্তির। সে দুর্বল হয় ঠিকই। কিন্তু খুব দ্রুত সে শক্তি ফিরে পায়। কিন্তু সে ঠিক হয়ে বসে না। পাছে লোকেরা আবার ভেবে বসে, তার "গাশইয়া" (অবস্থা) ঠিক ছিলো না। কারণ এত অল্প দুর্বলতা দিয়ে এটা প্রমাণ করা যায় না। তাই ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা দেখানোর জন্য অন্যের সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকে। হেলে দুলে হাঁটে। ছোটো ছোটো পা ফেলে।

উপরে যেসব ভান ও তাকাল্লুফের কথা বলে আসলাম এর সবগুলোই শয়তানের চক্রান্ত ও নফসের আসক্তি। কারও মনে যদি এমন কোনো ভাবনা আসে তাহলে এর প্রতিকার করতে হবে এভাবে—

মনে মনে ভাবতে হবে যে, মানুষ যদি তার কপটতা ধরে ফেলে এবং তার অন্তরের কথামালা সম্পর্কে অবগত হতে পারে তাহলে তাকে ঘৃণা করবে। আর আল্লাহ সবার অন্তরের বিষয়ে অবগত। তিনি আরও বেশি ক্রোধান্বিত হবেন।

একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, জুননূন মিসরি (র)-এর সম্পর্কে। একবার তিনি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তখন তার সাথে অন্য এক ব্যক্তি একই কাজ করলো কিন্তু তার মধ্যে ভানের চিহ্ন দেখা গেলো।

জুননূন মিসরি (র) বললেন, ওহে শায়খ— الَّذِيْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ (তুমি যখন দাঁড়াও তিনি তোমাকে দেখেন) (সূরা নমল : ২১৮)

একথা শুনে লোকটি বসে পড়লো। (আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যা : ৫৫২)

এগুলো সবই মুনাফেকি কর্ম। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নিফাক ও কপটতার বিনয়াবস্থা থেকে তোমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১৪৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬৫৬৮)

নেফাকের বিনয়াবনতাবস্থার অর্থ হলো— মনে শ্রদ্ধার বোধ না নিয়ে শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে বিনয়ের ভাব করা। (আর রিআয়া : ৩০২)

এভাবেই সন্দেহপূর্ণ অন্য একটি বিষয় হলো আজাব ও গজব থেকে করা। কারণ এটা কখনো কখনো ভয়ের ভাবনা, গুনাহের স্মরণ ও গুনাহের কারণে লজ্জিত হয়েও করা হয়। আর কখনো করা হয় লোক দেখানোর জন্য।

মানব মনের এই যে বিচিত্র কল্পনা এটা বিপরীত, সমার্থক ও কাছাকাছি বস্তুতে হয়ে থাকে। কাছাকাছি অবস্থানের কারণে এটা হয়ে থাকে ধোঁয়াশা পূর্ণ।

কাজেই মনের ভাবনাগুলোকে তুমি ভাবনার কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করো। তোমার মনে কেমন ভাবনা এলো? ভাবনার উৎস কোথায়? সব দিক বিবেচনায় ভাবনাটাই যদি আল্লাহর জন্য খালেস হয় তাহলে আমল করে যেতে হবে। সাথে সাথে সতর্কও থাকতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে পিপড়ার পদছাপের মত ক্ষুদ্র রিয়াও যেনো মনে থেকে না যায়। ভাবতে হবে, শঙ্কায় থাকতে হবে আমার করা আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কি হচ্ছে না। কারণ ঠিক কতটা ইখলাসের সাথে তুমি ইবাদত করতে পেরেছো তা নিয়ে ভাববার অবকাশ থেকেই যায়। আর এতে পরিশ্রম ও অনেক।

তোমার মনে যদি রিয়ার সামান্য ভাবনাও আসে তাহলে চিন্তা করো, আল্লাহ তোমার আমল সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, তার ক্রোধ যে কোনো সময় তোমার উপর বর্ষিত হতে পারে। স্মরণ করো তিন ব্যক্তির কথা যারা আইউব (আ)-কে প্রমাণ দেখিয়ে বলেছিলো—

প্রথমজন : হে আইউব! তুমি কি জানো যে, বান্দা নিজেকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে যে আমল করে সেটা বরবাদ হয়ে যাবে। প্রতিদান পাবে শুধু গোপন বিষয়াবলির বিবেচনায়। (আর রিআয়া : ৩০৩)

দ্বিতীয়জন : আমি আপনাকে ভয় করি আর আমার উপর ক্রুদ্ধ লোকদের এমন বিষয় দেখা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।

তৃতীয়জন : হে আইউব! রহমানের কাছে প্রয়োজন তলব করার ক্ষেত্রে যারা বাহ্যিক দিককে পরিপাটি রেখে অভ্যন্তরের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন থাকে তাদের মুখাবয়ব কালো হয়ে যাবে।

আলী ইবনে হুসাইন (রা) দুআ করতেন এভাবে—

আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— আমার বাহ্যিক অবস্থা লোকদের চোখে চকচক করা থেকে, অভ্যন্তরীণ আমলসমূহ আমার কাছে মন্দ হওয়া থেকে। আশ্রয় চাই নফসের রিয়া থেকে। আপনি যে সম্পর্কে অবগত তা বিনষ্ট করে। লোকদের চোখে ভালো সাজা থেকে। গুনাহের বোঝা নিয়ে পার্থিব জগত ছেড়ে আসা থেকে। আশ্রয় চাই; ভালো কাজ করে মানুষের মন জয় করা থেকে। যা আমার উপর আপনার ক্রোধকে আবশ্যক করে।

রাব্বুল আলামিন এসব বিপদ থেকে আমাকে আপনার কাছে আশ্রয় দান কর। (আর রিআয়া : ৩০৩)

এই হলো রিয়ার বিপদ সম্পর্কে বলা কিছু কথা। এ থেকে বিরত থাকার লক্ষ্যে বান্দার উচিত অন্তরকে নিরিক্ষণে রাখা। হাদিসে বলা হয়েছে— إِنَّ الرِّيَاءَ سَبْعُوْنَ بَابًا রিয়ার সত্তরটি দরজা রয়েছে।

(হাফেজ ইরাকি (র) বলেন, হাদিসে الرياء নয়; আছে الريا শব্দটি। যেমন— ইবনে আদি : আল কামিল : ৬ : ৩৯১)

আর একটা অন্যটার চেয়েও বেশি প্রচ্ছন্ন থাকে। যার কতকটা পিঁপড়ার পদচ্ছাপের মতো। কিছু রিয়া তো আছে এর চেয়েও গোপন।

আর এগুলো সম্পর্কে অবগত হতে হলে চাই কঠিন ও কঠোর মুরাকাবা ও পর্যবেক্ষণ। অনেক সময় অনেক সাধনা করেও এমন রিয়ার নাগাল পাওয়া যায় না।

তাহলে অন্তরে দীর্ঘ অনুসন্ধান, নফসের পরীক্ষা ও রিয়ার ধোকা সম্পর্কে অবগত না হয়ে কি করে তার হাদিস পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।

ইবাদতের পূর্বাপর ও মাঝখানে মুরীদের কর্তব্য

নিজের ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার জানা নিয়েই মুরীদের সন্তুষ্ট থাকা চাই। মূলত, আল্লাহ তাআলার জানা নিয়ে সে-ই সন্তুষ্ট থাকে, যে শুধু আল্লাহকেই ভয় করে এবং তাঁর নিকটেই প্রতিদান আশা করে। যে লোক গাইরুল্লাহকে ভয় করে এবং তার নিকট আশা করে, সে তাকে নিজের ইবাদত সম্পর্কে অবহিত করতেও আগ্রহী হয়। কারও অবস্থা যদি এরকম হয় তবে তার উচিত জ্ঞান ও ঈমানের কারণে মনে মনে এর ঘৃণা করা।

কেননা, এ জন্য আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির ভয় আছে। কেউ যখন কোনো ভারি ও কষ্টসাধ্য ইবাদত করে, যা সাধারণত অপরের দ্বারা হয় না, সে সময় নিজ নফসের হেফাজত করা একান্ত কর্তব্য। কারণ, এ ধরনের ইবাদত অন্যের নিকট প্রকাশ করে দিতে নফ্স সর্বান্তকরণে আগ্রহী থাকে। নফস বলে, তোমার এই বড় ইবাদত ও মহান আল্লাহর ভীতি সম্পর্কে জনসাধারণ জানতে পারলে ভক্তির আতিশয্যে তারা তোমাকে সিজদা করতে আরম্ভ করবে। কারণ, তাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এরকম ইবাদত করতে পারে? এসব ক্ষেত্রে উচিত হচ্ছে, নিজের ইবাদতের মুকাবিলায় আখিরাতের মাহাত্ম্য ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতকে স্মরণ করা। তার আরও ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে বান্দার নিকট থেকে প্রশংসা কুড়ানোর মধ্যে আল্লাহর শাস্তি ও ক্ষোভ আছে। ইবাদত প্রকাশ করা অন্যের নিকট ভালো হলেও আল্লাহ তাআলার নিকট অবনতি ও আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ। এই মনে করে তার আশাহত হওয়া উচিত নয় যে, ইখলাস বা মনোযোগিতা তো বড়দের কাজ। যারা বিভিন্ন ধরনের আমল করে, তারা এই মর্যাদা পাবে কোথায়? বরং তার জানা উচিত যে, যারা মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু, তাদের চেয়ে যারা মুত্তাকী নয়, ইখলাসের প্রয়োজনীয়তা তাদের আরও বেশি দরকার। কারণ, মুত্তাকীদের যদি নফল ইবাদত ছুটেও যায়, ফরয ইবাদত কিন্তু তাদের পূর্ণই থেকে যাবে। হ্যাঁ যারা মুত্তাকী নয়, তাদের তো ফরয ইবাদতও ত্রুটিপূর্ণ। তাদের নফল ইবাদত দ্বারা এই ত্রুটি পূর্ণ করা হবে। নফল ইবাদত যদি না হয়, তাহলে ফরয ইবাদত ত্রুটিপূর্ণই রয়ে যাবে। তামীমে দারী রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিস বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের সময় যদি ফরযে কোনো ধরনের ত্রুটি দেখা যায়, তাহলে হুকুম হবে, দেখ, তার কোনো নফল ইবাদত আছে কি না। থাকলে এর দ্বারা ফরযের ত্রুটি পূরণ করা হবে। অন্যথায় তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সুনানে আবু দাউদ : ৮৬৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৪২৬)

মিশ্র আমলকারীর ফরয ইবাদত কিয়ামাতে ত্রুটিযুক্ত হবে এবং গুনাহ অনেক হবে। নফল ইবাদতে ইখলাস ব্যতীত ফরযের ত্রুটি দূর করা এবং পাপের কাফফারা আদায় সম্ভব নয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত করার সময় এবং ইবাদত শেষ করার পরও অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকা চাই

এবং মানুষের নিকট ইবাদতকে প্রকাশ না করা চাই। এজন্য ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান থাকা কাম্য। এই সন্দেহ ও ভয় ইবাদতের সময় ও ইবাদতের পর হওয়া চাই প্রথম পর্যায়ে নিয়ত করার সময়ে নয়। বরং নিয়ত করার শুরুতে নিজের ইখলাস সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হতে হবে, যাতে ইবাদত সঠিক হয়। আরম্ভ করার পর যখন এতটুকু সময় চলে যায়, যাতে অসাবধানতা ও ভুল হতে পারে, তখন আশঙ্কা করা সংগত যে, এই অসাবধানতার মধ্যে সম্ভবত কোনো রিয়ার ছোঁয়া এসে গেছে, যাতে ইবাদত বরবাদ হয়ে যেতে পারে। তবে ইবাদত কবুল হওয়ার প্রবল আশা থাকা উচিত। কেননা, ইবাদতের মধ্যে ইখলাস অবশ্যই রয়েছে। তবে রিয়ার কারণে তা বাতিল হয়ে গেছে কিনা, এ ব্যাপারে সন্দিহান। নিশ্চিত বিষয়ের প্রবল আশা থাকতে হবে। এ বিষয়টি জানার ফলে মুনাজাত ও ইবাদতে খুব স্বাদ পাওয়া যায়। কেননা, ইখলাস তো নিশ্চিত এবং রিয়ার মধ্যে সন্দেহ। যে ব্যক্তি এই সন্দেহকেও ভয় করে, তার ভয় তাকে সংশোধনে অনুপ্রাণিত করে।

যে ব্যক্তি পরোপকার ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে, তারও নিজের জন্য সওয়াবের আশা করা উচিত। কেননা, যার উপকার করা হবে, তার মন তুষ্ট হবে এবং যাকে শিক্ষাদান করা হবে, সে শিক্ষা অনুযায়ী আমল করবে। এসব কাজে শুধু সওয়াবেরই আশা করা উচিত– কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান ও প্রশংসা কীর্তনের আশা করা উচিত নয়– যাকে শিক্ষাদান করা হয়, তার কাছ থেকেও নয় এবং যার উপকার করা হয়, তার কাছ থেকেও নয়। অন্যথায় আমল বিফলে যাবে। উদাহরণত যদি শিক্ষার্থীদের কাছে আশা করা হয়, শিক্ষাদানের বিনিময়ে সে আমার কাজকর্ম ও খেদমত করবে অথবা দল ভারি হওয়ার জন্য পথে আমার সঙ্গে চলবে, তবে বুঝতে হবে যে, সে তার মজুরি আদায় করে নিয়েছে। এ ছাড়া সে কোনো সওয়াব পাবে না। কিন্তু শিক্ষক যদি কোনো আশা না করে এবং শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে খেদমত করে, তবে আশা করা যায়, শিক্ষকের সওয়াব বাতিল হবে না। কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমগণ এ ধরনের খেদমতও নিতে আপত্তি করতেন। বর্ণিত আছে, এক আলেম কূপে পড়ে যান। তাকে কূপ থেকে টেনে তোলার জন্য লোকজন দৌড়ে এল এবং কূপের ভেতরে রশি ফেলল। কিন্তু তিনি কূপের মধ্য থেকে কসম দিলেন, যে ব্যক্তি তার

কাছে কোরআনের একটি আয়াতও শিক্ষা করেছে অথবা একটি হাদিসও শুনেছে, সে যেন এই রশি স্পর্শ না করে। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, এতটুকু খেদমত গ্রহণ করার কারণেও আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে।

শাকীক বালখী (র) বর্ণনা করেন, একদিন আমি সুফিয়ান সাওরীর নিকট একটি কাপড় উপহার হিসেবে পাঠালে তিনি তা গ্রহণ না করে ফেরত দিয়ে দিলেন। এরপর আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, হুযুর! আমি তো আপনার নিকট হাদিস পড়িনি। আপনি উপহারটি ফেরত দিলেন যে? সুফিয়ান সাওরী (র) বললেন, তুমি পড়নি ঠিক; কিন্তু তোমার ভাই তো পড়েছে। আমার ভয় হয়, এই উপহারের জন্য আমার অন্তর তার প্রতি অন্য শাগরিদের তুলনায় না আবার বেশি ঝুঁকে যায়! (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৭ : ৩)।

একবার এক লোক সুফিয়ানের খিদমতে একটি মুদ্রার ব্যাগ নিয়ে এলো। লোকটির বাবা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তার নিকট তার অবাধ আসা যাওয়া ছিল। লোকটি নিবেদন করল, আমার বাবা সম্পর্কে আপনার মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ আছে কি? তিনি বললেন, না। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। সে অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি ছিল। লোকটি বললো, আপনি জানেন যে, এই ব্যাগটি তারই রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আমার মালিকানায় এসেছে। সুতরাং আপনিও তা দ্বারা আপনার পরিবারের সামান্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করুন। একথা শুনে সুফিয়ান (র) ব্যাগটি নিয়ে নিলেন। কিন্তু লোকটি চলে যাওয়ার পর তিনি তার পুত্র মুবারককে ডেকে বললেন, জলদি যাও এবং লোকটিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। লোকটি আসলে তিনি বললেন, তুমি তোমার ব্যাগটি নিয়ে যাও। এরপর সে খুব পীড়াপীড়ি করল। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, লোকটির বাবার সঙ্গে তাঁর আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত ছিল। কাজেই তার সম্পদ থেকে কিছু নেওয়া পছন্দ করেননি। তাঁর ছেলে মুবারক বলেন, লোকটি তার ব্যাগ নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি চুপ থাকতে না পেরে বাবাকে বললাম, আপনার কি হলো? এই অল্প কিছু মুদ্রা আপনি ফিরিয়ে দিলেন কেন? আমাদের পরিবার-পরিজন এবং আপনার ভাইয়েরা রয়েছেন। আমাদের প্রতি আপনার কি মায়া-দয়া নেই? তিনি বললেন, মুবারক! আল্লাহকে ভয় করো। মজা করে খাবে তোমরা, আর এর দায় নিব আমি, এটা হতে পারে না। (আবুল আহকাম : হিলয়াতুল আউলিয়া : ৭ : ৩)

এ থেকে জানা গেল, আলেমের কাছ থেকে কেউ কোনো ফয়েয পেলে আলেম তার সওয়াব কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই আশা করবে। শিষ্যও সর্বদা আল্লাহর কাছেই সওয়াব ও মর্যাদা অন্বেষণ করবে। মাঝে মাঝে শিষ্য মনে করে যে, প্রকাশ্যে আল্লাহর ইবাদত করলে উস্তাদের মনে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং লেখাপড়া ভালো হবে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা, অন্যকে তুষ্ট করার নিয়তে আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষতি নগদ এবং লেখাপড়ার উপকার হওয়া-না হওয়া সন্দিগ্ধ ব্যাপার। সুতরাং নগদ আমলকে সন্দিগ্ধ উপকারের বিনিময়ে নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং শিষ্যের উচিত আল্লাহর জন্যই লেখাপড়া করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা এবং তাঁরই উস্তাদের খেদমত করা। তাহলে লেখাপড়াও ইবাদত বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে পিতামাতার সেবাও এই উদ্দেশ্যে করবে, পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। এই উদ্দেশ্য নয়, সেবা করলে তাদের অন্তরে আমার আসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

আর নীরবে নিভৃতে ইবাদতকারী যাহেদের উচিত, আল্লাহ তাআলার যিকিরে লিপ্ত থাকা, তার অন্তর যেন কখনোই মানুষের মাঝে পরিচিত ও সম্মানের প্রত্যাশা না করে। এটা তার অন্তরে রিয়ার বীজ বপন করে দেয়। ফলে তার কাছে নিভৃতে ইবাদতের গুরুত্ব কমে যায়।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম (র) বলেন, আমি সামআন নামক জনৈক পাদরি থেকে মারেফাতের দীক্ষা লাভ করেছি। একবার আমি তার ইবাদতখানায় গিয়ে বললাম, হে সামআন! আপনি কতদিন যাবত এখানে রয়েছেন? তিনি বললেন, সত্তর বছর। আমি বললাম, আপনার খাদ্য কী? তিনি বললেন, তা জেনে তোমার কী লাভ? আমি বললাম, জানতে ইচ্ছা করছে। তিনি বললেন, প্রতি রাতে আমি একটি ছোলাবুট খাই। আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনার অন্তরে এমন কী রয়েছে যে, একটি ছোলাবুট আপনার সারাদিনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়? তিনি বললেন, আমার ইবাদতখানার আশেপাশে যেসব লোকদেরকে দেখতে পাচ্ছো, তারা বছরে একদিন এখানে এসে এই ইবাদতখানাকে সুসজ্জিত করে। তারা আমাকে ওইদিন যথেষ্ট সম্মান করে। যখনই আমার ইবাদতের মাঝে সামান্য অনীহা অনুভূত হয় তখনই আমি ওই একদিনের সম্মানের কথা স্মরণ করি। ফলে ওই একদিনের সম্মানে আমার জন্য সারা বছর ইবাদত করা সহজ হয়ে যায়। আমি তোমাকে

উপদেশ দিচ্ছি তুমি চিরস্থায়ী সম্মানের আশায় সামান্য সময়ের কষ্ট মেনে নাও। সামআনের এই উপদেশ আমার জন্য ইলম ও মারেফাতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিল। এরপর তিনি বললেন, এতটুকুই নাকি আরও কিছু জানতে চাও? আমি বললাম, আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিন, তিনি বললেন, নিচে চলো। নিচে যাওয়ার পর তিনি আমাকে একটি থলে যাতে বিশটি ছোলাবুট ছিলো দিয়ে বললেন, অমুক গীর্জায় যাও। সেখানকার লোকেরা আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা দেখে ফেলছে। অতঃপর আমি সেখানে গেলে সেখানকার লোকেরা আমাকে বললো, সামআন তোমাকে কী দিয়েছে?

আমি বললাম, তার খাদ্য। তারা বললো, তুমি তা দিয়ে কী করবে? আমরা এর দাবিদার। আমি বললাম, আমি সেগুলোকে বিশ দীনারে বিক্রি করবো, তারা বিশ দীনার দিয়ে সেগুলো নিয়ে নিলো। আমি সামআনের কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন, তুমি সেগুলো দিয়ে কী করেছো? আমি বললাম, বিশ দীনারে বিক্রি করেছি। তিনি বললেন, তুমি ভুল করছো। তুমি বিশ হাজার দীনার দাম চাইলেও তারা সেগুলো নিয়ে নিতো।

এই ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, যখন অন্তরে নিজের সম্মান ও মর্যাদা অনুভব করে তখন তা তাকে তার অজান্তেই নিভৃতচারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। এর থেকে নিরাপদ থাকার আলামত হলো, আবেদের দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রাণিকুল বরাবর হয়ে যাওয়া। মানুষ যদি তার আকীদার বিপরীত আকীদা পোষণ করে তাহলে ভেঙে পড়বে না। যদি অন্তরে সামান্য পরিমাণ সংকীর্ণতাও অনুভূত হয় তাহলে বিবেক-বুদ্ধি ও ঈমান দ্বারা তা প্রতিহত করবে। মানুষ তার ইবাদত সম্পর্কে জেনে গেলেও তা যেন তার খুশুর মাঝে বৃদ্ধি না ঘটায় ও তাকে আনন্দিত না করে। যদি এতে সামান্য পরিমাণ আনন্দও অনুভূত হয় তাহলে তা তার দুর্বল আবেদ হওয়ার প্রমাণ। কিন্তু যদি সে ঈমান ও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা তা প্রতিহত করতে সমর্থ হয় এবং প্রতিহত করার প্রতি অগ্রসরও হয় তাহলে আশা করা যায়, তার এই প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না। মানুষ যখন তাকে দেখবে তখন সে ইবাদতে খুশু ও একাগ্রতা বাড়িয়ে দিবে যেন তারা তার পাশে বসে সময় নষ্ট না করে। কিন্তু এতে ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ অনেক সময় অন্তরে একাগ্রতা প্রকাশের বাসনা সুপ্ত থাকে। ফলে সংযমতাকে বাহানা বানায়। তার সত্যবাদিতার

পরীক্ষা এভাবে করা যেতে পারে যে, নফসকে প্রশ্ন করা হবে যদি মানুষের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করাই তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেই উদ্দেশ্য তো দূরে চলে যাওয়ার দ্বারা বা অধিক পানাহার ও হাসি ঠাট্টা দ্বারাও অর্জিত হয়। তুমি কেন এসব পন্থা অবলম্বন করছো না? এই প্রশ্নের উত্তরে নফস যদি; ইবাদতকেই বেছে নেয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে, ইবাদত দ্বারা মানুষের মাঝে নিজের অবস্থান তৈরি করাই তার উদ্দেশ্য।

বস্তুত এসব থেকে কেবল ওই ব্যক্তিই বাঁচতে পারে যার অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব নেই এবং এটা ভেবে আমল করে যে, এই পৃথিবীতে তার আমল দেখার মতো কেউ নেই। ফলে মাখলুকের প্রতি তার অন্তর ধাবিত হয় না। ধাবিত হলেও তা এতো দুর্বল হয় যে, তা দমন করতে কষ্ট হয় না। এই ব্যাপারে সত্যবাদিতার আলামত হলো, যদি ধরে নেওয়া হয়। এই ব্যক্তির দুজন বন্ধু রয়েছে। তাদের একজন ধনী আর অপরজন দরিদ্র। এমতাবস্থায় সে যদি দরিদ্র বন্ধুর তুলনায় ধনী বন্ধুর আগমনে অধিক পুলক অনুভব করে তাহলে সে রিয়াকারী ও লোভী বলে প্রমাণিত হবে। তবে যদি দরিদ্র বন্ধুর তুলনায় ধনী বন্ধু অধিক জ্ঞানী ও মুত্তাকী হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কারণ পুলক অনুভূত হয় তার গুণাবলীর কারণে, ধনাঢ্যতার কারণে নয়।

বর্ণিত আছে, সুফিয়ান সাওরি (র)-এর মজলিসের মতো অন্য কোনো মজলিসে ধনীরা এতটা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতো না। তিনি ধনীদেরকে পেছনের কাতারে বসিয়ে দরিদ্রদেরকে সামনের কাতারে বসাতেন। এমনকি ধনীরা তার মজলিসে দরিদ্র হওয়া কামনা করতো। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ৩৬৫)

মোটকথা, ধনী ব্যক্তির সাথে যদি পূর্ব থেকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব থাকে অথবা তোমার ওপর ধনীর কোনো গুণ থাকে তাহলে তাকে সম্মান করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু অন্য কোনো দরিদ্র ব্যক্তিও যদি উপরিউক্ত গুণাবলিতে গুণান্বিত হয় তাহলে এ অবস্থায়ও ধনীর ওপর তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ আল্লাহর কাছে দরিদ্র ধনীর চেয়ে সম্মানিত। তারপরও যদি ধনীকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে তুমি লোভী ও রিয়াকারী বলে গণ্য হবে।

কেউ যদি ধনী দরিদ্র উভয়ের সাথে সমানভাবে ওঠাবসা করে, তার ব্যাপারে আশঙ্কা রয়েছে যে, সে দরিদ্রের তুলনায় ধনীর প্রতি বেশি বিনয়ী

হবে, ফলে সে লোভী ও রিয়াকারী বলে বিবেচিত হবে। একবার ইবনুস সাম্মাক (র) তার বাঁদিকে বলেছিলেন, আশ্চর্যের কথা! বাগদাদে এলেই আমার সামনে হেকমতের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়। উত্তরে বাঁদি বললো, লোভ-লালসা আপনার জবানকে বেগবান করে দেয়।

বাঁদিটি যথার্থই বলেছে। কারণ ধনী ব্যক্তির সামনে জবান যতটা দ্রুত চলে দরিদ্র ব্যক্তির সামনে ততোটা চলে না। এমনিভাবে ধনী ব্যক্তির সামনে যে বিনয়ীভাব আসে তা দরিদ্র ব্যক্তির সামনে আসে না।

বস্তুত রিয়ার ব্যাপারে শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও ধোঁকা এতো বেশি যা গণনা করা অসম্ভব। এগুলো থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত বাকি সবকিছু অন্তর থেকে বের করে দেওয়া। সারাজীবন জাহান্নামের ভয়ে তটস্থ থাকা, ওই বাদশাহর মতো হয়ে যাওয়া, দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতরাজি ও সুস্বাদু খাবারগুলো যার হাতের নাগালে, কিন্তু অসুস্থতার দরুন সে এসবের কিছুই ভোগ করতে পারছে না।

সে জানে যদি সে এসব নিয়ামতরাজি থেকে বিরত থাকতে পারে তাহলে তার আয়ু ও রাজত্বকাল দীর্ঘ হবে। ফলে সে চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করেও তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে, এভাবে নিয়মতান্ত্রিক চলার কারণে এক সময় সে সুস্থ হয়ে যায়। এরপর পুনরায় যদি নফস কখনো প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহলে আবারও তার সেই রোগ তার দেহে প্রবেশ করে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যায়।

আর যখন তিক্ত ওষুধ গ্রহণ তার জন্য দুঃসহ হয়ে দাঁড়ায় তখন সে সুস্থতার কথা চিন্তা করে যা তার রাজত্ব ও অন্যান্য নিয়ামতরাজি উপভোগের মাধ্যম। ফলে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ ও সুস্বাধু খাবার বর্জন তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

এমনিভাবে আখেরাত প্রত্যাশী মুমিন ব্যক্তিও আখেরাতকে বিনষ্টকারী যাবতীয় ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বিরত থাকে। অল্পেতুষ্ট থাকে, কৃশতা, শীর্ণতা, একাকীত্ব ও দুঃখ-কষ্টকে আপন করে নেয় এবং আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার ভয়ে ও তাঁর আযাব থেকে মুক্তি লাভের আশায় মাখলুকের সাথে ওঠাবসা ও চলাফেরা বন্ধ করে দেয়। ফলে পরিণাম সম্পর্কে জানা থাকার দরুন দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতরাজি থেকে দূরত্ব বজায় রাখা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। সে জানে যে, আল্লাহ তাআলা পরম

দয়ালু ও মহৎ। যারা তাঁর সন্তুষ্টির ওপর চলে তাদেরকে তিনি সাহায্য করেন, তাদের সাথে দয়া ও অনুগ্রহ সুলভ আচরণ করেন। তিনি চাইলে তাদেরকে সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু তা না করে তিনি তাদের সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরীক্ষা নেন।

বান্দা যখন দুঃখ-কষ্টকে আপন করে নেয় তখন আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ফলে সেই কষ্টের জীবন তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে আনুগত্যের প্রতি মহব্বত ঢেলে দেন। ফলে বান্দা আনুগত্যে এমন স্বাদ পায় যার সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামত ফিকে হয়ে যায়। তাকে প্রবৃত্তি দমনের ক্ষমতা দান করেন। কারণ সম্মানিত সত্তা কখনো কাউকে তাঁর দুয়ার থেকে খালি হাতে ফেরান না। বরং তিনি বলেন, যে আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একগজ পরিমাণ অগ্রসর হই।

আল্লাহ তাআলা বলেন, সৎ ও পুণ্যবান লোকেরা আমার সাক্ষাৎ প্রত্যাশী হয়। আর আমি তাদের চেয়েও তাদের সাক্ষাতের আরও বেশি প্রত্যাশী।

অতএব, প্রথমে বান্দা তার প্রচেষ্টা, সত্যবাদিতা ও ইখলাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। তবেই আল্লাহ তাআলা দয়া ও অনুগ্রহ নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হবেন।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনার নিন্দা

যেহেতু মানুষের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হচ্ছে সতর্কতা ও সচেতনতা আর দুর্ভাগ্যের মূল হচ্ছে প্রবঞ্চনা ও উদাসীনতা। মানুষের প্রতি ঈমান ও মারেফাত অপেক্ষা আল্লাহ তাআলার বড় কোনো নিয়ামত নেই এবং দূর দৃষ্টির আলোয় বক্ষের উন্মোচন ব্যতীত ঈমান ও মারেফাত অর্জনে কোনো পথ নেই এবং কুফর এবং আল্লাহর নাফরমানির চেয়ে বড় কোনো শাস্তি নেই। মূর্খতার অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া অন্তর মানুষকে কুফর ও আল্লাহর নাফরমানির দিকে আহ্বান করে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অন্তর দান করা হয়েছে, তার শানে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে—

كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ.

প্রদীপের ন্যায়, যাতে রয়েছে একটি বাতি, সেই বাতিটি একটি কাচের চিমনির মধ্যে রাখা। কাঁচের চিমনিটি একটি উজ্জ্বল তারকার ন্যায়, যা প্রজ্বলিত হয় পবিত্র যাইতুনের তেল থেকে, যা পূর্বমুখীও নয় পশ্চিমমুখীও নয়, অগ্নিসংযোগ না করলেও ধারণা করা হয় তার তেল আলো দিচ্ছে। নূরের উপর নূর। (সূরা নূর : ৩৫)

পক্ষান্তরে গাফেলদের অন্তরের অবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ.

অতল সমুদ্রের ন্যায় যাকে উদ্বেলিত করে ঢেউয়ের পর ঢেউ, যার উপরে ঘনমেঘ, এক অন্ধকারের উপর আরেক অন্ধকার, যখন সে হাত বের করে, তখন তা দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে নূর দান করেন না, তার কোনো নূর নেই। (সূরা নূর : ৪০)

আল্লাহ তাআলা বুদ্ধিমান লোকদের অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন আর প্রবঞ্চিত তারা যাদের আল্লাহ পথভ্রষ্ট করতে চান। তখন তিনি তাদের হৃদয়কে সংকীর্ণ করে দিতে চান। তারা মনের ইচ্ছাকে নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করে। আর যে এই পৃথিবীতে অন্ধ থাকবে। সে আখেরাতেও অন্ধ এবং অধিক পথভ্রষ্ট থাকবে। মোটকথা, বিভ্রান্তি সকল দুর্ভাগ্যের মূল এবং সকল প্রকার বিধ্বংসের সূত্র বিধায় এর সেসব পন্থা বর্ণনা করা খুবই জরুরি, যেগুলো দিয়ে এ বিভ্রান্তি খুব বেশি পরিমাণে এসে থাকে।

যাতে করে মানুষ সেগুলো জেনে সতর্ক হতে এবং বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং যে সকল বান্দা আল্লাহর তাওফিকে বিভ্রান্তি ও ফাসেদের পরিচয় জানতে পারে, তারা সেগুলো থেকে সতর্ক হয়ে যায় এবং বিচক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হয়।

আমরা এখন প্রতারণার শ্রেণি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবো। সাথে সাথে নাফরমান আলেম এবং সৎব্যাক্তিদের মধ্যে যারা প্রতারিত তাদের শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা করবো, যারা প্রতারণার বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে প্রতারিত হয়েছেন অথচ তার অভ্যন্তর কদর্যতায় পূর্ণ। তাদের প্রতারিত হওয়ার কারণও বর্ণনা করবো। যদিও এর কারণসমূহ অসংখ্য; কিন্তু কিছু উদাহরণ বর্ণনা করলে তা বোঝা সম্ভব। গাফেল ও বিভ্রান্তদের শ্রেণি যদিও অনেক। কিন্তু চারটি শ্রেণিতে সকলেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (১) আলেম, (২) আবেদ, (৩) সূফী এবং (৪) ধনী ব্যক্তি। এগুলোরও অনেক উপদল রয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তির কারণসমূহও বিভিন্নরূপ। যেমন— কোনো কোনো লোক ইসলামি শরীয়ত স্বীকৃতি দেয় না এমন কাজকে সৎকাজ বলে মনে করে। যেমন, অবৈধ পথে উপার্জিত ধনসম্পদ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে তাতে কারুকার্য করে এবং একে পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। কেউ এ ব্যাপারে পার্থক্য করে না যে, চেষ্টা-তদবীর নিজের জন্য করে, না আল্লাহর জন্যে করে। কেউ প্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে। কেউ কেউ ফরযের পরিবর্তে নফল কাজে ব্যস্ত থাকে।

কেউ আবার মূল বিষয় বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয়। যেমন, কেউ নামায দণ্ডায়মান অবস্থায় নামাযের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে হরফের মাখরাজ শুদ্ধ করণে অধিক মনোযোগী হয়।

নিচে আমরা বিভ্রান্তির নিন্দা ও স্বরূপ দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করার পর সর্বপ্রথম আলেম তথা শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্তি বর্ণনা করব।

বিভ্রান্তির নিন্দা ও প্রকৃতি

বিভ্রান্তির নিন্দার জন্যে নিম্নোক্ত দুটি আয়াতই যথেষ্ট।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

পার্থিবজীবন যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে এবং আল্লাহর ব্যাপারে, পথভ্রষ্ট শয়তান যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। (সূরা ফাতির : ৫)

وَ لٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফিতনায় ফেলেছ, তোমরা আমাদের অমঙ্গলের অপেক্ষা করেছ এবং সন্দেহ পোষণ করেছ। মোহ তোমাদেরকে আল্লাহর আদেশ (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে রেখেছে এবং পথভ্রষ্ট শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা হাদীদ : ১৪)

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ঘুম কতই না চমৎকার! কীভাবে তারা নির্বোধদের রাত্রিজাগরণ ও তাদের প্রচেষ্টাকে ছাড়িয়ে যায়! মুত্তাকী ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সামান্য পরিমাণ আমল প্রতারিত ব্যক্তিদের পৃথিবী পূর্ণ আমলের চেয়ে উত্তম। (আল-ইয়াকীন, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৮)

তিনি আরও বলেছেন বিচক্ষণ তো সে-ই, যে নিজেকে আল্লাহমুখী করেছে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করেছে, আর নির্বোধ তো সেই, যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসারী বানিয়েছে এরপরও সে আল্লাহর কাছে (ক্ষমার) আশা করে। (জামে তিরমিযী : ২৪৫৯)

মোটকথা, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও অজ্ঞতার নিন্দায় কুরআন ও হাদিসে যা কিছু বর্ণিত আছে, সবই প্রবঞ্চনার নিন্দার জন্যে দলিল। কেননা, প্রবঞ্চনাও একপ্রকার মূর্খতা।

বিভ্রান্তির প্রকৃতি হচ্ছে শয়তানের ধোঁকার কারণে এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যা মনের ইচ্ছা ও খাহেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং যে লোক কোনো উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কোনো মঙ্গলে বিশ্বাসী হয়, সে বিভ্রান্ত। অধিকাংশ মানুষই নিজের কল্যাণের ধারণা রাখে। অথচ তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। তবে কোনো কোনো মানুষের বিভ্রান্তি অন্যের তুলনায় স্পষ্টতর ও বেশ কঠিন হয়ে থাকে। এ বিভ্রান্তি দু'প্রকার— কাফেরদের বিভ্রান্তি ও গুনাহগারদের বিভ্রান্তি। কোনো কোনো কাফেরকে জাগতিকজীবন বিভ্রান্ত করে রেখেছে এবং অনেককে করেছে শয়তান। যারা জাগতিকজীবন দ্বারা বিভ্রান্ত, তারা বলে— নগদ বাকি থেকে উত্তম। পার্থিবজীবন নগদ এবং পরকাল বাকি। সুতরাং পার্থিবজীবনই ভালো এবং একেই গ্রহণ করা উচিত। তারা আরও বলে— দুনিয়া নিশ্চিত এবং পরকাল অনিশ্চিত। নিশ্চিত বিষয় অনিশ্চিত বিষয়ের তুলনায় উত্তম হয়ে থাকে। সংশয়ের কারণে নিশ্চিতকে ত্যাগ করা ঠিক নয়। এ ধরনের প্রমাণাদি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং শয়তানের প্রমাণাদির অনুরূপ। সে বলেছিল—

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ.

আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা, তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দ্বারা। (সূরা আরাফ : ১২)

এ ধরনের বিভ্রান্তির প্রতিকার দু'ভাবে সম্ভব। এক সত্যিকার ঈমান দ্বারা চিকিৎসা তা হলো আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করা—

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ.

তোমাদের নিকট যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে, তা অবিকল থাকবে। (সূরা : নাহল : ৯৬)

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى.

এবং আখিরাত উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী। (সূরা : আলা : ১৭)

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

দুনিয়ার জীবন তো বিভ্রান্তির সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا.

দুনিয়ার জীবন যেন তোমাকে গোমরাহ না করে। (সূরা ফাতির : ৫)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) যখন এসব আয়াতের বিষয়বস্তু অনেক কাফেরের চোখের সামনে পেশ করেন তখন তারা দেরি না করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং কোনো দলিল প্রমাণের অপেক্ষা করেনি। কেউ কেউ এসে নিবেদন করতো— আমরা আপনাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আসলেই কি আল্লাহ আপনাকে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন? জবাবে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। এরপরই তারা মুসলমান হয়ে যেত। সাধারণের এ ঈমান ছিল বিভ্রান্তির গন্ডির বাইরে। এটা এমন, যেমন কোনো শিশু মাতা পিতার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। যদিও কোনো কারণ জানা থাকে না।

যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে প্রতিবিধান হলো যেসব যুক্তির ভিত্তিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যুক্তি দ্বারাই সেগুলোকে খন্ডন করা। কেননা প্রত্যেক প্রতারিত ব্যক্তির প্রতারিত হওয়ার পিছনে একটি কারণ হবে। আর ওই কারতাটি হচ্ছে দলিল। আর দলিলই হচ্ছে মানুষের অন্তরে উত্থিত এক প্রকার মুক্তি, যা মানুষকে প্রশান্তি দান করে যেমন উপরে কাফেরদের একটি বিভ্রান্তিকর যুক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, পার্থিবজীবন নগদ এবং পরকাল বাকি। এ বাক্যটি নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু পরের কথাটি (অর্থাৎ নগদ বাকির চেয়ে উত্তম) সর্বাবস্থায় সত্য নয়। এতে ধোঁকা নিহিত। কেননা, নগদ ও বাকির পরিমাণ ও লক্ষ্যের মধ্যে সমান হলে কথা যদিও সত্য; কিন্তু যদি নগদ বাকির তুলনায় পরিমাণে কম হয়, তাহলে বাকিই উত্তম। একটু চিন্তা করে দেখুন, যে কাফেররা উপযুক্ত যুক্তি দেখায়, তারাই ব্যবসায়ে এক টাকা নগদ এজন্য বিনিয়োগ করে, যাতে দশ টাকা বাকি হাসিল করতে পারে। তখন তারা বলে না যে, বাকির চেয়ে নগদ উত্তম। সুতরাং বাকির আশায় নগদ এক টাকা নষ্ট করা ঠিক নয়। এমনিভাবে চিকিৎসক যদি রোগীকে উন্নত খাবার ও ফলমূল খেতে নিষেধ করে, তবে রোগ বৃদ্ধির ভয়ে তৎক্ষণাৎ সে তা বর্জন করে। অথচ এ সকল খাদ্যের স্বাদ নগদ এবং রোগ-যন্ত্রণা ভবিষ্যতে সইতে হবে। ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যত সুখের আশায় কত জায়গায় কত বিপদাপদের ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় কষ্ট করে থাকে এবং তখন কারও কল্পনায় একথা আসে না যে, নগদ বাকির চেয়ে উত্তম।

সারকথা, এখন পরবর্তী সময়ে যদি দশ টাকা পাওয়া যায়, তাহলে তা এক টাকা নগদের চেয়ে ভালো। এখন দুনিয়ার জীবন ও পরকালের জীবনকে তুলনা করলে দুনিয়ার জীবন শূন্য বলা যায়। যেমন— মানুষ বড় জোর একশ' বছর বাঁচে। এ বয়সকে যেমন দুনিয়ার বয়সের সাথে তুলনা করলে তা তার এক কোটি ভাগের এক ভাগও না। সুতরাং দুনিয়াতে কেউ এক বাদ দিলে পরকালে লাখ লাখ; বরং অগণিত পাবে। আর যদি পরকালের দিকে লক্ষ করা যায়, তাহলে দুনিয়ার আনন্দে সব ধরনের, কষ্ট ও বিপদ নিহিত থাকে। কিন্তু আখিরাতের আনন্দ, স্বচ্ছ ও পাক-পবিত্র। মোটকথা, নগদ বাকি থেকে উত্তম— এ কথাটিই ভুল ও প্রতারণা। এ ভুলের কারণ হচ্ছে শ্রুত কথায় বিশ্বাস করা এবং এটা চিন্তা না করা যে, নগদ বাকির চেয়ে ভালো তখন, যখন উভয়ের পরিমাণ ও উদ্দেশ্য এক হয়।

কাফেরদের আরও একটি যুক্তি হলো নিশ্চিত বিষয়। অর্থাৎ, দুনিয়া সন্দেহমুক্ত বিষয় তাই তা পরকালের চেয়ে উত্তম। এ যুক্তিটি প্রথমটির চেয়ে অধিকতর দুর্বল। কেননা, এর উভয় বাক্যই ভিত্তিহীন। যেমন, নিশ্চিত বিষয় সন্দেহযুক্ত বিষয়ের চেয়ে ভালো— এটা তখন সত্য, যখন উভয়টি এক হয়— অন্যথায় নয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, ব্যবসায়ীরা কষ্টের কথা জেনেই করে এবং তার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভটি থাকে সন্দেহযুক্ত। শিক্ষার্থী বিদ্যান্বেষণে নিশ্চিতই পরিশ্রম ও লেখাপড়া করে এবং তার কাঙ্ক্ষিত ডিগ্রী প্রাপ্তিটা সন্দিহান থাকে। শিকারি তার সফলতার ক্ষেত্রে সন্দিহান থেকেও তার শিকার অব্যাহত রাখে। এমনিভাবে রোগী ওষুধের তিক্ততা অবশ্যই অনুভব করে। তারপরও তার রোগ মুক্তির বিষয়টি থেকে যায় অনিশ্চিত। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সকলেই সন্দেহযুক্ত বিষয়ের জন্য নিশ্চিত বিষয়কে ত্যাগ করে। ব্যবসায়ী বলে, আমি যদি ব্যবসা না করি, তাহলে নিশ্চিতই দুঃখ-কষ্ট আছে এবং ভুখা থাকবো। ব্যবসায়ে পরিশ্রম কম এবং লাভ বেশি। রোগী বলে, ওষুধে তিক্ততা রোগের পরিণাম অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ের চেয়ে অনেক কম। অতএব যে লোক পরকালের ব্যাপারে সন্দেহই করে, তার বলা উচিত— জীবনের হিসাব-নিকাশ কয়েকটি দিন ধৈর্যধারণ করা আমার জন্য সেসব বিষয়ের চেয়ে উত্তম, যা পরকাল সম্পর্কে মানুষ বলে থাকে। কেননা, ধরে নেওয়া যাক, যদি পরকাল মিথ্যাই হয়, তবে এতে আমার ক্ষতি কি? জীবনের কয়েক দিনের বিলাসই তো নষ্ট হবে। জীবন লাভের পূর্বেও তো কতকাল চলে

গেছে, তখন আমি বিলাস করিনি। সুতরাং ধরে নেব, আমি অস্তিত্বই পাইনি। পক্ষান্তরে যদি পরকাল সত্য হয়ে যায়, তবে অনাদিকাল পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে, যা আমার সহ্য ক্ষমতার বাইরে।

হযরত আলী (রা) এক খোদাদ্রোহীকে বলেছিলেন, তুমি যা বলছ, তা সত্য হলে আমাদের উভয়ের কোনো ক্ষতি নেই। আর যদি আমার কথা সত্য হয়ে যায়, তবে আমি উপকৃত হব, আর তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। হযরত আলী (রা) এরূপ বলার কারণ এটা ছিল না যে, مَعَاذَ اللهِ তিনি পরকাল সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন; বরং আল্লাহদ্রোহীর বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার পরকাল অস্বীকার করা খুবই অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত।

কাফেরদের যুক্তির দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পরকাল সন্দেহযুক্ত। মূলত এটাও ভুল; বরং পরকাল ঈমানদারদের মতে সুনিশ্চিত। এর যুক্তি দুটি। (১) ঈমান, নবীর অনুকরণ। নবীর অনুসরণ করলে পরকাল সম্পর্কিত সকল বিভ্রান্তির অবসান হয়ে যায়। সাধারণের বিশ্বাস ও অধিকাংশ বিশিষ্টদের বিশ্বাস এমনি ধরনের। এটা এমন, যেমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি তার রোগের ওষুধ কী, তা সে জানে না। এরপর সকল চিকিৎসক এ বিষয়ে একমত হলো যে, এ রোগের ওষুধ অমুক বৃক্ষের মূল। এখন অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকদের মুখে এ কথা শোনামাত্রই নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেবে এবং তাদের নিকট এর কোনো দলিল চাইবে না। বরং তাদের কথা মেনে চলবে। এখন যদি কোনো নির্বোধ চিকিৎসকদের মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চায় তাহলে সে সেই নির্বোধের কথা গ্রহণ করবে না। কেননা সে জানে যে, চিকিৎসকগণ ওই নির্বোধের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। জ্ঞান ও মর্যাদায় তার চেয়ে অনেক ওপরে এবং তারা চিকিৎসাবিদ্যায়ও অভিজ্ঞ। বরং ওই নির্বোধ ব্যক্তিরই চিকিৎসা বিদ্যায় কোনো জ্ঞান নেই। এমতাবস্থায়, কোনো নির্বোধের কথায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের কথা অমান্য করা সমীচীন নয়। যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি কোনো নির্বোধের কথা বিশ্বাস করে চিকিৎসকের কথা অমান্য করে তাহলে সেও নির্বোধ ও প্রতারিত গণ্য হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ করবে, যারা আখেরাতকে স্বীকার করে এবং আখেরাত সংগঠিত হওয়ার কথা বলে এবং বলে, আখেরাতের সৌভাগ্য হাসিলের উপকারী ওষুধ হচ্ছে তাকওয়া তথা

আল্লাহভীতি। তখন সে জানতে পারবে যে, তাঁরা হলেন আল্লাহর সৃষ্টির উত্তম ব্যক্তিবর্গ। জ্ঞান, মারেফত ও অন্তর্দৃষ্টির উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। অর্থাৎ, নবী, অলী, হাকেম ও আলেমগণ। এসকল বিষয়ে মানুষ তাঁদেরই অনুসরণ করে থাকে। তবে সে সকল ব্যক্তির অন্তরে প্রবৃত্তি প্রধান্য বিস্তার করে এবং উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ করে না, তারা না প্রবৃত্তি অনুসরণ ত্যাগ করতে পারে, না তাদেরকে দোযখী বলা পছন্দ করে। এ কারণে তারা আখেরাতকে অস্বীকার এবং নবীদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে থাকে। সুতরাং যেমনিভাবে বিচক্ষণ রোগী কোনো শিশু বা নির্বোধের কথায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের ওপর অবিশ্বাস করে না, এমনিভাবে বিচক্ষণ মুমিন ব্যক্তি কোনো নির্বোধের কথায় নবী, অলী ও আলেমের কথার ওপর সন্দেহ করবে না।

পরকাল নিশ্চিত হওয়ার দ্বিতীয় যুক্তি নবীদের ক্ষেত্রে ওহি এবং অলিগণের ক্ষেত্রে ইলহাম। এমন ধারণা করা উচিত নয়, নবী কারীম (স) শুধু জিবরাঈলের নিকট থেকে শুনে পরকালে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। বরং নবীদের জন্য প্রত্যেক জিনিসের স্বরূপ হুবহু খুলে দেওয়া হয় এবং তাঁরা সেই স্বরূপকে অন্তরের দ্বারা এমনভাবে দেখে নেন, যেমন আমরা চর্মচক্ষু দ্বারা কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসকে দেখি। অতএব, তাঁরা যেসব খবর দেন, স্বচক্ষে দেখেই খবর দেন— শুধু শুনে দেন না। কেননা তাঁদের কাছে রূহের প্রকৃতি উন্মোচিত থাকে। আর রূহ হলো আল্লাহর আমর। এখানে আমর দ্বারা নাহি (নিষেধ) এর বিপরীত শব্দ উদ্দেশ্য নয়; কেননা ওই আমর হলো কালাম আর রূহ কালাম নয়। এমনিভাবে আমর দ্বারা কুরআনে বর্ণিত (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ) শান উদ্দেশ্য নয়। যদি তাই হয় তাহলে আমর অন্য সব সৃষ্টির মতো হয়ে যাবে। কিন্তু আমর আর সৃষ্টি এক নয়। রূহকে আমর বলা হলো কেন? প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, আলম (জগৎ) দুই প্রকার। আলমে আমর ও আলমে খালক। এ দুটি আল্লাহরই কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং শরীরি বস্তু যেমন, পরিমাপ, পরিমাণ ও সংখ্যা জাতীয় বস্তু আলমে খালকের অন্তর্ভুক্ত।

কেননা, শাব্দিক অর্থে খালক-এর অর্থ হলো, অনুমান করা আর যে সকল বিষয় পরিমাপ-পরিমাণ ও সংখ্যা থেকে মুক্ত সেগুলোই আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত। ওলামায়ে কেরাম একে রূহের রহস্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। যার

আলোচনার অনুমতি নেই। কেননা, এতে সাধারণ ব্যক্তিদের ক্ষতি হয়। যেমনিভাবে শবে কদর স্পষ্ট করা হয়নি। তেমনিভাবে রূহের রহস্যও প্রকাশ করা হয়নি। যে ব্যক্তি রূহের পরিচয় জানতে পারে এবং নিজের নফসকে চিনতে পারে, সে স্বীয় প্রভুর পরিচয় লাভ করতে পারে। আর যখন কেউ নফস ও প্রভুর পরিচয় লাভ করতে পারে তখন সে বুঝতে পারে রূহ তার প্রকৃতিগত দিক থেকে তার প্রভুর এক আমর বিশেষ। বস্তু জগতে তা এক আশ্চর্য বিষয়। এ কাজ তার প্রকৃতি বহির্ভূত; বরং তা এক আকস্মিক বিষয়। এমন এক আকস্মিক বিষয় হযরত আদম (আ)-এর সাথে সংঘটিত হয়েছিলে। যাকে আসিয়্যাত (অপরাধ) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যার কারণে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল।

অথচ তাঁর সত্তাগত দিক থেকে জান্নাতই ছিলো তাঁর উপযুক্ত কারণ, জান্নাত হলো আল্লাহর নৈকট্যের প্রকাশস্থল। আর আদম (আ) ছিলেন রূহের দিক থেকে তাঁর প্রভুর আমর বিশেষ। এ কারণে প্রভুর আমর আল্লাহর নৈকট্যের প্রকাশের দিকে ধাবিত হওয়াই স্বাভাকিক যদি কোনো আকস্মিক প্রতিবন্ধকতা না থাকে। যখন আলিমে খালকের কোনো আকস্মিক বিষয় মানুষকে তার স্বভাব দাবি থেকে ফিরিয়ে রাখে তখন মানুষ না নিজেকে চিনতে পারে না তার রবকে। আর এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদের আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো পাপাচারী। (সূরা হাশর : ১৯)

এখানে ফাসেক দ্বারা ওই সকল লোক উদ্দেশ্য, যারা স্বীয় স্বভাব দাবি থেকে দূরে সরে যায়। এটা এমন গুপ্ত রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত, যার ফুলের সুবাস কেবল আরেফগণই গ্রহণ করতে পারেন। কম হিম্মতের অধিকারীরা এ নূর গ্রহণে সক্ষম নয়। যেমন বাদুড় সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না।

অন্তরে আলমে মালাকুত (উর্ধ্বজগৎ)-এর বিষয় উন্মুক্ত হওয়াকে মারেফাত ও বেলায়াত বলে। যারা এ গুণে গুণান্বিত তাদেরকে আরেফ ও অলী বলা হয়। মারেফাত হলো নবীদের স্তরের সূচনা আর অলীদের সর্বশেষ স্তর।

এত কিছু আলোচনার পর এখন আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো যে, শয়তানের এক প্রতারণা হলো,

আখেরাত হচ্ছে সন্দেহ যুক্ত বিষয়। এ প্রতারণা দূর করতে হবে অনুকরণীয় বিশ্বাস অথবা অন্তর্দৃষ্টি এবং বাতেনী মুশাহাদার মাধ্যমে।

কোনো কোনো ঈমানদার যখন নিজের কথাবার্তা ও বিশ্বাস দ্বারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে এবং কামনা-বাসনা ও পাপে লিপ্ত হয়ে সৎকাজ ত্যাগ করে, তখন তারাও পরকাল সম্পর্কিত বিভ্রান্তিতে কাফেরদের সাথে অংশীদার হয়ে যায়। কেননা, তারাও দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। এর একমাত্র কারণ মূল ঈমানের ওসিলায় তারা চিরন্তন শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে এবং কিছুকাল জাহান্নামের আযাব ভোগ করার পর মুক্তি পাবে। তবে তারা যে পথভ্রষ্ট এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, তারা স্বীকার করে যে, দুনিয়া অপেক্ষা আখেরাত উত্তম। কিন্তু দুনিয়ার ঝোঁক এবং দুনিয়াকে লাভ করার জন্য শুধু ঈমান চিরন্তন কামিয়াবের জন্যে যথেষ্ট নয়। কুরআন এর সাক্ষী। আল্লাহ বলেন,

وَ اِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰی.

আর নিশ্চয় আমি সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে, ঈমান এনে, নেক কাজ করে, এরপর সৎ পথে থাকে। (সূরা ত্বহা : ৮২)

আরও ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ.

নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (সূরা আরাফ : ৫৬)

নবী কারীম (স) বলেন,

اَلْاِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ.

ইহসান হচ্ছে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। (সহিহ বুখারী : ৪৭৭৭; সহিহ মুসলিম : ৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

কালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

কুরআন পাকে যে সকল স্থানে মাগফিরাতের কথা বলা হয়েছে, সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। শুধু ঈমানের কথা বলা হয়নি। বর্তমানে যারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত, দুনিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট, দুনিয়াকে পছন্দ করে, দুনিয়ার স্বাদ শেষ হওয়ার ভয়ে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তারাও প্রতারিত। এ প্রবঞ্চণায় কাফের ও মুমিন উভয়েই শরীক।

আল্লাহ্ সম্পর্কে কাফেরদের প্রবঞ্চনা হলো, তাদের কেউ কেউ বলে থাকে, যদি কেয়ামত সংঘটিত হয় তাহলে অন্যদের চেয়ে আমরা সওয়াবের অধিক হকদার। আমরাই অধিক নিয়ামতপ্রাপ্ত হবো। আমরাই সৌভাগ্যবান হবো। এদের সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّ لَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا.

আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর আমাকে যদি আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হয় তবে আমি তো নিশ্চয় তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। (সূরা কাহাফ : ৩৬)

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, তাদের একজন এক হাজার দীনারের বিনিময়ে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো, এক হাজার দীনার দিয়ে একটি বাগান ক্রয় করলো, এক হাজার দীনার দিয়ে সেবক ক্রয় করলো, এক হাজার দীনারের বিনিময়ে এক নারীকে বিয়ে করলো, তখন এক মুসলমান তাকে নসিহত করলো, তুমি এমন এক প্রসাদ ও বাগান ক্রয় করলে, যা ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি তো এ এক হাজার দীনারের বিনিময়ে জান্নাতের একটি প্রসাদ কিনতে পারতে যা কখনো ধ্বংস হবে না। এমন বাগান কিনতে পারতে যা কখনো নষ্ট হবে না, এমন সেবক ক্রয় করতে পারতে, যা কখনো মৃত্যু বরণ করবে না। এমন জান্নাতী হুর বিয়ে করতে পারতে, সে কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবে না। মৃত্যুবরণ করবে না। তখন কাফের মুমিনের কথার প্রতি উত্তরে বললো, সেখানে এসব কিছুই নেই। এসব মিথ্যা কথা। যদি থেকেও থাকে তাহলে আখেরাতে এর চেয়ে উত্তম বস্তু আমার হবে। (তাফসীরে বাগভী : ৩ : ১৬১)

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা আস ইবনে ওয়ায়েলের কথাও উল্লেখ করেছেন। সে বলেছিল لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا অবশ্যই আমাকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দেওয়া হবে। (সূরা মারইয়াম : ৭৭)

মহান আল্লাহ তার জবাবে বলেন,

اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا.

সে কি অদৃশ্য সম্পর্কে জানতে পেরেছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে কোনো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? (সূরা মারইয়াম : ৭৮)

খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু ঋণ ছিলো, আমি তার কাছে ঋনের টাকা চাইতে গেলাম, কিন্তু সে তা আদায় করলো না। আমি বললাম, আখেরাতে আমি তা আদায় করে নিবো। সে আমাকে বললো, আখেরাতে গেলে যখন আমার কাছে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি থাকবে তখন আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবো। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন,

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا.

আপনি কি লক্ষ করেছেন সেই ব্যক্তিকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে বলে 'আমাকে অর্থসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দেওয়া হবেই।' (সূরা মারইয়াম : ৭৮)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ وَ مَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّ لَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَه لَلْحُسْنٰى.

যদি আমি তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন সে অবশ্যই বলবে, এ-তো আমার প্রাপ্যই এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরেও যাই, তবে তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।' (সূরা হামীম সাজদাহ : ৫০)

আলোচ্য সবকিছুই আল্লাহ সম্পর্কে কাফেরদের প্রবঞ্চণা। এর কারণ হলো শয়তানের ভ্রান্ত যুক্তি। আর সেটা হলো কাফেররা যখন দেখে দুনিয়াতে তাদেরকে বিভিন্ন নিয়ামত দান করা হয়েছে, তখন তারা মনে করে আখেরাতেও তাদেরকে এমন নিযামত দান করা হবে। দুনিয়াতে শাস্তি না আসার কারণে তারা মনে করে আখেরাতেও শাস্তি আসবে না। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে ইরশাদ করেন,

وَ يَقُوْلُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন?' জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! (সূরা মুজাদালাহ : ৮)

কাফেররা দরিদ্র মুমিনদের দেখে অবজ্ঞা করে। ঠাট্টাচ্ছলে বলে—

اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا.

আমাদের মধ্যে কি তাদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করছেন? (সূরা আনআম : ৫৩)

তারা আরও বলে,

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ.

'যদি তা (দীন) ভালো হতো, তবে তারা (নিম্নশ্রেণির লোকেরা) এর দিকে আমাদেরকে পেছনে ফেলে অগ্রগামী হতে পারতো না।

শয়তানের সাজানো যুক্তির ভিত্তিতে কাফেররা বলে, দুনিয়ার নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ আমাদের প্রতি ইহসান করেছেন। আর যার প্রতি ইহসান করা হয় সে পছন্দের মানুষ হয়ে থাকে। আর পছন্দের মানুষের প্রতি ভবিষ্যতেও ইহসান করা হয়। যেমন এক কবি বলেন,

لَقَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ فِيْمَا مَضٰى، كَذٰلِكَ يُحْسِنُ فِيْمَا بَقِيَ.

আল্লাহ অতীতে ইহসান করেছেন। এমনিভাবে ভবিষ্যতেও ইহসান করবেন।

তারা ভবিষ্যতকে অতীতের ওপর কেয়াস করেছে কারামত ও ভালোবাসার মাধ্যমে। তারা বলে, যদি আমি আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দের না হতাম তাহলে আল্লাহ আমার প্রতি ইহসান করতেন না।

এখানে তাদের ধোঁকায় পতিত হওয়ার বিষয় হলো এই যে, তারা আল্লাহর নেয়ামত প্রধানকে ইহসান মনে করছে, তারা আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে নিজেকে বুজুর্গ মনে করে আল্লাহর প্রিয় জ্ঞান করছে।। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। একটি উদাহরণ দেখুন, এক ব্যক্তির দুটি ছোটো গোলাম রয়েছে। তাদের একজনকে সে পছন্দ করে আর অপরজনকে অপছন্দ করে। যাকে সে পছন্দ করে, তাকে খেলাধুলা থেকে বিরত রেখে পাঠশালায় পাঠায়,

যেন সে আদব-শিষ্টাচার শিখতে পারে। ক্ষতিকারক ফল ও খাবার থেকে বিরত রাখে এবং উপকারী খাদ্য আহার করায়। অসুস্থ হলে সুস্থতার জন্য ওষুধ খাওয়া। অন্য দিকে যাকে সে পছন্দ করে না, তার প্রতি তার কোনো খেয়াল নেই। তাকে তার ইচ্ছেমতো জীবনযাপনে ছেড়ে দেয়। সে খেলাধুলা করে, পাঠশালায় যায় না। যা মন চায় তাই খায়, সে মনে করে মনিব তাকে খুব ভালোবাসে, তাই তাকে কোনো কিছুতে বারণ করে না। প্রকৃতপক্ষে এই গোলাম ধোঁকায় নিপতিত।

দুনিয়ার নিয়ামত, সুখ-আনন্দের অবস্থাও অনুরূপ। কেননা, এগুলো ধ্বংসাত্মক এবং আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আর আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এমনটিই হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাকে দুনিয়া থেকে নিরাপদ রাখেন, যেমন তোমরা তোমাদের অসুস্থ ব্যক্তিকে (ক্ষতিকর) পানি থেকে নিরাপদ রাখো। (জামে তিরমিযী : ২০৩৬)

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের অবস্থা এমন ছিলো যে, যখন দুনিয়ার কোনো নিয়ামত তাদের কাছে আসতো তখন তারা পেরেশান হয়ে যেতেন, তারা বলতেন, এটা তাদের পাপের শাস্তি, যা তড়িৎ তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি মনে করতেন। আর যখন দারিদ্র্যের সম্মুখিন হতেন তখন তা সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তাকে সালেহীনের প্রতিক মনে করতেন।

পক্ষান্তরে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সুখশান্তি দেখতে পায় তখন তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মানের বিষয় মনে করে। আর যখন তা চলে যায় তখন অপমান মনে করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ وَ اَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ كَلَّا.

অথচ মানুষ তো এরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন, সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার রিজিক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন। কখনো নয়; (সূরা ফজর : ১৫-১৭)

অর্থাৎ, সে যা বলেছে বিষয়টি তেমন নয়। এটা তো একটি পরীক্ষা।

এ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এটা তাদের প্রবঞ্চণা। হাসান বসরী (র) বলেন, كَلَّا শব্দ দ্বারা আল্লাহ দুটি বিষয়কে অস্বীকার করেছেন যে, এটা আমার সম্মান বা হেয়করণ কোনোটাই নয়; বরং সম্মানিত তো সে ব্যক্তি, যাকে আমি সম্মানিত করেছি আমার আনুগত্যের মাধ্যমে। সে ধনী হোক বা দরিদ্র। আর লাঞ্ছিত তো ওই ব্যক্তি, যাকে আমি লাঞ্ছিত করেছি আমার অবাধ্যতার মাধ্যমে। সে ধনী হোক বা গরিব। (দুররে মানসুর : ৮ : ৫০৯)

ধোঁকা-প্রবঞ্চনার প্রতিকার

এই ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার প্রতিকার হলো সম্মান ও লাঞ্ছনার প্রমাণাদি সম্পর্কে জানা। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে হোক অথবা অনুসরণের মাধ্যমে হোক। অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে প্রমাণাদি জানার পদ্ধতি হলো, সর্বপ্রথম জানতে হবে যে, দুনিয়া প্রবৃত্তিতে পড়ে আল্লাহ থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণ কী এবং দুনিয়ার প্রবৃত্তি থেকে দূরে সরে মানুষ কীভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে? এ বিষয়টি জানা যায় ইলহামের মাধ্যমে, যা অলী ও আরেফদের স্তর। এর সম্পর্কে হচ্ছে ইলমে মুকাশাফার সঙ্গে।

অনুকরণ ও সত্যায়নের মাধ্যমে প্রমাণাদি জানার পদ্ধতি হলো, আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনা, তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّ بَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ.

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্যস্বরূপ যে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দান করি, তা দ্বারা— তাদেরকে আমি দ্রুত সকল প্রকার কল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? না; বরং (প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে) তারা অনুভব করে না। (সূরা মুমিনূন : ৫৫-৫৬)

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ.

আমি তাদের এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না। (সূরা আরাফ : ১৮২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, যে পরিমাণ গুনাহ তারা করবে, সে পরিমাণ নিয়ামত তাদেরকে দিবে, যেন তাদের প্রবঞ্চনা বৃদ্ধি পায়।

فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ.

তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার খুলে দিলাম। অবশেষে তাদের যা দেওয়া হয়েছিল যখন তারা তাতে উল্লসিত হলো, তখন অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম, ফলে তারা নিরাশ হলো। (সূরা আনআম : ৪৪)

اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا.

বরং আমি সুযোগ দিয়ে থাকি যাতে তারা গুনাহ বাড়িয়ে নেয়। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৮)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۚ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ.

আপনি কখনো আল্লাহকে উদাসীন মনে করবেন না, জালেমদের কর্ম সম্পর্কে। তবে তিনি তাদের এমন একটা দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যেদিন চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে যাবে। (সূরা ইবরাহিম : ৪২)

এ ছাড়া অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, সে প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পাবে। কেননা, এই প্রবঞ্চনা সৃষ্টি হয় আল্লাহর সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনবে, সে তাঁর শাস্তি থেকে নির্বিক থাকবে না। এবং বিভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে ধোঁকায়ও পড়বে না। সে ফেরাউন হামান, কারুন প্রমুখ বাদশাদের নিয়ে চিন্তা করবে যে, প্রথমে তাদের প্রতি আল্লাহ ইহসান করেছেন অতঃপর পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.

তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! আপনি কি তাদের কাউকে দেখতে পান অথবা ক্ষীণশব্দও শুনতে পান? (সূরা আলে ইমরান : ৯৮)

যারা আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ.

বস্তুত আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে শুধু তারাই নিশ্চিন্ত হয়, যারা ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়। (সূরা আরাফ : ৯৯)

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.

আর তারা চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহও কৌশল করেছিলেন। বস্তুত, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কুশলী। (সূরা আলে ইমরান : ৫৪)

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে, এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি। অতএব (হে নবী!) কাফেরদের অবকাশ দিন; তাদের অবকাশ দিন কিছু কালের জন্য। (সূরা তারেক : ১৬-১৭)

সুতরাং যে গোলামকে মনিব ইচ্ছা মতো চলার সুযোগ দিয়েছে, নিয়ামতে পরিপূর্ণ রেখেছে, তার এটা ভাবা ঠিক নয় যে, সে মনিবের প্রিয় পাত্র। বরং হতে পারে এটা মনিবের একটা কৌশল, এর মাধ্যমে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন। এমনভাবে বান্দার উচিত আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে খুশি না হয়ে সতর্ক হওয়া, হতে পারে এই ধনসম্পদ ও নিয়ামতের মাধ্যমেই তিনি তাকে শাস্তি দিবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত থাকে সে ধোঁকায় নিপতিত। এই ধোঁকায় পতিত হওয়ার কারণ হলো, যে দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে মনে করছে যে, সে নিয়ামতদাতার কাছে সম্মানের পাত্র। অথচ হতে পারে এটা তার লাঞ্ছনার প্রমাণ। কিন্তু এই সম্ভাবনা প্রবৃত্তি মেনে নেওয়ার না। তখন শয়তান বান্দার অন্তরকে প্রবৃত্তির চাহিদার প্রতি ঝুঁকিয়ে দেয়। আর তা হলো, দুনিয়ার নিয়ামতকে সম্মানের বিষয় মনে করা। আর এটাই হচ্ছে ধোঁকা।

মোটকথা, দুনিয়া পেয়েই যারা সন্তুষ্ট, এর চাকচিক্যে নিমজ্জিত এবং মৃত্যুকে খারাপ মনে করে, তারাই ভ্রষ্ট, কাফের হোক কিংবা মুসলমান। এ পর্যন্ত কাফেরদের ভ্রষ্টতা ও তার প্রতিকার বর্ণিত হলো।

এ পর্যায়ে পাপাচারীদের বিভ্রান্তি বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা বলে, আল্লাহ তাআলা মার্জনাকারী। আমরা তাঁর মার্জনা আশা করি। এরপর এ আশার উপর ভিত্তি করে তারা সৎকর্ম করাও ছেড়ে দেয়। তারা এর নাম রাখে

রিজা, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি আশাবাদ। কারণ তারা জানে রিজা ধর্মের একটি প্রশংসনীয় বিষয়। তাদের আরও বিভ্রান্তি হলো, তারা বলে। আল্লাহর নিয়ামত প্রশস্ত, তাঁর রহমত পরিব্যাপ্ত, তাঁর দয়া ব্যাপক। আল্লাহর রহমতের সমুদ্রের সমান বান্দার গুনাহ তো তুচ্ছ। আমরা তো একত্ববাদী ও মুমিন। ঈমানের ওসিলায় ক্ষমার আশাবাদী। মাঝে মধ্যে তাদের এ আশাবাদের একটি দলিল হয়ে থাকে তাদের পূর্বপুরুষদের নেককার ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া। যেমন সৈয়দ হওয়া। আল্লাহভীতি ও পরহেযগারিতে পূর্বপুরুষদের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তারা মনে করে যে, আল্লাহর নিকট তারা পূর্বপুরুষদের চেয়ে বুযুর্গ। কেননা, পূর্বপুরুষরা সৎ ও মুত্তাকী হওয়া সত্ত্বেও ভয়ে থাকতেন। কিন্তু তারা সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ করার কারণে নির্ভীক হয়ে থাকে। এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি। তাদের অন্তরে শয়তান এ ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, যে কাউকে ভালোবাসে, সে তার বংশধরকেও ভালোবাসে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু তোমাদের পূর্বপুরুষকে প্রিয় জানতেন তাই তোমাদেরকেও প্রিয় জানবেন। অতএব, তোমাদের নেক আমল করার প্রয়োজন কি? অথচ তারা একথা ভাবে না যে, হযরত নূহ (আ) নিজের ছেলেকে নৌকায় নিজের সঙ্গে ওঠাতে চেয়েছিলেন এবং আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন—

رَبِّ اِنَّ ابْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ.

ইলাহি, আমার ছেলে আমার পরিবারের মধ্যে গণ্য। (সূরা হুদ : ৪৫)

কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর এলো—

یٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ.

হে নূহ! অবশ্যই সে তোমার পরিবারের মধ্যে গণ্য নয়। সে খারাপ। (সূরা হুদ : ৪৬)

হযরত ইবরাহীম (আ) নিজের বাবার জন্য দুআ করেন। কিন্তু তা কবুল হয়নি। আমাদের নবীজি (স) আপন মায়ের কবর যিয়ারত এবং তার জন্য ইসতিগফারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়; কিন্তু মাগফিরাত চাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি মায়ের কবরের কাছে পৌঁছে শুধু চোখের পানি বিসর্জন করতে থাকেন। বোঝা গেল, যেসব ধারণার বশবর্তি হয়ে মানুষ দীন, ঈমান ও আমল থেকে দূরে থাকে-

এসব একান্তই অমূলক। কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআলা শুধু অনুগতদেরকেই ভালোবাসেন এবং গুনাহগারদের অপছন্দ করেন। যেমন— পিতা অনুগত হলে তার সন্তানরা গুনাহগার হলেও আল্লাহ পিতাকে অপছন্দ করেন না। এক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে—

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى.

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না। (সূরা আনয়াম : ১৬৪)

যে লোক মনে করে যে, বাবার খোদাভীতির কারণে সেও নাজাত পেয়ে যাবে; বিষয়টা এমন যেন বাবা যদি পেট ভরে খাবার খায় তবে তারও পেট ভরে যাবে এবং সে পানি পান করলে তারও পিপাসা মিটে যাবে। অথচ এরকম মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এ থেকে জানা গেল আল্লাহভীতি ফরযে আইন। এতে পিতার আল্লাহভীতি পুত্রের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেয়ামতের দিন তো প্রত্যেকের আল্লাহভীতির ভিত্তিতেই বিচার হবে। তবে যে ব্যক্তির উপর আল্লাহর রাগ বেশি হবে না, তার জন্য সুপারিশের অনুমতি হবে এবং সুপারিশ তার জন্য বেশি হবে।

এখন প্রশ্ন হয়, পাপী লোক বলে যে, আল্লাহ গাফুর ও গাফ্ফার। এতে বিভ্রান্তি কোথায়? উত্তর হলো, শয়তান মানুষকে এ ধরনের কথার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করে, যা প্রকাশ্য ও গ্রহণযোগ্য এবং ভেতর বর্জনযোগ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাহ্যিক কথা সুন্দর না হলে মন বিভ্রান্ত হবে কেন? আল্লাহর রাসূল (স) এ বক্তব্যে রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন। এক হাদিসে তিনি বলেন, জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফ্সকে অনুগত করে, মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে। বোকা সেই ব্যক্তি, যে খেয়াল-খুশির অনুগামী হয় এবং আল্লাহর নিকট আশা-আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। (জামে তিরমিযী : ২৪৫৯)

সুতরাং বাস্তবে এ হচ্ছে আমলহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা, শয়তান যার নাম পাল্টে রিয়া দিয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা এতেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।

অথচ রিজা শব্দের ব্যাখ্যা আল্লাহ তাআলা এভাবে করেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ.

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লার রাস্তায় জিহাদ করেছে, ওই সমস্ত লোকেরা আল্লাহর রহমত আশা করে। (সূরা বাকারা : ২১৮)

অর্থাৎ, এ লোকেরা আল্লাহর রহমত আশা করার উপযুক্ত। কেননা, আখেরাতে সওয়াব হচ্ছে আমলের প্রতিদান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ। (সূরা ওয়াকিয়া : ২৪)

وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

আচ্ছা মনে করুন, এক ব্যক্তি দানশলী ও ওয়াদা রক্ষাকারী এবং শ্রমিককে নির্ধারিত মজুরির অধিক প্রদানকারী। সে এক ব্যক্তিকে নির্ধারিত মজুরি থালা-বাসন পরিস্কার করার কাজে নিয়োগ দিলো। এখন যদি ওই ব্যক্তি বাসন পরিস্কারের পরিবর্তে তা ভাঙ্গতে শুরু করে আর বলে, আমাকে পূর্ণ পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। কারণ, মালিক দানশীল ও ওয়াদা রক্ষাকারী। এই আশা করা তার জন্য কি যথোযুক্ত? কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি তার এই প্রত্যাশাকে মেনে নেবে বলে মনে হয় না। তার এই প্রবঞ্চনার কারণ হলো, সে প্রত্যাশা ও প্রবঞ্চনার মধ্যে পার্থক্য করে না।

হযরত হাসান (র)-কে জনৈক ব্যক্তি বললো— কিছু লোক বলে— আমরা আল্লাহর নিকট আশা রাখি এবং আমল করি না। তিনি বললেন, এটা তাদের হেয়ালিপনা। যে লোক কোনো জিনিস আশা করে, সে তার তালাশ করে। আর যে লোক কোনো জিনিসকে ভয় করে, সে তার নিকট থেকে দূরে পালায়। মুসলিম ইবনে ইয়াসার বলেন, আমি একদিন এত তীব্র গতিতে সিজদায় গেলাম যে, আমার সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। তা দেখে কেউ বলল, আমরা তো আল্লাহর নিকট মাগফিরাত আশা করি, এজন্য আমল করি না। মুসলিম জবাব দিলেন, এটা কস্মিনকালে রিয়া তথা আশা নয়। মানুষ যে বিষয় আশা করে, তা অন্বেষণ করে।

এর একটি উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি আশা করে যে, সে সন্তানের বাবা হবে; অথচ সে এখনও বিয়েই করেনি। কিংবা বিয়ে করলেও স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করেনি। কিংবা মেলামেশা করলেও আযল করেছে। এমন ব্যক্তির সন্তানের পিতা হওয়ার আশা হেয়ালিপনা নয় তো কি? এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও রহমত আশা করে এবং তার ঈমানই

নেই কিংবা ঈমান থাকলেও কাজ করেনি কিংবা সৎকাজের সাথে সাথে অসৎকাজও ছাড়েনি, সেও হেয়ালিপনায় লিপ্ত। যেমনিভাবে বান্দা বিয়ে ও সঙ্গমের পর সন্তানের আশা রাখে আবার সন্তান না হওয়ারও ভয় করে। তেমনিভাবে একজন মুমিনের জন্য নেক আমল করার পরও ভয় ও আশা উভয়ই থাকা উচিত এবং বদ আমল পরিহার করে এরপর ক্ষমার আশা করা উচিত। সাথে সাথে এই ভয়ও থাকা উচিত যে, ক্ষমার আবেদন নাকচও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, সারা জীবন নেক আমল করলো আর শেষ পরিণতি মন্দ হলো। আল্লাহর কাছে এ আশা রাখা উচিত, তিনি যেন তাঁর পথে আমাদেরকে দৃঢ় স্থির রাখেন। মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। তাওহীদের ওপর মৃত্যু দান করেন। অবশিষ্ট জীবনে অন্তরকে যেন প্রভৃত্তির প্রতি ধাবিত না করেন। যে ব্যক্তি এমন আকাঙ্ক্ষা রাখে। তাকে বিচক্ষণ বলা যায়। এছাড়া অন্যরা ধোঁকায় পতিত। অতিসত্ত্বর তারা জানতে পারবে, কারা গোমরাহিতে ছিলো। আল্লাহর আযাব দেখে তারা বলবে—

رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ.

আমরা (এবার প্রকৃত বিষয়) দেখলাম এবং শুনলাম। অতএব, এখন আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দিন। তা হলে আমরা ভালো কাজ করবো। আমরা পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়েছি। (সূরা সাজদা : ১২)

অর্থাৎ, আমরা জানলাম, যেমনিভাবে বিয়ে ও সঙ্গম ব্যতীত সন্তান হয় না এবং বীজ বপন ও চাষাবাদ ব্যতীত ফসল হয় না ঠিক তেমনি নেক আমল ব্যতীত আখেরাতে সওয়াব হাসিল হবে না। সুতরাং আপনি আমাদেরকে (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক আমল করবো। আমরা এখন আপনার বাণীর সত্যতা জানতে পেরেছি। আপনি বলেছেন—

وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى وَ اَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى.

আর মানুষ তা-ই শুধু পায় যা সে চেষ্টা করে, নিঃসন্দেহে মানুষকে অচিরেই তার কর্মপ্রচেষ্টা দেখানো হবে। (সূরা নজম : ৩৯-৪০)

كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ.

যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে জাহান্নামের রক্ষিরা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেননি? (সূরা মূলক : ৮)

অর্থাৎ, সতর্ককারী কি তোমাদেরকে আল্লাহর রীতি সম্পর্কে শোনাননি যে, প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে, তার আমল অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে? সুতরাং সব কিছু শোনা ও জানার পরও তোমরা কীসে তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে? তারা বলবে।

وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

এবং তারা আরও বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, আমরা জাহান্নামি হতাম না।' তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। ধ্বংস জাহান্নামিদের জন্য। (সূরা মূলক : ১০-১১)

মনে রাখতে হবে, দু'জায়গায় আশা করা উত্তম। (১) পাপিষ্ঠ— তার মনে যখন তাওবা করার চিন্তা জাগে, তখন শয়তান তাকে এ বলে প্রতারণা করে যে, তার তাওবা কবুল হবে না। এতে শয়তান চায় যে, তার সর্বনাশ করে ছাড়বে। তখন নৈরাশ্য দূর করে আশা করা অপরিহার্য। সে স্মরণ করবে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, তাওবা কবুলকারী এবং তাওবা একটি ইবাদত, যা দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। পবিত্র কুরআনে এর সমর্থন রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَ اَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ.

বলে দিন, হে আমার বান্দা! যারা নিজেদের উপর অবিচার করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত অপরাধ মাফ করবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা ফিরে এস রবের দিকে। (সূরা যুমার : ৫৩)

সুতরাং যখন মানুষ তাওবাসহ মার্জনার আশা করবে, তখন তাকে আশাবাদী বলা উচিত। অন্যথা গুনাহ অব্যাহত রেখে ক্ষমার আশা করা খামখেয়ালি। (২) উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি বাজারে ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত আছে। ইতোমধ্যে জুমার নামাযের সময় অনেকটা চলে গেছে। এখন সে জুমার নামাযে যেতে চায়। তখন শয়তান তাকে বলে, সময় চলে গেছে। তুমি তো জুমার নামায পাবে না। তখন ওই ব্যক্তি শয়তানের কথা

কান না দিয়ে জুমার নামায পাওয়ার আশায় যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এমন ব্যক্তিকে আশাবাদী বলা যায়। পক্ষান্তরে সে যদি ব্যবসায়িক কাজেই ব্যস্ত থাকে এবং এ আশা করে যে, ইমাম সাহেব তার জন্য এমন দেরিতে পড়বেন অথবা অন্য কোনো কারণে নামায বিলম্ব হবে তাহলে সে তো খামখেয়ালি করছে।

যে লোক নফল ইবাদতে ভুল করে এবং শুধু ফরয ইবাদত করেই ক্ষান্ত থাকে, সে যদি নিজের জন্য আল্লাহর সেই যাবতীয় নিয়ামত ও প্রতিশ্রুতি আশা করে, যা তিনি নেককারদেরকে দিয়েছেন এবং এ আশার আনন্দে নফল ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে তার এ আশা উত্তম। আল্লাহ বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ. اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ. اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ. الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

নিশ্চিতরূপে মুমিনরা সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয় নম্র, যারা অর্থহীন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা আপন লজ্জাস্থান হিফাজত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে— অন্যথা হলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কেউ এদের ব্যতীত অন্যকে কামনা করলে সে হবে সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, তারাই ফিরদাউসের অধিকারী হবে, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। (সূরা মুমিনুন : ১-৮)

প্রথমোক্ত আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাওবার প্রতিবন্ধক হতাশা খতম হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ইবাদতে আনন্দের অন্তরায় অলসতা দূর হয়ে যায়। যে আকাঙ্ক্ষা তাওবা করতে অনুপ্রাণীত করে, তাকে বলা হয় রিজা। আর যে কামনা ইবাদতে অলসতার কারণ হয়, তাকে বলা হয় গোমরাহি ও খামখেয়ালি। যেমন, এক ব্যক্তির মনে হলো, গুনাহ ছেড়ে দিয়ে আমল

করা উচিত। তখন শয়তান তাকে বলে নিজেকে এত কষ্ট দেওয়ার কী প্রয়োজন? তোমার রব তো দয়ালু, ক্ষমাশীল ও করুণাময়। এ কথা শুনে ওই ব্যক্তি তওবা ও ইবাদতের কথা ভুলে যায়। এটা একটা প্রবঞ্চনা। এ সময় বান্দার জন্য আবশ্যক হলো, ভয় অবলম্বন করা। নিজেকে আল্লাহর গযব ও তাঁর ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ করে ভয় দেখানো। নিজেকে এ কথা বলা যে, যদিও আল্লাহ তাআলা গুনাহ মাফকারী ও তওবা কবুলকারী; কিন্তু তিনি শাস্তি প্রদানেও কঠোর। তিনি পরম দাতা হওয়ার সাথে সাথে কাফেরদের জাহান্নামে চিরকাল বন্দিকারীও। অথচ তাদের কুফরির কারণে আল্লাহর কোনো প্রকার ক্ষতি হয় না, তিনি তাঁর অসংখ্য বান্দাকে শাস্তি, কষ্ট, অসুস্থতা, ক্ষুদা, দারিদ্র্য ইত্যাদিতে নিপতিত রেখে পরিক্ষা করেছেন। অথচ তিনি এসব কিছু দূর করতে সক্ষম। বান্দার ব্যাপারে এটাই আল্লাহর রীতি। তিনি আমাকে তাঁর আযাবের মাধ্যমে ভয় দেখিয়েছেন। সুতরাং আমি কেন ভয় পাব না এবং ধোঁকায় পড়ে থাকব? ভয় ও আশা মানুষকে আমলের প্রতি ধাবিত করে। যে চিন্তাভাবনা মানুষকে আমলের প্রতি ধাবিত করে না, তা হলো কামনা ও প্রবঞ্চনা। মানুষ এ প্রবঞ্চনায় পড়ে আমলে অলসতা করে।

তাদের আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পরকালের জন্য চেষ্টা না করার কারণ একমাত্র এটাই যে, তারা গোমরাহিতে পড়ে আছে, যাকে রিজা মনে করে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন— এ উম্মতের শেষ যুগে বিভ্রান্তি প্রবল আকার ধারণ করবে। বাস্তবে তাই দেখা যায়। প্রথম যুগের লোকেরা অবিরত ইবাদত করতেন। তারা যা-ই আমল করতেন, তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতো। অথচ তারা সমস্ত রাত কাটাতেন আল্লাহর ইবাদতে। তারপরও নীরবে নিভৃতে নিজের জন্য কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন মানুষ পাপে ডুবে থাকে, দুনিয়া নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে এবং আল্লাহর প্রতি বিমুখ থাকে। এরপরও তারা শঙ্কাহীন ও প্রশান্ত চিত্ত। তারা বলে- আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের উপর আস্থা রাখি এবং তাঁর রহম ও মাগফিরাত কামনা করি। তারা যেন দাবী করছে যে, আমরা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ সম্পর্কে এতটুকু জানি, যতটুকু নবী ও সাহাবায়ে কেরাম জানতেন না।

হযরত মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এমন এক সময় আসবে, যখন পরিধানের কাপড়ের মতো কুরআন মানুষের অন্তরে পুরাতন হয়ে যাবে। মানুষ শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষাই করে যাবে এবং এর সাথে মোটেই ভয় থাকবে না। কোনো সৎকর্ম করলে তারা বলবে, এটা কবুল হবে এবং কোনো অসৎকর্ম করলে বলবে এটা ক্ষমা পেয়ে যাব। আল্লাহ তাআলা খ্রিস্টানদের এ অবস্থাই বর্ণনা করে বলেন,

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا.

তাদের পিছনে আসলো কিতাবের ওয়ারিসগণ, যারা তুচ্ছ জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে। (সূরা আরাফ : ১৬৯)

অর্থাৎ খ্রিস্টান আলেমরা আসমানি কিতাবের উত্তরাধিকার হওয়া সত্ত্বেও পার্থিব ধনসম্পদের পিছনে ছুটেছে। হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ.

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর (সামনে) উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। (সূরা আর রহমান : ৪৬)

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ.

এ ঘোষণা শুধু তাদের জন্য, যারা আমার সামনে উপস্থিত হতে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে। (সূরা ইবরাহিম : ১৪)

কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সতর্ককরণ ও ভীতি প্রদর্শন রয়েছে। যে ব্যক্তির চিন্তাভাবনার বিষয়বস্তু হবে কুরআন এবং যে তার প্রতি ঈমান রাখে, তার ভয় ও চিন্তা আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ কুরআনকে খেলতামাশার বস্তু বানিয়ে ফেলেছে। তারা হরফের মাখরাজ নিয়ে বিতর্ক করে। আর এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে, যেন আরবি কবিতা পাঠ করছে। আয়াতের অর্থ ও এর আমলের প্রতি কোনো খেয়াল থাকে না। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় প্রবঞ্চক আর আছে কি?

এ হলো আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চনার উদাহরণ এবং আকাঙ্ক্ষা ও প্রবঞ্চনার মাঝে পার্থক্যের বর্ণনা। আলোচ্য লোকদের কাছাকাছি হলো ওই সকল

লোক, যারা আনুগত্য করে আবার গুনাহও করে। তাদের পুণ্য কম এবং গুনাহ বেশি। এতদসত্ত্বেও তারা ক্ষমার আশা রাখে। তারা ধারণা রাখে যে, তাদের নেকির পাল্লা ভারি হবে, তাদের গুনাহ যত বেশি হোক না কেন। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতা।

এক ব্যক্তি হালাল-হারাম মিশ্রিত সম্পদ থেকে দশ দিরহাম দান করে অথচ সে হাজার দিরহাম মুসলমানদের থেকে নাজায়েয পন্থায় কবজা করে থাকে। হতে পারে সে যা দান করেছে, তা ওই কবজাকৃত সম্পদেরই অংশ।

কিন্তু সে ওই দশ দিরহামের ওপর ভরসা করে এবং মনে করে যদি সে হাজার দিরহাম নাজায়েয পন্থায় গ্রহণ করে এবং দশ দিরহাম সদকা করে তাহলে উভয়টি সমান হয়ে যাবে। কত বড় মূর্খতা! এক পাল্লায় হাজার দিরহাম তাহলে তা সমান হতে পারে কীভাবে?

কেউ কেউ মনে করে, তার পুন্য তার গুনাহের চেয়ে বেশি। এর কারণ হলো, তারা নেককর্মের কথা মনে রাখে; কিন্তু গুনাহের কথা ভুলে যায়। সে ওই ব্যক্তির মতো, যে দিনে একশবার ইসতেগফার করে, একশবার তাসবীহ পাঠ করে এরপর দিনভর সে মানুষের গীবত করে, তাদের সম্মান হানি করে এবং এমন অসংখ্য কথাবার্তা বলে, যা আল্লাহর অপছন্দ। কিন্তু তার মনে থাকে শুধু তাসবীহ ও ইসতেগফারের কথা আর সারা দিনের গর্হিত কাজকর্ম ভুলে যায়। যদি সে মনে রাখতো তাহলে হয়তো সেগুলো তার তাসবীহ ও ইসতেগফারের সমান হয়ে যেত। কিংবা তা অতিক্রম করে যেত। সে মনে রাখুক বা না রাখুক, কিরামান কাতেবীন তা লিখে রেয়েছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যক অনর্থক কথাবার্তার জন্য শাস্তি বাণী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوِاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا.

আপনি মনে করতেন তারা জাগ্রত। কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডান দিকে ও বাম দিকে এবং তাদের কুকুর গুহামুখে সামনের পা দুটি প্রসারিত করে ছিল। যদি আপনি তাদের

উঁকি মেরে দেখতেন তা হলে আপনি পিছন ফিরে পলায়ন করতেন ও তাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। (সূরা ক্বাহফ : ১৮)

সে সবসময় তাসবীহ-তাহলীলের ফযিলত নিয়ে চিন্তা করে; কিন্তু গীবত, মিথ্যা, চোগলখুরি ইত্যাদি গর্হিত কাজের প্রতি খেয়ালই করে না, যা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি কসম করে বলছি, কিরামান কাতেবীন যদি তাসবীহ ও তাহলীল ব্যতীত প্রত্যেক ভালো-মন্দ কথা লেখার বিনিময় চাইতো তাহলে কোনো ব্যক্তি তার মুখ থেকে মন্দ কথা বের করতো না। এমনকি প্রয়োজনীয় কথা বলতেও সতর্ক থাকতো। এ চিন্তা করে যে, না জানি পারিশ্রমিক দেওয়া লাগবে। কী আশ্চর্যের বিষয়! সামান্য পারিশ্রমিকের ভয়ে তারা সতর্ক থাকবে; কিন্তু জান্নাতের মতো মূল্যবান বস্তু হারানোর ভয় তাদের নেই। এটা তো বড় মুসিবত ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ আমাদেরকে অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

পূতপবিত্র ওই সত্তা, যিনি আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। সত্য পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরা কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে গ্রহণ না করে শয়তানের ধোঁকায় পতিত হই।

চার প্রকার লোক বিভ্রান্ত

১. শিক্ষিতদের বিভ্রান্তি : একদল শিক্ষিত লোক ব্যাপক ধর্মীয় ও যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করে এবং এগুলো নিয়ে এত মশগুল থাকে যে, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি মোটেই তোয়াক্কা করে না। তারা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ থেকে বিরত রাখে না এবং ইবাদত করে না। তারা আরও মনে করে যে, আমরা তাঁর নিকট মর্যাদাবান। আমাদের মতো শিক্ষিত লোকদের আল্লাহ শাস্তি দেবেন না। বরং সাধারণ লোকের পক্ষে আমাদের সুপারিশ কবুল করবেন। প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের ভুল ধারণা। কারণ, গভীরভাবে দেখলে বোঝা যাবে, বিদ্যা দু'ধরনের। (১) মুকাশাফা, যাকে পরিভাষায় 'মারিফত' বলা হয়। (২) মুআমালা; অর্থাৎ বৈধ অবৈধ, ভালো ও মন্দ চরিত্র, তার প্রতিকার এবং মন্দ চরিত্র থেকে আত্মরক্ষার উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। আমল তথা কাজের উদ্দেশ্যে এ দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান লাভ করা হয়। আমল উদ্দেশ্য না হলে জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। যে জ্ঞানের উদ্দেশ্য হয় আমল, সেই আমলই সেই জ্ঞানের মূল্য হয়ে থাকে।

রোগী কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে চিকিৎসক তাকে কিছু বনজ ওষুধ দেয় এবং সেগুলো কোথায় পাওয়া যায়, চূর্ণকরণ, প্রস্তুত প্রণালী, সেবনবিধি ইত্যাদি সব বলে দিল। রোগী সেগুলো শুনে সুন্দর করে একটি ব্যবস্থাপত্র লিখে নিল। এরপর বাড়ি ফিরে সে প্রত্যহ সে ব্যবস্থাপত্র পাঠ করে বটে কিন্তু প্রাপ্তিস্থান থেকে সেগুলো কিনে ওষুধ তৈরি করলো না এবং সেবনও করলো না। অথচ তার নিকট থেকে শুনে অনেকেই সেই ওষুধ প্রস্তুত করে সেবন করল এবং রোগ থেকে মুক্তি পেল। এমতাবস্থায় এ লোকের সুস্থতার আশা করা যায় কি? তার জ্ঞান তাকে কোনো ফায়দা দিবে কি? হ্যাঁ, সে যদি পয়সা খরচ করে উপাদানগুলো বাজার থেকে কিনে নিয়ে ওষুধ তৈরি করে এবং সেবন বিধি মেনে সেবন করে, সেই সঙ্গে নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর বস্তু আহার করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার সুস্থ হওয়ার আশা করা যায়। তাতেও সুস্থ না হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু ওষুধ সেবন না করে শুধু আরোগ্য লাভের আশা করা বাতুলতা বা পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। এমনিভাবে যে লোক ফিক্‌হ, ইবাদতের বিধিবিধান ইত্যাদি ইলম শিক্ষা করে; কিন্তু নিজে আমল করে না, গুনাহ জেনেও গুনাহ থেকে দূরে থাকে না, মন্দ চরিত্র অধ্যয়ন করে এবং নিজেকে সংশোধন করে না এবং সচ্চরিত্রতার জ্ঞান অর্জন করে, কিন্তু নিজে তা দ্বারা উপকৃত হয় না; সে নিশ্চিতই বিভ্রান্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا.

যে নিজেকে পরিশোধিত করবে, সেই কৃতকার্য হবে। (সূরা শামস : ৯)

এক্ষেত্রে এ কথা বলা হয়নি, যে পরিশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করবে, সে কৃতকার্য হবে। এক্ষেত্রে শয়তান আরও একটি প্রতারণা হাযির করে। তা এই যে, জ্ঞানার্জনের সাথে ওষুধের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, ওষুধের জ্ঞান রোগ দূর করে না বটে; কিন্তু জ্ঞানার্জন আল্লাহর নৈকট্য ও সওয়াব লাভের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং জ্ঞানার্জনের ফযিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। এসব হাদিসে আমল ছাড়া জ্ঞানার্জনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সত্য কথা হল, মূর্খ ব্যক্তিমাত্রই শয়তানের এ ধোঁকার শিকার হয়। কেননা, এটা মানসিক প্রবণতার পক্ষে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ লোক শয়তানকে এ জবাব দেয় যে, তুই আমাকে জ্ঞানের মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিস এবং অসৎ আমলহীন

বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্পর্কে যেসব আযাবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলো বেমালুম বিস্মৃত করে দিচ্ছিস। আল্লাহ বলেন,

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ.

তার উপমা কুকুরের ন্যায়। (সূরা আরাফ : ১৭৬)

অন্য আয়াতে আছে—

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا.

অর্থাৎ, তাওরাতের দায়িত্ব যাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তারপর তারা তা পালন করেনি, তারা সেই গাধার ন্যায়, যে ব্যাপক কিতাবের বোঝা বহন করে। (সূরা জুমুআ : ৫)

কুকুর ও গাধার সমান হওয়ার চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে? হাদিসে আছে, যার ইল্‌ম বেশি এবং সে অনুযায়ী সুপথপ্রাপ্তি নেই, সে আল্লাহ থেকে বহু দূরে চলে যায়। আরও আছে, বে-আমল আলেমকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন ঘানি ঘুরায়, তেমনি সে অগ্নিকুণ্ডে ঘুরবে। (সহিহ বুখারী : ৩২৬৭)

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, মূর্খ ব্যক্তি একবার শাস্তি ভোগ করবে, সে পড়া-লেখা করেনি। আল্লাহর ইচ্ছা হলে সে পড়া-লেখা করতো। কিন্তু জ্ঞানীতো সাতবার শাস্তি ভোগ করবে। অর্থাৎ, তার জ্ঞান তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হবে এবং তাকে বলা হবে, জ্ঞান অর্জন করে তুমি কী আমল করেছ? আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা কীভাবে আদায় করেছ? নবী কারীম (স) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন অধিক আযাব সেই জ্ঞানী ব্যক্তির হবে, যার জ্ঞান তার কোনো কাজে আসেনি। এ ধরনের আরও অসংখ্য বর্ণনা আছে। এগুলো অসৎজ্ঞানী ব্যক্তির ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই শয়তান এগুলো মনে করিয়ে দেয় না। এই লোকদের অবস্থা মূর্খদের চেয়েও খারাপ। সে একবার মনে করে যে, সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাসাবাদ তাকেই করা হবে। অন্য দিকে আবার ভাবে, সে কল্যাণের ওপর আছে, এটা এক চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রবঞ্চনা।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইলমে মুকাশাফা তথা, আল্লাহ তাআলা, তাঁর সিফাত ও নামসমূহের জ্ঞান অর্জন এর দাবি করে, অথচ আমল করে না, আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, তাঁর সীমালঙ্ঘন করে, তার প্রবঞ্চনা আরও গুরুতর।

তার উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যে বাদশাহর সেবা করার ইচ্ছা করেছে, সে বাদশাহর স্বভাব, গুণ, আকৃতি, বরং সব বিষয়ে জেনে নিয়েছে; কিন্তু বাদশাহর পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়ে সে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। সে জানে না বাদশাহ কীসে খুশি হন এবং কীসে অখুশি।

অথবা সে এটাও জেনে নিয়েছে; কিন্তু এমন আচরণ করেছে, যার কারণে বাদশাহ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কথাবার্তা। পোশাক আশাক, আচার-ব্যবহার সবকিছুতেই সে বাদশাহকে কষ্ট দিয়েছে। এখন সে বাদশাহর কাছে যেতে চায়। ওসিলা হিসেবে সে বাদশাহর নাম, গুণ, রং, আকৃতি, স্বভাব, রাজত্ব ইত্যাদির জ্ঞান পেশ করে। অথচ সে যদি এ সকল বিষয় না জেনে কেবল বাদশাহর পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়ে জানতো এবং সে অনুযায়ী কাজ করতো তাহলে এটা তার জন্য উত্তম হতো, এ কারণে সে শাহী মহলে বিশেষ স্থান পেত এবং বাদশাহরও নৈকট্য লাভ হতো।

শিক্ষত ব্যক্তির অবস্থাও অনুরূপ। যদিও ইলমে মুকাশাফায় বিজ্ঞ বলে দাবি করে; কিন্তু তাকওয়ার স্বল্পতা এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ ও কর্মপদ্ধতি এটাই প্রমাণ করে যে, সে শুধু আল্লাহর নামসমূহই জানে। এগুলোর প্রকৃত অর্থ জানেনা। কারণ, তার যদি আল্লাহর প্রকৃত মারেফাত লাভ হতো তাহলে সে আল্লাহকে ভয় করতো। এটা অসম্ভব যে, কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি সিংহ সম্পর্কে জানবে আর তাকে ভয় পাবে না। আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট ওহি পাঠান— خِفْنِيْ كَمَا تَخَافُ السَّبُعَ الضَّارِيَ আমাকে এভাবে ভয় করো, যেভাবে তুমি ভয়ানক হিংস্র প্রাণিকে ভয় করো। (কুতুল কুলূব : ১ : ২৪১)

যে ব্যক্তি সিংহের নাম, আকৃতি ও রং সম্পর্কে জানে; কিন্তু তার হিংস্রতা সম্পর্কে জানে না, সে সিংহকে ভয় পাবে না, মূলত সে সিংহের প্রকৃত সংজ্ঞাই জানেনি। সুতরাং আল্লাহর প্রকৃত মারেফতের অর্থ হলো, বান্দা আল্লাহকে চিনবে, তাঁর সিফত সম্পর্কে জানবে যে, তিনি কারও পরওয়া ব্যতীতই উভয় জাহান ধ্বংস করে দিতে পারেন। সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন। তিনি যদি তাকে এবং তার মতো লাখো বান্দাকে ধ্বংস করে দেন অথবা চিরস্থায়ী আযাবে পতিত করেন তাহলে এতে তাঁর ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। তাঁর কোনো আফসোসও হবে না। জ্ঞানীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির : ২৮)

আসমানি কিতাব যাবুরের শুরুতে লেখা আছে— رَأْسُ الْحِكْمَةِ خَشْيَةُ الله আল্লাহর ভয় সকল হেকমতের মূল। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৫৩৯৩)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, ইলম (জ্ঞান) আল্লাহর ভয়ের জন্য যথেষ্ট আর আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চনার জন্য মূর্খতা যথেষ্ট। (আযযুহদ, ইবনুল মুবারাক : ৪৬)

হযরত হাসান বসরী (র)-কে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন। প্রশ্নকারী বলেন, আমাদের তো অন্য উত্তর দিয়েছেন। হাসান বসরী (র) বলেন, তুমি কি কখনো কোনো ফকিহকে দেখেছ? ফকিহ তো তিনি যে রাতে নামায আদায় করে, দিনে রোযা রাখে এবং দুনিয়া বিমুখ হয়। (কুতুল কুলূব : ১ : ১৫৩)

একবার তিনি বলেন, ফকিহ হলো, যে কারও তোষামোদ করে না এবং কারও বিরোধিতা করে না। আল্লাহর হেকমত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়। কেউ সে হেকমত গ্রহণ করুক না বা না করুন সে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করে। (আয-যুহদ, ইবুনুল মুবারাক : ৩০)

সুতরাং ফকিহ হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানে। তাঁর পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে জানে। তাকে আলেমও বলে। হাদিসে এসেছে, আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের অন্তর্দৃষ্টি দান করেন। যে ব্যক্তির মাঝে এসকল গুণ থাকবে না, সে মূলত জ্ঞানী নয়; বরং প্রবঞ্চিত।

আরও একদল শিক্ষিত লোক আমল করে; কিন্তু শুধু বাহ্যিক ইবাদত করে এবং পাপ থেকেও বেঁচে থাকে। তারা অন্তরের নিন্দনীয় ত্রুটিসমূহের প্রতি মোটেই লক্ষ করে না। অহংকার, হিংসা, রিয়া, জাঁকজমকপ্রীতি, সুখ্যাতি তালাশ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকে না। অনেকে তো এগুলোকে দোষ বলেও মনে করে না। তারা এসব হাদিসের প্রতি লক্ষ করে না যে, সামান্যতম রিয়াও শিরক। যার অন্তরে কণা পরিমাণ গর্ব অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে যাবে না। হিংসা নেক কাজকে এমনভাবে খায়, যেভাবে আগুন লাকড়ীকে খায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সম্পদ ও সম্মান প্রীতি অন্তরে কপটতা সৃষ্টি করে। যেভাবে পানি উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।

এ ধরনের শিক্ষিত লোক নিজের বাহ্যিক আকৃতি খুব পরিপাটি করে, কিন্তু অন্তরের আকৃতি সম্পূর্ণ ভুলে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের বাইরের আকৃতি ও ধনসম্পদ দেখেন না; বরং অন্তর ও আমল দেখেন। মূলত অন্তরই আসল এবং মুক্তি ও নিরাপত্তা আমলের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ বলেন,

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

কিন্তু যে আল্লাহর নিকট আসে বিশুদ্ধ মন নিয়ে। (সূরা শুআরা : ৪৯)

এ ধরনের শিক্ষিত লোকদের উদাহরণ হলো মৃত মানুষের কবর, যা বাহ্যত খুব সুন্দর। কিন্তু ভিতরে গলিত লাশ অথবা অন্ধকার ঘর। যার ছাদে প্রদিপ জ্বালানো হয়েছে, ফলে ঘরের ছাদ আলোকিত হয়েছে; কিন্তু অভ্যন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে। অথবা ওই ব্যক্তির মতো, যে বাদশাহকে দাওয়াত করে এবং তার সম্মানার্থে ঘরের দরজায় রং করায়; কিন্তু ঘরের অভ্যন্তরে রং করায় না, যেখানে বাদশাহ বসবে ও আহার করবে। এটাও একটা নিশ্চিত প্রবঞ্চনা। সবেচেয়ে উত্তম উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি জমিতে বীজ বপন করে। অতঃপর উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। তার সাথে আগাছাও জন্মে, যে কারণে ফসল নষ্ট হয়। তখন তাকে বলা হলো, মূল থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে। তখন সে আগাছার মাথা ও ডালপালা কেটে ফেললো, কিন্তু মূল থেকে কাটলো না। ফলে এ আগাছা আরও মজবুত হয়ে উৎপন্ন হলো।

পাপের মূল শিকড় হলো মন্দ স্বভাব, যা অন্তরের গভীরে প্রোথিত। অন্তর থেকে এগুলো পরিষ্কার না করলে বাহ্যিক ইবাদত দ্বারা কি ফলাফল পাওয়া যাবে? যেমন— এক ব্যক্তির শরীরে খোস-পাঁচড়া দেখা দিল। চিকিৎসক তাকে মালিশ করার এবং পান করার ওষুধ দিল, যাতে মালিশের ওষুধ দ্বারা চামড়ার উপকার হয় এবং সেবনের ওষুধ দ্বারা মূল শিকড় ধ্বংস হয়। কিন্তু রোগী শুধু মালিশের ওষুধ লাগিয়েই ক্ষান্ত হলো এবং সেবনের ওষুধ ব্যবহার করলো না। বরং এমন নিষিদ্ধ আহার্য ভক্ষণ করল, যা দ্বারা খোস-পাঁচড়া আরও বেড়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে এই রোগীর খোস-পাঁচড়া দূর হওয়া আদৌ কি সম্ভব? রোগের মূলে প্রতিকার ছাড়া হাজার বার শরীরে ওষুধ মালিশ করেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। কেননা, জীবাণু তো ভিতরে রয়েছে। সেই জীবাণুবাহী রোগ সেরে গেলে এটাও সেরে যাবে।

শিক্ষিত লোকদের অপর দলটি এসব অভ্যন্তরীণ ত্রুটি সম্পর্কে জানে এবং এগুলো যে শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম তাও তাদের অজানা নয়। কিন্তু তারা নিজেদেরকে যেহেতু বড় মনে করে, সেহেতু তারা ধারণা করে, এসব ত্রুটি তাদের মধ্যে নেই। তাদের স্তর আল্লাহর কাছে এমন নয় যে, এসব বিষয় দ্বারা আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করবেন। এগুলো হলো সাধারণ মানুষকে পরীক্ষা করার বিষয়- তাদের ন্যায় শিক্ষিতদেরকে নয়। এরপর যখন তাদের নিকট থেকে অহংকার, জাঁকজমক, ও গর্বের চিহ্ন ফুটে ওঠে, তখন বলে— এটা অহংকার নয়; বরং তা ধর্মের সম্মান রক্ষার স্পৃহা এবং বিদ্যার মহিমা জাহির। কারণ, আমরা যদি খারাপ পোশাক পরি এবং মাজলিসে নিচে বসি, তাহলে দীনের দুশমনরা ঠাট্টা করবে, এতে আমাদের অপমান তথা ধর্মের অপমান হবে। এ ভ্রষ্ট লোকেরা জানে না যে, তাদের দুশমন তো মূলত শয়তান, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সাবধান করেছেন। শয়তান তাদের কার্যকলাপ দেখে উল্লাস করে। তারা একথাও জানে না যে, ধর্মের সাহায্য রাসূলুল্লাহ (স) কীভাবে করেছিলেন এবং কাফেরদেরকে কীভাবে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। তাঁর সাহাবীগণ কী পরিমাণ বিনয়ের অধিকারী ছিলেন। দারিদ্র্যকে কীভাবে অঙ্গের ভূষণ করে রেখেছিলেন। সিরিয়াতে হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট পোশাক পরিধানের ব্যাপারে আপত্তি তোলা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অতএব, আমরা অন্য কোনো বস্তুতে সম্মানের আশা করি না। এ প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা রেশমি ও চাকচিক্যপূর্ণ হারাম পোশাক এবং উট ও ঘোড়ার মাঝে দীনের ইজ্জত খুঁজে ফেরে। আবার এ দাবিও করে যে, এর মাধ্যমেই তারা দীনের সম্মান-মর্যাদা সমুন্নত করছে।

বর্তমানে হিংসাও মানুষ দীনের নুসরত হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন, কেউ কেউ তার সমবয়সী কারও সাথে হিংসা করে এবং মুখেও তা প্রকাশ করে; কিন্তু সে এটাকে হিংসা মনে করে না; বরং তারা বলে, আমার এ রাগ হলো হকের সমর্থন এবং বাতিল শক্তি প্রতিহতের প্রকাশ। বস্তুত দেখা যায় যে, কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে যদি অপমান করা হয় বা তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয় না; যেমনটা তার দাবি অনুযায়ী দীনের ক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে; বরং সে খুশি হয় আর তার সমবয়সীদের সাথে তার এ হিংসা মূলত তার অভ্যন্তরীণ পঙ্কিলতার কারণে।

এমনিভাবে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি তার ইলম ও আমলের মাধ্যমে রিয়া প্রকাশ করে থাকে। যদি কখনো তার মনে হয় যে, সে রিয়া করছে, তৎক্ষণাৎ তার এটাও মনে হয় যে, সে রিয়া করছে না; সে মনে মনে বলে, আমার ইলম ও আমল প্রকাশের কারণ হলো, মানুষ যেন আমার অনুসরণ করে দীনের হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। তারা আরও বলে আমি এজন্য খুশি হই না যে, আমার মধ্যে ইলম ও আমল রয়েছে; বরং আমার খুশির কারণ হলো, আমার মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথ খুঁজে পাবে। প্রকৃতপক্ষে এসকল প্রবঞ্চিত ব্যক্তি তাদের অনুসরণের কারণেই খুশি হয়ে থাকে। যদি তা না হতো তাহলে অন্য কারও অনুসরণেও তারা খুশি হতো। কিন্তু অন্যের অনুসরণে তারা খুশি হয় না। যেমন কোনো ব্যক্তির অনেকগুলো গোলাম অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মনিব তাদের সুস্থতা কামনা করে। চাই তা মনিবের হাতেই হোক বা অন্য কোনো ডাক্তারের হাতে। সে মূলত তাদের সুস্থতাতেই খুশি হয়।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রবঞ্চনায় ফেলার চেষ্টা শয়তানের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত বাকি থাকে। সে তাদের মনে একথার উদ্রেক করে যে, আমাদের খুশির কারণ হলো, আমাদের অনুসরণে মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে, আমরাও সওয়াব প্রাপ্ত হবে। সুতরাং আমাদের খুশির কারণ হলো, আল্লাহর সওয়াবপ্রাপ্তি। এ কারণে নয় যে, মানুষ আমাদের কথা গ্রহণ করবে। এটা তো মানুষের মুখের কথা, তার অন্তরের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। যদি কোনো পয়গম্বর তাদের কাছে এসে বলেন, ইলম প্রকাশ করার চেয়ে তা প্রকাশ না করা এবং গোপনে ইবাদত করার মধ্যে সওয়াব বেশি, এরপর তাকে আবদ্ধ করে জেলে বন্দি করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করবে। এবং এমন স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করবে, যেখানে সে ওয়াজ ও ইলম প্রকাশ করতে পারবে আর মানুষ তার অনুসরণ করবে।

এমনিভাবে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও আলেম বাদশাহদের কাছে যায়, তাদের সম্মান দেখায়, প্রশংসা করে বিনয় প্রকাশ করে। যখন তাদের মনে হয় যে, জালেম বাদশাহর সামনে বিনয় প্রকাশ করা হারাম তখন শয়তান তাদের বলে, বাদশাহকে সম্মান করা তোমার উদ্দেশ্য নয়; বরং তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে গরিব মুসলমানদের সাহায্য করা, তাদের থেকে ক্ষতি দূর করা এবং নিজের শত্রুর অনিষ্ট দূর করা। আল্লাহই তার মনের অবস্থা ভালো জানেন।

বস্তুত তারা যা প্রকাশ করে প্রকৃত অবস্থা তা নয়। কেননা, যদি তারই মতো কোনো আলেম বাদশার নৈকট্য লাভ করে, সকল মুসলমানের জন্য বাদশাহর কাছে সুফারিশ করে এবং তাদের ক্ষতি দূর করে তাহলে এটা তার কাছে কষ্টের কারণ হবে। বরং তার যদি সুযোগ হতো তাহলে বাদশাহর কাছে তার বিরুদ্ধে কান ভারি করতো।

শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে অনেক আলেম বাদশাহদের উপহার গ্রহণ করে থাকে। যখন তাদের মনে পড়ে যে, এটা হারাম তখন তাদের নফস বলে, এটা এমন সম্পদ, যার কোনো মালিক নেই, এটা মুসলমানদের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা উচিত। আর তুমি মুসলমানদের ইমাম, তাদের আলেম, তোমার মাধ্যমেই দীন কায়েম আছে। সুতরাং প্রয়োজন অনুপাতে তোমার জন্য এখান থেকে গ্রহণ করা কি জায়েয নেই? এক্ষেত্রে শয়তান কিছু বিষয়ে মানুষকে প্রবঞ্চনায় ফেলে।

এক. বাদশাহ প্রদত্ত সম্পদের কোনো মালিক নেই। যাকে তা প্রদান করা হয়েছে সে জানে যে, বাদশাহ মুসলমান ও জনসাধারণ থেকে টেক্স গ্রহণ করেছে। যার থেকে টেক্স নিয়েছে হয়তো সে জীবিত আছে অথবা তার ওয়ারিশগণ। মনে করুন, দশ পরিবার থেকে একশ দীনার নিয়ে বাদশাহ নিজের সম্পদের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে। এ সম্পদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং বাদশার জন্য আবশ্যক হলো ওই দশ পরিবারের মাঝে সম্পদ বণ্টন করা এবং প্রত্যেক পরিবারকে দশ দীনার করে ফিরিয়ে দেওয়া।

দুই. শয়তান বলেছে, এ সম্পদ মুসলমানদের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা হবে এবং আলেমদের এ ভুল ধারণা দিয়ে প্রবঞ্চিত করেছে যে, তার মাধ্যমে দীন কয়েম রয়েছে, অথচ সে দীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টিকারী, সে বাদশার উপহার জায়েয মনে করে গ্রহণ করে। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত এবং নেতৃত্বের আগ্রহী। এসকল লোকদের সংখ্যা দুনিয়াবিমুখ আল্লাহমুখি লোকদের চেয়েও অনেক বেশি। এ সকল লোক মূলত দীনের দাজ্জালস্বরূপ। শয়তানের মতবাদকে প্রতিষ্ঠকারী, দীনের ইমাম তারা নয়। ইমাম তো তারা, দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে যাদের অনুসরণ করা হয়। যেমন, নবী-রাসূল, সাহাবী এবং উলামায়ে সালাফ। আর দাজ্জাল তো তারা, যাদের অনুসরণ করা হয় আল্লাহ হতে বিমুখ ও দুনিয়ামুখি হওয়ার ব্যাপারে।

এ সকল লোকদের মৃত্যুতে মুসলমানদের জন্য ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি হয়। তারা নিজেদেরকে দীনের ভীত্তি বলে দাবি করে। তাদের উদাহরণ হলো হযরত ঈসা (আ)-এর বাণী, তিনি মন্দ আলেম সম্পর্কে বলেছেন,

اَلْعَالِمُ السُّوْءَ كَصَخْرَةٍ وَقَعَتْ فِيْ فَمِ الْوَادِيْ فَلَا هِيَ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَلَا هِيَ تَتْرُكُ الْمَاءَ يَخْلُصُ اِلَى الزَّرْعِ.

মন্দ আলেম হলো একটি পাথরের মতো, যা পানি প্রবাহের রাস্তায় পড়ে থাকে। না নিজে পানি গ্রহণ করে আর না শস্যক্ষেতে পানি যেতে দেয়। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৪১)

আরেকটি শ্রেণি হলো দীনের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের। যারা নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পবিত্র রাখে। সেগুলোকে ইবাদতের মাধ্যমে শোভিত রাখে। বাহ্যিক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। মানবীয় চরিত্র ও গুণাবলি গ্রহণ করে। যদি তাতে লৌকিকতা, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি থাকে তাহলে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করে। এতদসত্ত্বেও তারা প্রবঞ্চিত। কেননা, তার অন্তরে শয়তানের সূক্ষ ধোঁকা ও প্রবৃত্তি লুক্কায়িত থাকে এবং তা এতটাই সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে, তা উপলব্ধি করা খুবই কষ্ট সাধ্য হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি ছাড়া তা কেউ বুঝতে পারেনা।

এর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি তার ক্ষেত পরিষ্কার করতে চাইল। সে ক্ষেতের সব আগাছা কেটে ফেলল, কিন্তু মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা আগাছার প্রতি খেয়াল করলো না, যা কয়েকদিন পরই গজিয়ে উঠবে। এভাবে পরিষ্কার করে সে মনে করলো যে, ক্ষেত পরিষ্কার হয়ে গেছে। ফসলের ক্ষতি করার মতো কোনো আগাছা অবশিষ্ট নেই। তার এই উদাসিনতার ফলে কয়েকদিন পর সেই লুকিয়ে থাকা আগাছা মজবুত হয়ে গজিয়ে ওঠে। যা ফসল নষ্ট করে দেয়— কিন্তু কৃষক তা জানতেও পারে না। এমনিভাবে অনেক আলেম নিজের জ্ঞান অনুযায়ী সব কিছুই করে; কিন্তু সূক্ষ্ম ও গোপন বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। তুমি তাকে দেখবে, সে দিনরাত ইলমের কাজে ব্যস্ত। সে মনে করে, তার এ কাজ আল্লাহর দীন প্রকাশ ও শরীয়ত প্রচারে সহায়তা করছে; তবে তার মনে গোপন থাকে যে, এবং মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা তার কাছে ছুটে আসবে। সবার মুখে মুখে তার নাম থাকবে।

সর্বত্র তার ইলম, তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুষ তার শরণাপন্ন হবে। তাকে প্রাধান্য দিবে। তার দরবারে মানুষের ভিড় লেগে থাকবে। তার কথা লোকেরা মন দিয়ে শুনবে। তার আলোচনা শুনে মানুষ কাঁদবে আশ্চর্যান্বিত হবে। যখন তার আশেপাশে বন্ধুবান্ধব, শিষ্য, মুরীদদের দেখতে পায় তখন সে অত্যধিক আনন্দিত হয়। সমবয়সি ও সমপর্যায়ের হাজারো আলেমের মধ্যে ইলম, আমল, ওয়াজ ও তাকওয়াসম্পন্ন আলেম খুব কমই পাওয়া যায়। অন্যের মধ্যে এসকল গুণ দেখতে পেলে তার নিন্দা ও অপবাদের ক্ষেত্রে সে তার যবান বিরত রাখে না। অথচ এ প্রবঞ্চিত ব্যক্তি যে মর্যাদা, প্রশংসা, নেতৃত্ব নিয়ে গর্বিত, তা দুনিয়াদার ব্যক্তিদের দয়ায়। তারা যদি এ ব্যক্তি থেকে ফিরে যায় তাহলে সে দুঃখিত হবে। এ সকল নামধারী আলেম তার মুরিদদের মাঝে তারতম্য করে থাকে। যারা তার প্রতি বেশি ভক্তি দেখায় তাদেরকে সে প্রাধান্য দেয়। এর কারণ হিসেবে সে বলে, এরা আল্লাহকে বেশি ভয় করে, এরা আবেদ ও যাহেদ। মূলত সে তাদেরকে এজন্যই প্রাধান্য দেয় যে, তারা তার অনুসরণ বেশি করে। তার কথা শোনা, তার সেবাও অন্যদের চেয়ে বেশি করে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যখন তার অনুসরণ করে, তার ইলম দ্বারা উপকার লাভ করতে চায় তখন সে মনে করে যে, ইখলাস ও সততার কারণে মানুষ তার অনুসরণ করে। তখন সে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে যে, আল্লাহ তার যবান মানুষের উপকারের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং সে তার কাজকে গুনাহর কাফফারা মনে করে। অথচ সে নিজের নিয়তের শুদ্ধতার বিষয়টি অনুসন্ধান করে না। যদি এই নামধারী আলেমদের বলা হয়, দীন ও ইলম প্রচারের চেয়ে গোপনে নীরবে বসে আল্লাহর ইবাদত করায় অধিক সওয়াব পাওয়া যায় তাহলে সে তা করবে না।

কারণ, এতে তার প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হবে। সম্ভবত শয়তানের বক্তব্য দ্বারা এসকল লোকই উদ্দেশ্য। শয়তান বলে, যে ব্যক্তি দাবি করে, সে তার ইলমের মাধ্যমে আমার থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে, সে মূলত তার অজ্ঞতার কারণে আমার জালে ফেঁসে গেছে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৯ : ৩১৭)

অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষিত লোক কঠোর পরিশ্রম করে কিতাব লিখে। সে মনে করে আমি আল্লাহ তাআলার শিক্ষা প্রচার করছি যাতে

সাধারণ মানুষের ফায়দা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার লক্ষ থাকে ভালো রচনার মাধ্যমে মানুষের নিকট নাম-যশ ও সুখ্যাতি পাওয়া। এটা লক্ষ না হলে অন্য কেউ যদি এ কিতাব থেকে মূল লেখকের নাম মুছে ফেলে সেখানে নিজের নাম লিখে দেয়, তবে মূল রচয়িতা এটা অপছন্দ করে কেন? সে তো জানে যে, এই গ্রন্থ দ্বারা মানুষের যে ফায়দা হবে, তার সওয়াব সে-ই পাবে। আল্লাহর কাছে তো অজ্ঞাত নয় কে আসল রচয়িতা। কখনো গ্রন্থকার নিজের প্রশংসা নিজেই স্বীয় গ্রন্থে লিখে দেয়। বিস্তারিতভাবে অথবা সংক্ষেপে। কখনো বা অন্য লেখকের নিন্দা ও দোষত্রুটি উল্লেখ করে। যেন মানুষ তাকে ওই লেখকের চেয়ে উত্তম মনে করে। কখনো নিজের গ্রন্থে অন্য লেখকের এমন ইবারত (পাঠাংশ) লেখকের নামসহ উল্লেখ করে, যার মধ্যে কোনো ভুল আছে। আর ভালো ইবারত কারও নাম উল্লেখ ছাড়াই বর্ণনা করে দেয়। যাতে করে মানুষ এটাকে তার লিখনি শক্তি মনে করে। এমন লেখক চোরের মতো। অথবা অন্য লেখকের বক্তব্য কিছুটা পরিবর্তন করে উল্লেখ করে দেয়। এমন ব্যক্তি ওই চোরের মতো, যে অন্যের জামা চুরি করে তা পরিবর্তন করে ভিন্ন পোশাকে পরিণত করে পরিধান করে। যেন লোকেরা তাকে চোর না বলে। কখনো লেখক তার কথা সাজানো ও সুন্দর করার প্রতি সচেষ্ট হয়। যাতে পাঠক তার কথাকে দুর্বল মনে না করে। সে মনে করে এতে তার উদ্দেশ্য হলো হেকমত প্রচার করা এবং মানুষের উপকার করা। অথচ সে জানেই না যে, এক হাকিম হেকমতের ওপর তিনশ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তখন সে যুগের নবীর কাছে আল্লাহ ওহি পাঠালেন, তাকে বলে দাও, তুমি অনর্থক কথাবার্তা দিয়ে পৃথিবী ভরে ফেলেছ। আমি তোমার এর কিছুই গ্রহণ করব না। (কূতুল কুলূব : ২ : ২৩৩)

এসকল লোকেরা যখন নিজেরা পরস্পর মিলিত হয় তখন প্রত্যেকেই নিজেদের সমালোচনা করে। যখন তারা পৃথক হয় এবং নিজের সঙ্গীদের সাথে গিয়ে মিলিত হয় তখন সে লক্ষ করে, কার অনুসারি বেশি হয়। যদি তার অনুসারি বেশি হয় তাহলে সে খুব খুশি হয়। নিজেকে যোগ্য মনে করে। এরপর তারা পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ শুরু করে দেয়।

যদি কারও ছাত্র তার কাছ থেকে চলে গিয়ে অন্য আলেমের কাছে যায় তাহলে সে খুব কষ্ট পায়। ওই ছাত্রকে ঘৃণা করে। তাকে দেখতে চায় না,

স্নেহ করে না। তার কোনো প্রয়োজন পূরণ করে না যেমনটা ইতঃপূর্বে করতো। অথচ সে জানে, মানুষ অন্য আলেমের কাছে উপকার লাভের জন্য যেয়ে থাকে। এটাও তো হতে পারে, অন্য আলেমের কাছে তার দীনের উাপকার বেশি হবে অথবা কোনো বিপদের আশঙ্কায় সে এখান থেকে চলে গেছে। এরপর যখন কারও ব্যাপারে হিংসা শুরু হয় তখন তা প্রকাশ্যে প্রকাশ করতে পারেনা। তখন তার দীন ও তাকওয়া নিয়ে সমালোচনা করে। যখন রাগ সৃষ্টি হয় সে বলে, আমার এ রাগ আল্লাহর দীনের জন্য, নিজের জন্য নয়। তার সামনে যদি অন্য আলেমের প্রশংসা করা হয় তাহলে সে কষ্ট পায় আর যদি দোষ প্রকাশ করা হয় তাহলে সে আনন্দিত হয়। যদিও সে গীবত অপছন্দ করার ভান করে। তাদের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। উল্লেখিত সব বিষয়ই অন্তরের গোপন দোষ। শুধু বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই তা উপলব্ধি করতে পারে। মনের দিক দিয়ে শক্তিশালি ব্যক্তিরাই তা থেকে বাঁচতে পারে। আমাদের মতো দুর্বল ব্যক্তিদের এসকল দোষত্রুটি থেকে বেঁচে থাকা দুষ্কর। এক্ষেত্রে মানুষের করণীয় হলো, সে নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে জানবে, সেগুলোকে মন্দ মনে করবে এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করবে।

আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তাকে তার দোষত্রুটি জানিয়ে দেন। যে ব্যক্তি নেক কাজে খুশি হয় এবং পাপ কাজে অসন্তুষ্ট হয়, তার নাজাতের আশা করা যায়। তার সংশোধন দ্রুত আশা করা যায় ওই প্রবঞ্চিত ব্যক্তি থেকে, যে নিজেকে পবিত্র মনে করে। নিজের ইলম ও আমলের কারণে আল্লাহর ওপর ইহসান মনে করে। নিজেকে সর্বোত্তম মনে করে। আমরা উদাসিনতা ও প্রবঞ্চনা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই এবং এমন দোষত্রুটি জানা থেকে পানাহ চাই, যার সংশোধন হয় না। এ পর্যন্ত ওই সকল লোকদের আলোচনা বর্ণনা করা হলো, যারা ইলম অর্জন করেছে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমলে ত্রুটি করেছে। যখন আমরা ওই সকল লোকদের আলোচনা করবো। যারা অনর্থক জ্ঞান অর্জন করে তুষ্ট থেকেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেনি। এরাও প্রবঞ্চিত। এর কারণ হলো, হয়তো তারা ওই ইলমের মূল বিষয় থেকে নির্মুখাপেক্ষি হয়ে গেছে, তারা অনর্থক ইলম নিয়েই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

আরও এক শ্রেণি হলো ওই সকল লোক, যারা পার্থিব মুয়ামালা ও মামলা-মুকদ্দামার ক্ষেত্রে ফতোয়ার ইলম অর্জনে সীমাবদ্ধ থাকে। আর এ

ফতোয়া প্রদানকে ফিকহ নামে বিশিষ্ট করে। এক্ষেত্রে তারা এতটাই মশগুল থাকে যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলের প্রতি তাদের কোনো খেয়ালই থাকে না। না যবানকে গিবত থেকে মুক্ত রাখতে পারে, না পেটকে হারাম থেকে বাঁচতে পারে। বাদশাহদের কাছে যেতেও তাদের পা আটকায় না। সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একই অবস্থা হয়। তাদের অন্তর অহংকার, হিংসা, রিয়া ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক দোষ থেকে বেঁচে থাকতে পারে না। এ সকল লোক ইলম ও আমল উভয় দিক থেকে প্রবঞ্চিত।

আমলের প্রবঞ্চনা

আমলের দিক থেকে প্রবঞ্চিত হওয়ার আলোচনা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তার উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যার অর্শ ও গেজ-ভগন্দব রোগ হয়েছে। ক্রমশ সে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হচ্ছে। এখন তার ওষুধ ও তা ব্যবহার পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। কিন্তু সে হায়েয-নিফাস সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতদিন তা নিয়ে গবেষণা করে। অথচ সে একজন পুরুষ। তার কোনো হায়েয নিফাস হয় না। সে বলে, হতে পারে কোনো নারী এ রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার কাছে এর চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চাইবে। এটা তো চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রবঞ্চনা। আলোচ্য ফকীহরও একই অবস্থা। কখনো কখনো তার ওপর দুনিয়ার মোহ, প্রবৃত্তির অনুসরণ, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক দোষ প্রভাব বিস্তার করে। হতে পারে সে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাওবা করার সুযোগ পাবে না এবং আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। এ দিকে খেয়াল না দিয়ে সে সলম, ইজারা, যিহার, লিআন, হায়েয ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ তার জীবনে এ সকল বিষয়ের প্রয়োজন পড়বে না। যদি অন্য কারও প্রয়োজন পড়ে তাহলে সে ক্ষেত্রে অসংখ্য মুফতী রয়েছেন। এরপরও সে এ সকল বিষয়ে আগ্রহী ও ব্যস্ত আছে। কেননা, এ সকল বিষয়ে মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদ রয়েছে। এটা শয়তানের প্রবঞ্চনা। কিন্তু প্রবঞ্চিত ব্যক্তি তা বুঝতে পারে না। প্রবঞ্চিত ব্যক্তি এটা ভেবে খুশি থাকে যে, সে দীনের ফরয বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছে। অথচ সে জানে না যে, ফরযে আইন না জেনে ফরযে কেফায়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা গুনাহ। এটা ওই সময় প্রযোজ্য, যখন তার নিয়ত সহিহ থাকে।

ইলমের প্রবঞ্চনা

ইলমের দিক থেকে প্রবঞ্চনা হলো, সে ফতোয়ার জ্ঞানের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে। সে মনে করে, ফতোয়ার জ্ঞানই দীনের প্রকৃত জ্ঞান। অথচ সে মৌলিক জ্ঞান তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানকে ছেড়ে দেয়। কখনো তারা মুহাদ্দিসদের ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করে যে, তারা তো হাদিস বর্ণনাকারী ও বই-প্রস্তুক বহনকারী। এর মর্মার্থ তারা বোঝে না। এ ধরনের ফকিহ সচ্চরিত্রতা থেকেও বঞ্চিত থাকে। আল্লাহর বড়ত্ব ও প্রতাপের ইলমও তার নেই। অথচ ওই ইলমের মাধ্যমে অন্তরে ভয়, বিনয় ও তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

ফকিহকে দেখা যায়, সে আল্লাহর ভয় থেকে নিরাপদ থাকে। নিজের ব্যাপারেই সে প্রবঞ্চিত থাকে। সে এ ভেবে নিশ্চিত থাকে যে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে রহম করবেন। কেননা, তার মতে সে তো দীনের ভিত্তিস্বরূপ। সে যদি ফতোয়া নিয়ে কাজ না করতো তাহলে হালাল-হারামের বিধান অকেজো হয়ে যেতো। সে মূলত মৌলিক ইলম ছেড়ে দিয়েছে। সে উদাসিন ও প্রবঞ্চিত। তার প্রবঞ্চণার কারণ হলো, শরীয়তে ফিকহের অনেক ফযিলত বর্ণিত রয়েছে। ফিকহ শব্দে সে প্রবঞ্চিত হয়েছে। ফিকহ মূলত এমন ইলমের নাম, যার মাধ্যমে আল্লাহর জাত ও সিফাত সম্পর্কে ইলম হাসিল হয়। আর ওই ইলমের মাধ্যমে অন্তরে ভয় ও তাকওয়া সৃষ্টি হয়। আল্লহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দীন শিক্ষা করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা তাওবা : ১২২)

অর্থাৎ, ফিকহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই ইলম, যার মাধ্যমে ভয় সৃষ্টি হয়। আর এ ইলমের উদ্দেশ্য হলো, মুয়ামালার শর্ত সাপেক্ষে সম্পদ রক্ষা, সম্পদের মাধ্যমে শরীর হেফাযত, নির্যাতন ও হত্যা প্রতিহত করা। কেননা, সম্পদ হলো আল্লাহর রাস্তায় একটি অসিলা মাত্র। আর শরীর

হলো বাহন স্বরূপ। আর মৌলিক ইলম হলো, সুলুকের পথ চেনা এবং মন্দ গুণাবলির ঘাট অতিক্রম করা। আর এ মন্দ গুণাবলিই বান্দা ও তার স্রষ্টার মাঝে অন্তরায়।

ফিকহের ইলমের ওপর নির্ভরকারীর উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে হজে যাওয়ার রাস্তা না খুঁজে মোজা ও মশক তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মোজা ও মশক ব্যতীত হজের সফর কষ্টকর হবে; কিন্তু কেবল এ দুই বস্তুর ওপর নির্ভর করে তো হজ হয় না। ফিকহের ওপর নির্ভরশীল অনেক আলেম শুধু মতভেদপূর্ণ মাসআলা এবং বিরোধী পক্ষকে হারানোর জন্য দলিল আত্মস্থ করে। সে চায় মতভেদপূর্ণ মাসআলা নিয়ে এক বিতর্ক হোক। বিরোধী পক্ষকে দাঁত ভাঙা জবাব দিবে এবং বিজয়ী হবে। দিনরাত সে ইমামদের মতভেদপূর্ণ বক্তব্য, সমবয়সী আলেমদের দোষ অন্বেষণ করে। বিভিন্নভাবে তাদের কষ্ট দেয়, এ হচ্ছে মানুষের পশুত্ব সুলভ স্বভাব।

তাদের ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, সমবয়সীদের ওপর গর্ব করা। অথচ ওই সকল ইলমের প্রতি তাদের খেয়াল নেই, যার মাধ্যমে আল্লাহর পথে চলার সাহায্য পাওয়া যায়। অন্তর থেকে মন্দ গুণাবলি দূর হয়ে যায় এবং ভালো গুণাবলি অর্জন করা যায়। এই সকল ইলমকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং এগুলোকে ওয়ায়েজদের বাণী ও মূল্যহীন বিষয় মনে করে। তাদের কাছে ইলম হলো এমন বিষয়, যার মাধ্যমে দুজন বিতর্ককারীর একজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। এরা তো পূর্বোল্লিখিত মুফতীদের চেয়েও এগিয়ে আছে। তারা তো ফরযে কিফায়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলো আর এরা বিদআত ও পাপের মধ্যে আছে। শরয়ী বিধিবিধানের দলিল কুরআন-সুন্নায় বিদ্যমান। তর্ক-বিতর্ক, সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা, প্রশ্ন উত্থাপন ও খণ্ডন এ সবকিছুই বিদআত। কেবল বিপক্ষ দলকে চুপ করানো এবং নিজে বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে এ বিদআত চালু হয়েছে। তাদের এ প্রবঞ্চনা ফকিহদের প্রবঞ্চনা থেকেও গুরুতর।

আবার দেখা যায় কিছু শিক্ষিত লোক বিদআতিদের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকার উদ্দেশ্যে কালাম শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র পড়ে। তারা বিরোধী দলের আপত্তিসমূহ তালাশ করার কাজে এবং তাদেরকে জব্দ করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের কাজে সব সময় মশগুল থাকে। এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন উক্তি

মুখস্থ করে। তাদের বিশ্বাস, ঈমান ব্যতীত মানুষের কোনো আমল সহীহ হয় না। যে পর্যন্ত মানুষ আমাদের বিতর্ক না শিখে এবং কালাম শাস্ত্রের দলীলগুলো না জানে, সে পর্যন্ত ঈমান সহিহ হয় না। তারা আরও মনে করে, আল্লাহকে কেউ আমাদের চেয়ে অধিক চিনে না। যে আমাদের মাযহাবে বিশ্বাসী নয় এবং আমাদের শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত নয়, সে বেঈমান। এই ধরনের তর্কবাগিশ দু'শ্রেণিতে বিভক্ত— এক শ্রেণি ভ্রান্ত এবং অপর শ্রেণি হকপন্থি। ভ্রান্ত তারা, যারা হাদিসের বিপরীত দিকে আহ্বান করে। আর হকপন্থি তারা, যারা হাদিস ও সুন্নাহর দিকে আহবান করে। কিন্তু বিভ্রান্তি উভয় শ্রেণির মধ্যেই কমবেশি রয়েছে।

এই বিভ্রান্তির কারণ, তারা তাদের গোমরাহি সম্পর্কে গাফেল এবং মনে করে এতেই নিজেদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। এদের মধ্যেও অনেকে এমনও আছে, যারা এক দল আরেক দলকে কাফের সাব্যস্ত করে। হকপন্থির বিভ্রান্তি এই যে, তারা মুনাযারাকে আবশ্যকীয় ও অত্যন্ত সওয়াবের কাজ মনে করে। তারা এ বিষয়ের প্রবক্তা যে, তাদের ন্যায় বিতর্ক অন্বেষণ না করা পর্যন্ত কারও ধর্ম পূর্ণতা পায় না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলকে বাহাস ও প্রমাণ ছাড়া সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তার ঈমান পরিপূর্ণ নয়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা সারা জীবন বিতর্কানুষ্ঠান, চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা আয়ত্তকরণ এবং বিদআতিদের আপত্তি খণ্ডনে কাটিয়ে দেয় এবং নিজের অন্তরের কোনো খবর রাখে না। ফলে প্রকাশ্য গুনাহ ও অভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটি দেখতে পায় না। তাদের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকত, তাহলে অবশ্যই ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থার প্রতি লক্ষ করতো, যে যুগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারা অনেক বিদআতি ও নফ্সের পূজারি দেখেছেন; কিন্তু আপন জীবন ও ধর্মকে তর্কবাণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেননি; এমনকি কখনও এ সম্পর্কে আলোচনাও করেননি। বেশি থেকে বেশি প্রয়োজন মুতাবিক কিছু কথা বলেছেন, যাতে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তার ভ্রষ্টতার কারণ জেনে যায়। তারা যখন এমন কোনো পথহারা কাউকে তার বিচ্যুতিতে বাড়াবাড়ি করতে দেখেছেন, তখন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছেন— জীবনভর তর্কবিতর্ক করেননি।

আগেকার মনীষীরা বলেছেন, সুন্নাহর প্রতি দাওয়াত দেওয়া সুন্নত এবং দাওয়াতের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত না হওয়াও সুন্নত। আবু উমামা বাহিলী (রা)- থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে জাতিকে হিদায়াত দান করা হয়, তারা বিভ্রান্ত হয় না যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একদিন আল্লাহর রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে এসে দেখলেন, তারা পরস্পর তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছেন। এতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং রাগে ক্ষোভে তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন,

اَلِهٰذَا بُعِثْتُمْ أَمْ بِهٰذَا أُمِرْتُمْ اَنْ تَضْرِبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَا أُمِرْتُمْ بِهٖ فَاعْمَلُوْا اَوْ مَانَهَيْتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

এ কারণেই কি তোমরা প্রেরিত হয়েছ? এজন্যই তোমরা আদিষ্ট হয়েছ যে, আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা প্রহার করো? দেখ, তোমরা যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তার প্রতি লক্ষ করো আর যা করতে বারণ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত থাক। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৮৫)

সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতি আল্লাহর রাসূল (স) প্রেরিত হয়েছিলেন। তারপরও তিনি অন্য ধর্মাবলম্বী লোকদের সঙ্গে বিতর্ক সভায় বসেননি তাদেরকে অভিযুক্ত করতে অথবা জব্দ করতে বা কোনো আপত্তির জবাব দিতে কিংবা নিজের পক্ষ থেকে আপত্তি করার লক্ষ্যে। তিনি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুধু তাদের সাথে বিতর্ক করেছেন, যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। এর বেশি তর্ক করেননি। কারণ, বেশি কথাবার্তার কারণে তাদের অন্তর বিক্ষিপ্ত হতো এবং নানা ধরনের আপত্তি ও সন্দেহ সংশয় দেখা দিত, যা অন্তর থেকে কখনো দূর হতো না। তবে কি তিনি তাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে অযোগ্য ছিলেন? বরং বিজ্ঞ ও সাবধানী ব্যক্তিমাত্রই বিতর্ককে পছন্দ করেন। অতএব ততটুকু বিতর্কই আমাদের করা দরকার, যতটুকু সাহাবায়ে কেরাম ইহুদী, খ্রিস্টান ও বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে করেছেন। তাঁরা সারা জীবন এসব বিতর্কে কাটিয়ে দেননি। এছাড়া যে বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, তাতে আমরা এতটুকু মনোযোগী হব কেন? কোনো বিদআতির সাথে বিতর্ক করলে দেখা যায় যে, সে বিতর্কের ফলস্বরূপ বিদআত ত্যাগ করে না। বরং ঈর্ষার

মাত্রা অনুসারে তার বিদআত আরও বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় এসব বিরোধীর সাথে তর্ক করার চেয়ে আত্মসংশোধনে তাগিদ দেওয়াই বড় কাজ। এটা তখন, যখন ধরে নেওয়া যায় যে, আমাদেরকে বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু যেখানে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে, সেখানে কাউকে বিতর্ক করে সুন্নতের প্রতি ডাকা যেন এক সুন্নত ত্যাগ করে অন্য সুন্নত পালন করার শামিল।

আরও এক শ্রেণির শিক্ষিত লোক ওয়ায-নসীহতে মশগুল থাকে। তাদের মধ্যে অতি সম্মানী তারা, যারা অন্তরের গুণাবলি অর্থাৎ, আল্লাহ ভীতি, আশা, ধৈর্য, শোকর, তাওয়াক্কুল, সংসার বিমুখতা, বিশ্বাস, আন্তরিকতা, সততা ইত্যাদি বিষয় মানুষকে শুনায়। তারা এই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত যে, যেহেতু তারা এ সকল গুণ বর্ণনা করে, তাই তারা নিজেরা প্রথমে এসব গুণের অধিকারী হন। কিন্তু আল্লাহর নিকট তারা এসব গুণে গুণী নয়। কিছু গুণ তাদের মধ্যে থাকলেও, সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও কিছু না কিছু থাকে। এরা চরম অহংকারের অধিকারী হয়। কারণ, তারা সীমাহীন আত্মতুষ্টিতে ভোগেন। তারা মনে করেন, তারা ইলমে মুহাব্বতের বিষয় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিধায় তারাই আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত পোষণকারী। ইখলাসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানে বিধায় তারাই ইখলাসের অধিকারী। নফসের গোপন দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত বিধায়— প্রবৃত্তি ও নফসের তাড়না থেকে তারা মুক্ত। যদি সে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা না হতো, তার পক্ষে আল্লাহর নৈকট্য ও আল্লাহ থেকে দূরত্বের হাকিকত সম্পর্কে অবগত হতো না। সুলূক ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর পথে বিচরণ এবং বিচরণের সময় মনযিলসমূহ কীভাবে অতিক্রম করতে হয় সে তা জানতো না। এরূপ ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি মনে করে সে খোদাভীরু একজন মানুষ অথচ বাস্তবে সে আল্লাহর আযাব থেকে সাময়িক নিরাপত্তাপ্রাপ্ত একজন মানুষ। সে মনে করে, সে আখেরাত প্রত্যাশী, অথচ নফসের প্রতারণায় পতিত সর্বস্ব হারানো একজন মানুষ। সে মনে করে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীর ও ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট। অথচ বাস্তবে সে তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট নয়। সে মনে করে সে তাওয়াক্কুলের অধিকারী। অথচ বাস্তবে সে সম্মান, প্রতিপত্তি, সম্পদ ও বাহ্যিক আসবাবের ওপর নির্ভরশীল। তাহলে তাদের বিশেষ মর্যাদা

কোথায়? তারা যখন বর্ণনা করে, তখন বর্ণনার মধ্যেও ইখলাসের তোয়াক্কা করে না। রিয়ার কথা যখন উল্লেখ করে, তখন নিজেরাও রিয়ামুক্ত হয় না। সংসার অনাসক্তির বর্ণনাও এজন্যে করে যে, তারা নিজেরা সংসারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

মোটকথা, তারা বাহ্যত মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে। কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে পলায়ন করে। অপরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে; কিন্তু নিজেরা দূরে সরে যায়। তথা ইখলাসের প্রতি উৎসাহ দেয়। অথচ বাস্তবে সে মুখলিস নয়। সে মন্দ চরিত্র সমূহের খারাপি বর্ণনা করে অথচ সেই তাতে লিপ্ত। যে মানুষকে সৃষ্টি থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহমুখি হতে বলে। অথচ সেই সৃষ্টির প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী। যদি কোনো ব্যক্তিকে তার মজলিস থেকে বারণ করা হয়, যে মজলিসে বসে সে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে, এতে সে খুব বেশি মন:ক্ষুণ্ন হয়। সে মনে করে, মানুষের আত্মশুদ্ধিই তার উদ্দেশ্য। অথচ তার মতো যদি আরেকজন উদ্ভব হয়, যার কাছে মানুষ গমন করে, তার হাতে আত্মশুদ্ধির সবক নেয় তবে সে হিংসায় পুড়ে মরে। তার কাছে যারা আসে তাদের কেউ যদি তার কাছে অন্য একজনের প্রশংসা করে, তবে সেই তার প্রতি সর্বাধিক ক্রোধান্বিত হয়।

দীন বিষয়ে এরাই সবচেয়ে বেশি উদাসীন, দীন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনে এবং ভুল হলে দিনের দিকে প্রত্যাবর্তনে এরাই সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী। কারণ একমাত্র ইলমই তাকে প্রশংসিত চরিত্র গ্রহণে উৎসাহী এবং মন্দ চরিত্র বর্জনে আগ্রহী করতে পারে। এ ব্যক্তি এ সম্পর্কে অবগত কিন্তু তা তাকে কোনো ফায়েদা দেয়নি। দীনের প্রতি মানুষকে আহ্বানের আগ্রহ তাকে দীনের ওপর আমল করা থেকে বারণ করেছে। সুতরাং কী দিয়ে সে প্রতিকার করবে? কী দিয়ে তাকে খোদাভীতির কথা বলা যাবে, যেখানে সে নিজেই মানুষের সামনে খোদাভীতি সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও হাদিস পাঠ করে, তার আলোচনায় মানুষের মাঝে খোদাভীতি সঞ্চার হয় অথচ সে খোদাভীতি অবলম্বন করে না? হ্যাঁ যদি সে মনে করে, এ প্রশংসিত গুণসমূহ তার মধ্যে আছে তবে তার উচিত প্রায়োগিকভাবে অর্থাৎ, নিজের তার ওপর আমল করে তার দিকে মানুষকে পথপ্রদর্শন করা। এর উদাহরণ, যেমন যদি আল্লাহর মহব্বতের দাবিদার

হয় তবে দেখতে হবে সে আল্লাহর ভালোবাসার কারণে পার্থিব ভালোবাসার কোন কোন বিষয় বর্জন করেছে? নিজের মধ্যে আল্লাহভীতির কারণে কী কী গুনাহ থেকে বিরত থাকলো? সে যদি দুনিয়াবিমুখতার দাবি করে, দেখতে হবে, দুনিয়াবিমুখতার কারণে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কী কী বর্জন করে? সে যদি আল্লাহর নৈকট্যের দাবি করে, দেখতে হবে কোন সময় তার নির্জনতা পছন্দ হয় এবং লোকচক্ষুর আড়াল গ্রহণ করে? না বরং এমন হয়, সে মনকে আনন্দে ভরপুর দেখে যখন মুরিদেরা তাকে ঘিরে রাখে। তাঁকে দেখবে, একাকী আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হয় না। আপনি এমন কোনো নৈকট্যপ্রার্থী প্রেমিককে দেখেছেন যে প্রেমাষ্পদের কাছে যে ভীত বা অনাগ্রহী এবং অন্য কারও কাছে যেতে তার ভালো লাগে?

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এসব গুণের মাধ্যমে নিজেদের যাচাই করেন এবং বাস্তবার্থেই তা পেতে চান। বাহ্য বেশভূষা গ্রহণ করে তারা তৃপ্ত হয় না। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে মজবুত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই পরিতৃপ্ত হয়। অহংকারী ও প্রবঞ্চনার শিকার মানুষ নিজেদের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করে। ফলে আখেরাত তাদের আড়ালে সরে যাবে, তারা লজ্জিত হবে। বরং তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামের আগুনে তাদের নাড়িভূঁড়ি বের হয়ে আসবে। নাড়িভুঁড়ি নিয়ে তারা ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা চাক্কি নিয়ে ঘোরে।

হাদিসে এমনটিই এসেছে। কারণ তারা সৎপথের আদেশ করতো। কিন্তু নিজেরা তদনুযায়ী আমল করতো না। অসৎকাজ থেকে বারণ করতো, নিজেরা বিরত থাকতো না। এ লোকগুলো প্রবঞ্চনার শিকার হওয়ার কারণ হলো, এদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে খুব কম জ্ঞানই অর্জিত হয়েছে।

অতঃপর এ সত্ত্বেও তারা এসকল তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে সক্ষম হয়েছে বলে তারা ধারণা করে বসে যে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের ইলম দিয়েছেন তাদের কথায় মানুষ উপকৃত হচ্ছে, এজন্যই তারা এ বিষয়গুলো আলোচনা করতে পারছে। তারা ভুলে গেছে যে, মানুষ তো কেবল তাদের বাহ্য আলোচনাই গ্রহণ করে। আর আলোচনা আসে জানাশোনা ও মৌখিক বাচনভঙি থেকে। জানাশোনা আসে শিক্ষার্জন থেকে। এ বিষয়গুলোর

কোনোটিই প্রশংসিত গুণাবলির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ের গুণে গুণান্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমান একে অপর থেকে পৃথক হতো না। বরং কখনো তার নিরাপত্তা কমে যায় এবং ভয় বেড়ে যায়। মানুষের প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আর তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা কমে যায়।

এ ব্যক্তি ওই অসুস্থ ব্যক্তির মতো যে খুব ভালোভাবে রোগ ও রোগের পথ্য বর্ণনা করতে পারে, সুস্থতা ও আরোগ্যের কথা বলতে পারে। পক্ষান্তরে অন্য একজন অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা, আরোগ্য, তার উপকরণ স্তর ও প্রকার বিষয়ে বলার ক্ষমতা রাখে না। এ দুই ব্যক্তি অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এক হলেও চিকিৎসার বিষয়ে বলা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নয়। এখন সে যদি চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান থাকার কারণে নিজেকে সুস্থ মনে করে তবে তা হবে চরম মূর্খতা। এমনিভাবে কেউ যদি আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা, তাওয়াক্কুল, দুনিয়াবিমুখতা ইত্যাদি সব বিষয়ে জ্ঞান রাখে কিন্তু এসব গুণে গুণান্বিত না হয় সে ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে প্রবঞ্চনার শিকার। এ অবস্থা হচ্ছে সেসব ওয়াজকারীর, যাদের ওয়াজ নিষ্কলঙ্ক এবং বর্ণনা নির্ভুল অর্থাৎ, যারা কুরআন হাদিস ও হযরত হাসান বসরী (র) প্রমুখের তরীকা অনুযায়ী ওয়াজ করে।

কিন্তু আরেক শ্রেণির ওয়াজকারী ওয়াযের অপরিহার্য নিয়ম-পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত। আজকালকার সকল ওয়াজকারীই এমনি ধরনের। আল্লাহ রক্ষা করেছেন, এমন বিরল কেউ থাকতে পারে। কিন্তু আমি এমন কাউকে জানি না। এ ধরনের ওয়ায়েজ মানুষকে নতুন কথা শুনানোর জন্য অনেক মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বিবেক ও আইন বহির্ভূত কথাবার্তা বর্ণনা করে। কেউ কেউ সাজানো-গুছানো ও ছন্দময় বাক্য ব্যবহার করে এবং প্রমাণস্বরূপ বিরহ ও মিলনের কবিতা আবৃত্তি করে, যাতে মানুষ ভাবাতিশয্যে চিৎকার করে ওঠে। এরা মানুষরূপী শয়তান। নিজেরাও গোমরাহ এবং অপরকেও গোমরাহিতে টেনে নিয়ে যায়। কারণ, প্রথমোক্তরা নিজেদের সংশোধন না করলেও অন্যদের সংশোধন করেছে। তাদের আলোচনা ও ওয়াজ-নসিহতকে সংশোধন করেছে। পক্ষান্তরে এ শ্রেণির লোকগুলো আল্লাহর পথ থেকে লোকজনকে বারণ করে, প্রত্যাশার বাণী শুনিয়ে মানুষকে আল্লাহর সম্পর্কে প্রবঞ্চনার দিকে নিয়ে যায়। তাদের বক্তব্য শুনে মানুষ

আরও বেশি গুনাহের প্রতি সাহসী এবং দুনিয়াদারির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিশেষত ওয়ায়েজ বা বক্তা যদি পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘোড়া ও বাহনে সজ্জিত হয়। কারণ সে ওই ওয়ায়েজ ও বক্তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগা-গোড়া দুনিয়ার প্রতি লোভী হিসেবে দেখতে পায়। এ ব্যক্তি মানুষকে সংশোধনের চেয়ে প্রতারণায় বেশি ফেলবে। কোনো প্রকার সংশোধনই সে করবে না। এবং অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করবে। তাই তার প্রবঞ্চনার শিকার হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।

আরেক দল ওয়ায়েজ দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গদের উক্তি হুবহু মুখস্থ করে নেয় এবং এসব উক্তির সঠিক অর্থ না বুঝে মজলিসে বর্ণনা করে। আর মনে করে যে, তাদের প্রত্যেক লোকই মনে করে, সে এ একটি বিষয় দিয়ে জনসাধারণ এবং সেনাবাহীনির লোকজন থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কারণ সে দুনিয়াবিমুখ বুজুর্গ ও দীনদার মানুষের আলোচনা মুখস্ত করে নিয়েছে তাই সে সকল উদ্দেশ্যে পৌঁছেছে এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে। তার ধারণা, সে নিজেরে জাহের ও বাতেনকে গুনাহ থেকে হেফাজত না করলেও সে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ। সে মনে করে দীনদার বুজুর্গদের উক্তি মনে রাখাই তার জন্য যথেষ্ট। এ দলের মৌন প্রবঞ্চনা প্রথমোক্ত দলের প্রবঞ্চনার চেয়ে অধিক স্পষ্ট।

আরেকদল মানুষ আছেন তাঁরা নিজেদের সবটুকু সময় ইলমে হাদিসের পেছনে ব্যয় করেন। অর্থাৎ শায়খদের থেকে হাদিস শ্রবণে, হাদিসের বহুবিধ রেওয়ায়াত জমা করার কাজে এবং দুর্লভ উঁচুমানের সনদের খোঁজে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন। এক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা থাকে তারা দেশ-বিদেশ ঘুরবেন আর হাদিসের শায়খদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। যাতে পরবর্তী সময় বলতে পারেন, আমি অমুক অমুক থেকে হাদিসক বর্ণনা করি, অমুক অমুক শায়খের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার কাছে এমন সব সনদ আছে যেগুলো অন্য কারও কাছে নেই।

এদের আত্মপ্রবঞ্চনার দিকগুলো হচ্ছে

১. তারা পুস্তক বহনকারীদের মতো। কারণ তারা সুন্নাহর অর্থ বোঝার পেছনে সময় ব্যয় করে না। ফলে তাদের জ্ঞান থাকে সীমাবদ্ধ। তারা কেবল হাদিস বর্ণনাতেই সক্ষম। তারা মনে করে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট।

২. হাদিসের অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম না হলে হাদিসের ওপর আমলও করে না। কখনো আংশিকের অর্থ বুঝতে সক্ষম হলেও তদনুযায়ী আমল করে না।

৩. আত্মশুদ্ধি সম্পর্কিত যে জ্ঞান শিক্ষা করা ফরজে আইন, তারা তা বর্জন করে। তারা সনদ বাড়ানো এবং উঁচু সনদের খোঁজে সময় ব্যয় করে। যদিও এসবে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

৪. হাদিস শ্রবণের যেসব শর্ত আছে সেগুলো মানে না। কারণ, শুধু শ্রবণের কোনো ফায়েদা না থাকলেও হাদিস প্রমাণের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কারণ হাদিস প্রমাণের পরই তা বোঝার কথা আসে। বোঝার পর তার ওপর আমল। সুতরাং প্রথমে হলো শ্রবণ, তারপর বোঝা, তারপর মুখস্ত করা, তারপর তদনুযায়ী আমল করা, তারপর হাদিসের প্রচার প্রসারের কাজ। আর এসব লোক এ সকল কাজ বাদ দিয়ে কেবল শ্রবণেই সীমাবদ্ধ থাকে। শ্রবণের ক্ষেত্রেও তারা বাস্তবিক শ্রবণকে বর্জন করে। আপনি দেখবেন, ছোটো শিশুরা গিয়ে হাদিসের দরসে বসে। অতঃপর হাদিসের দরসে শায়খ ঘুমান আর শিশুটি খেলাধুলায় মগ্ন হয়ে পড়ে, অতঃপর লেখক শিশুর নামও উল্লেখ করে দেয়। অতঃপর শিশুটি যখন বড় হয়, অন্যদের হাদিস শোনানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রাপ্তবয়স্ক বালক যদি হাদিস শ্রবণের মজলিসে উপস্থিত হয় কখনো সে শ্রবণ করে না, শ্রবণ করলেও মনোযোগ দেয় না এবং ভালোভাবে তা মুখস্ত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে না। কখনো সে একটি হাদিস নিয়ে বা লিপির কাজে ব্যস্ত থাকে। আর যে শায়খের সামান্য হাদিস পড়া হচ্ছে যদি তার কোনো ভুল ধরা হয় বা তার সামনে পাঠকৃত হাদিসের পরিবর্তন করা হয় তাহলে শায়খ তা বুঝতে সক্ষম হয় না এবং তা বোঝে না। এসবই মূর্খতা ও প্রবঞ্চনা।

অথচ হাদিসের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আপনি তা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনবেন। অতঃপর যেভাবে শুনেছেন ঠিক সেভাবেই হেফজ করবেন। যেভাবে হিফজ করেছেন ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে বর্ণনা করবেন। সুতরাং বর্ণনা হতে হবে হেফজ থেকে আর হিফজ হতে হবে শ্রবণ থেকে।

যদি আপনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শ্রবণে অক্ষম হন তাহলে সাহাবী অথবা তাবেয়ী থেকে শ্রবণ করবেন। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শ্রবণ করেছে, তার শ্রবণ যেমন, আপনার ওপরস্থ বর্ণনাকারী থেকেও আপনাকে সেভাবে শুনতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে মনযোগসহ শ্রবণ করে তা মুখস্থ করতে হবে। অতঃপর যেভাবে শুনেছেন, ঠিক সেভাবে অন্যের কাছে বর্ণনা করতে হবে এবং যেভাবে শুনেছেন, হুবহু সেভাবে মুখস্থ করতে হবে। একটি হরফও তাতে পরিবর্তন করতে পারবেন না। অন্য কেউ যদি তাতে একটি হরফও পরিবর্তন করে এবং ভুল করে, তার ভুল সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। দুভাবে আপনি হাদিস সংরক্ষণ বা হেফজ করতে পারেন।

১. স্মৃতি শক্তিতে তা সংরক্ষণ করবেন। সবসময় তা আলোচনা করবেন।

২. যেভাবে শ্রবণ করেন, সেভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। লিপিবদ্ধ হাদিস তাসহীহ করবেন এবং এমনভাবে সংরক্ষণ করবেন যাতে পরিবর্তন করতে পারে এমন কারও হাতে তা না পৌঁছে। উক্ত কিতাব আপনি নিজের সঙ্গে নিজের সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণ করবেন। কারণ অন্য কারও হাতে গেলে সে তা পরিবর্তন করতে পারে। যদি আপনি হেফজ না করেন তাহলে তার পরিবর্তনের বিষয়ে টের পাবেন না। আপনি যদি এভাবে যত্ন নেন তাহলে তা আপনার স্মৃতিশক্তি অথবা কিতাবে সংরক্ষিত থাকবে। যদি কিতাবে লেখা থাকে তবে তা দেখে আপনি আবার পড়ে নিতে পারেন। এতে আপনি পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে রক্ষা পাবেন।

আপনি যদি মুখস্থ না করে বা লিখে তা সংরক্ষণ না করেন, একটি উদাসীন শব্দ আপনার কানে ঢোকে আর এভাবেই আপনি মজলিস থেকে পৃথক হন। অতঃপর আপনি উক্ত শায়খের কোনো একটি নুসখা বা কিতাব হাতে পেলেন এবং আপনার মনে হলো, তাতে আপনার শ্রবণের সঙ্গে এর মিল নেই বা তাতে পরিবর্তন আছে তাহলে আপনার জন্য একথা বলা সহিহ হবে না যে আমি এ কিতাব শুনেছি কারণ, হতে পারে তাতে যা আছে আপনি শোনেনি। বরং এতে যা আছে তার ভিন্ন কিছু শুনেছেন। তা এক শব্দে হলেও। যদি আপনি স্মৃতিশক্তিতে তা সংরক্ষণ না করেন কিংবা নির্ভরযোগ্য কোনো নুসখা আপনার কাছে না থাকে যা দিয়ে আপনি ভুলের মোকাবিলা করতে পারেন, তাহলে আপনি কীভাবে জানবেন যে আপনি তা শুনেছেন? অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না। (বনি ইসরাঈল : ২৬)

বর্তমান যুগের যে সকল শায়খ বলে থাকেন, এই কিতাবে যা আছে তা আমি শায়খ থেকে শ্রবণ করেছি, তার উক্ত শ্রবণ যদি উপরোক্ত শর্ত মোতাবেক না হয় তাহলে তা সুস্পষ্ট মিথ্যা বলে গণ্য হবে।

শ্রবণের সর্বনিম্ন শর্ত হলো শায়খ যা বলেন, আপনাকে সব কথা শুনতে হবে এবং এমনভাবে মুখস্থ করতে হবে যে তা কেউ পরিবর্তন করলে যেন আপনি শুনে বুঝতে পারেন। শিশু, উদাসীন, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও প্রতিলিপি করে এমন ব্যক্তির শ্রবণ থেকে যদি লেখা বৈধ হয় তবে তো দোলনায় থাকা শিশু ও পাগলের শ্রবণ থেকেও লেখা বৈধ হবে।

অতঃপর শিশু যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে এবং পাগলের যখন হুশ ফিরবে তাকে দিয়েও পাঠ শ্রবণ করিয়ে নেওয়া বৈধ হবে। অথচ তা যে অবৈধ এ ব্যাপারে কোনো মতান্তর নেই। শিশুর শ্রবণ থেকে যদি লেখা বৈধ হয় তাহলে গর্ভপাত শিশুর শ্রবণ থেকে লেখা বৈধ হবে। সুতরাং দোলনায় থাকা শিশু যে কিছু বোঝে না এবং মুখস্থ করতে পারে না তার শ্রবণ থেকে যদি না লেখা যায়, যে শিশু খেলাধুলা করে, যে প্রতিলিপিকরণে উদাসীন এবং যে পাগল তার কাছ থেকে কি লেখা বৈধ হবে? কোনো মূর্খ যদি দুঃসাহস দেখিয়ে বলে, দোলনায় থাকা শিশুর শ্রবণ থেকে লেখা যাবে তার উচিত গর্ভের বাচ্চার শ্রবণ থেকেও লেখা। যদি সে উভয়ের মাঝে এ পার্থক্য করে যে গর্ভের বাচ্চা শব্দ শুনতে পায় না আর সাধারণ শিশু শব্দ শুনতে পায় তাহলে বলবো, এ বাচ্চা শব্দ শুনতে পেলেও এ কারণ কী লাভ দেবে? তাকে তো হাদিসই বর্ণনা করতে হবে। সে তো শব্দ বর্ণনা করবে না?

শায়খ হওয়ার পর সে এ বলেই ক্ষান্ত থাকবে, আমি বালেগ হওয়ার পর জানতে পারি, ছোটো বেলায় আমি হাদিস বর্ণনার একটি মজলিসে উপস্থিত হই। আমার কানে তখন হাদিস বর্ণনার শব্দ প্রবেশ করেছে। তবে আমি জানি না। হাদিসটি কী ছিলো। এরকম বর্ণনা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ নয়। এ অবস্থায় যদি সে কিছু বর্ণনা করে তবে তা হবে সুস্পষ্ট মিথ্যা। আরবি ভাষা জানে না এমন কোনো তুর্কির হাদিস গ্রহণ যদি ধর্তব্য হয় তাহলে দোলনায় থাকায় শিশুর শ্রবণও ধর্তব্য হবে। অথচ এটা

চরম মূর্খতা, কোত্থকে একটি গ্রহণ করা হবে? সেই শ্রবণ' কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যে শ্রবণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ হাদিস অনুযায়ী হয়নি? তিনি বলেছেন,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا.

আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করুন যে আমার বক্তব্যশুনে তা স্মৃতিতে ধারণ করেছে। অতঃপর তা অন্যদের নিকট তেমন প্রচার করেছে যেমন সে শুনেছে। (সুনানে আবু দাউদ : ৩৬৬০; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৩০)

এটি আত্মপ্রবঞ্চনার সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রকার। বর্তমান যুগের মানুষ এ কাজে লিপ্ত। যদি লোকজন সাবধানতা অবলম্বন করে, তারা শায়খদের পাবে না। কেবল এমন কোনো শায়খই পেতে পারে, যে শিশুকালে উদাসিনতা নিয়ে এ পদ্ধতিতে হাদিস শ্রবণ করেছে। এ হলো উপরোক্ত দলের আত্মপ্রবঞ্চনা। আর যদি তারা শর্ত মোতাবেক শ্রবণ করেন, তাহলেও বর্ণনার কাজেই সীমাবদ্ধ থেকে আত্মপ্রবঞ্চনায় ভোগেন। বহুবিধ রেওয়ায়াত ও সনদ অনুসন্ধানে তারা পুরো জীবন ব্যয় করছে। দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ নেই। বরং যে ব্যক্তি হাদিস পড়ে আখেরাতের পথে চলতে চায় তার জন্য সারা জীবনে একটি মাত্র হাদিসের ওপর আমল করা যথেষ্ট। জনৈক শায়খ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একটি হাদিস শ্রবণের মজলিসে উপস্থিত হন। ওই মজলিসে সর্বপ্রথম এ হাদিসটি বর্ণনা করা হয়—

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ.

ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক কাজ বর্জন করা। (তিরমিযী : ১৪৮৯)

এ হাদিস শুনে তিনি মজলিস ছেড়ে বেরিয়ে যান। আর মনে মনে বলেন, আমার জন্য এটিই যথেষ্ট। এর উপর আমল করি, তারপর অন্য হাদিস শ্রবণ করব। বিচক্ষণ মানুষের শ্রবণ এমনই হয়, যারা আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে বেঁচে থাকেন।

আরেকদল মানুষ আছে, এরা ভাষা, ব্যাকরণ, নাহু সরফ, কবিতা ও ভাষার দুর্লভ বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত। এ নিয়ে তারা বেশ অহংকার ও আত্মপ্রবঞ্চনায় ভোগেন, তারা নিজেদের ক্ষমাপ্রাপ্ত মনে করে। তাদের ধারণা কেবল তারাই ওলামায়ে উম্মত। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ হলো দীনের জীবন্তিকা।

আর কুরআন-সুন্নাহ বোঝার জন্য ভাষা ও ব্যাকরণ জানা জরুরি। তাই এ লোকগুলো নাহু সরফের সূক্ষ্ম কায়দা-কানুন, কাব্য রচনা, ভাষার দুর্লভ বিষয়গুলোতে নিজেদের মগ্ন রাখে। তাদের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে তার সারা জীবন হরফ উচ্চারণ সুন্দর ও বিশুদ্ধকরণ এবং লেখনী পদ্ধতির পিছনে ব্যয় করে। সে মনে করে ইলম আত্মস্থ করার জন্য লেখার বিকল্প নেই। এ কারণে প্রথমে লেখনী শাস্ত্র অর্জন করতে হবে। যদি সে বুদ্ধিমান হতো তাহলে সে প্রয়োজন পরিমাণ লেখা শিখতো, যার দ্বারা লিখিত বিষয় পড়া যায়।

এমনিভাবে ভাষা সাহিত্যিক যদি বুদ্ধিমান হতো তাহলে সে বুঝতে পারতো যে, আরবি ভাষা মূলত তুর্কি ও হিন্দি ভাষার মতোই। আরবি ভাষা আত্মস্থ করতে গিয়ে সময় নষ্ট তুর্কি ও হিন্দি ভাষা শিখতে গিয়ে সময় নষ্ট করার মতো। তবে এ দুই ভাষার মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, আরবি ভাষায় শরিয়ত প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি শরিয়তের ইলম অর্জন করতে আরবি ভাষা শিখতে চায় তাহলে তার জন্য শুধু কুরআন-হাদিসে বর্ণিত দুর্লভ শব্দসমূহের ইলম অর্জন করাই যথেষ্ট। আর কুরআন-হাদিসের সংশ্লিষ্ট পরিমাণ নাহু (ব্যাকরণ) শাস্ত্র শিখবে।

চূড়ান্ত পর্যায়ের পাণ্ডিত্য অর্জন করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং কেউ যদি এ সকল শাস্ত্রের ওপর ভরসা করে শরিয়তের মর্ম ও তার ওপর আমল করা থেকে বিমুখ থাকে, সে প্রবঞ্চনায় নিমজ্জিত।

নাহু, ভাষা, সাহিত্য, কেরাত ইত্যাদি শাস্ত্রে লিপ্ত আলেমদের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে পাত্র পরিষ্কার ও ঝকঝকে করায় লিপ্ত; কিন্তু যা কিছু ওই পাত্রে রয়েছে, যার মাধ্যমে মূল বিষয় অর্জন হবে, তা থেকে বিরত থাকে। সবার জানা উচিত যে, মূল শাঁস হচ্ছে আমল আর এর উপরের আবরণ হচ্ছে আমল সম্পর্কে জানা। এর পূর্বে শব্দ শোনা, তা মুখস্থ করা, নাহু শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করা ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে খোসার মতো।

আলোচ্য স্তরসমূহের কোনো একটি স্তরকে চূড়ান্ত পর্যায় মনে করা একটি ধোঁকা; বরং এগুলো ওপরে পৌঁছার জন্য মঞ্জিল মনে করলে প্রয়োজন পরিমাণ অগ্রসর হবে। এভাবে সে এক পর্যায়ে আমলের শাঁস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এমন ব্যক্তি নিজের অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকৃত আমল

অন্বেষণ করে। নিজের জীবনকে তাতেই পরিব্যাপ্ত রাখে এবং আমলের পরিশুদ্ধি ও তাকে বিপদ থেকে রক্ষার পেছনেই জীবন পার করে দেয়।

শরিয়তের সকল জ্ঞান দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আমল। বাকি সব জ্ঞান তার সেবক, মাধ্যম ও খোসাস্বরূপ। যে ব্যক্তি এ গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না, সে ব্যর্থ।

যেহেতু এ সকল ইলম শরিয়তে ইলমের সাথে সম্পৃক্ত, তাই যারা এসব ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত তারা ধোঁকায় পতিত যে, তারা শরয়ী ইলম অর্জন করছে, যা তাদের মাগফেরাতের জন্য যথেষ্ট।

আর চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত ও কারিগরি ইত্যাদি শাস্ত্র যেগুলো শরিয়তের ইলম নয়, সে সম্পর্কে এ বিশ্বাস হয় না যে, এগুলোর মাধ্যমে মাগফেরাত লাভ হবে, এ কারণে এসব শাস্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তি কম প্রবঞ্চিত হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শরিয়তের সকল ইলম প্রশংসিত। তবে কিছু ইলম মূল শাঁসের ও জবের খোসা আর কিছু ইলম শাঁস পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যমে। সুতরাং খোসাকে মূল উদ্দেশ্য মনে করা এক প্রবঞ্চনা।

ফকিহদের প্রবঞ্চনা

ফকিহদের প্রবঞ্চনা অন্য ইলম অর্জনকারীদের চেয়ে বেশি। তারা মনে করে, যে ফায়সালা তারা দিয়ে থাকে সেটাই আল্লাহর ফায়সালা। এ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়ে বান্দার হক নির্ণয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। অস্পষ্ট শব্দের ভুল-সঠিক ব্যাখ্যা করে থাকে। বাহ্যিক অর্থেই তারা ধোঁকায় পড়ে এবং ভুল রায় প্রদান করে। এ ধরনের ভুল তাদের ফতোয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন কারও কারও ফতোয়া হলো, স্ত্রী যদি তার মহর মাফ করে দেয় তাহলে স্বামী আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে মুক্ত। এ ধারণা ভুল। অনেক সময় এমন হয় যে, স্বামীর খারাপ আচরণে স্ত্রী মহর মাফ করে দিতে বাধ্য হয়। তখন মহর মাফ করে দিয়ে তার থেকে মুক্তি পেতে চায়। এ মহর মাফ সন্তুষ্টচিত্তে হয় না। আল্লাহ বলেছেন,

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا.

সন্তুষ্টচিত্তে তারা মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা সছন্দে ভোগ করবে। (সূরা নিসা : ৪)

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মহর মাফ করার ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি থাকা শর্ত।

মানুষ অনেক কাজ করে, কিন্তু তাতে সন্তুষ্টি থাকে না, আর এটা তখন জরুরিও নয়। যেমন মানুষ শিঙ্গা লাগাতে চায় কিন্তু তার নফস তা পছন্দ করে না। মহর মাফের ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি হলো, কোনো প্রয়োজন বা বিনিময় ছাড়া মাফ করা। কিন্তু এখানে সে দুটি বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। (মহর মাফ করে তালাক নিবে অথবা মাফ না করে স্বামীর খারাপ আচরণ গ্রহণ করবে) সুতরাং সে সহজ পন্থতি গ্রহণ করেছে। মূলত এটি একটি আর্থিক জরিমানা। যাতে মনের সন্তুষ্টি থাকে না।

তাছাড়া দুনিয়ার বিচারক মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। তারা বাহ্যিক অবস্থার ওপর রায় দিয়ে থাকে। কেননা, স্ত্রী তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে না, মনে গোপন রাখে, যা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু বড় বিচারক মহান আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে বিচার করবেন তখন একথায় কোনো লাভ হবে না যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ওই মহিলার অসন্তুষ্টি ছিলো না।

এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত নেওয়া জায়েয নেই। যেমন, জনসমাবেশে কারও কাছে সম্পদ বা অর্থ চাওয়া হলো। সে মানুষের নিন্দা ও অপমাণের ভয়ে তা দিয়ে দিল; কিন্তু যদি তার কাছে একাকী চাওয়া হতো তাহলে সে দিতো না। এমনকি এ অর্থ দেওয়ার কারণে যদি সে কষ্ট পায় তাহলে এভাবে টাকা নেওয়া আর আর্থিক জরিমানার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কোনো পার্থক্য নেই। কেননা আর্থিক জরিমানা না দিলে শারীরিক কষ্ট দেওয়া হয় আর এখানে আত্মিক কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহর কাছে বাহ্যিক কষ্ট ও অভ্যন্তরীণ কষ্টের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সবই তাঁর কাছে প্রকাশিত। দুনিয়ার বিচারক মানুষের বাহ্যিক কথা আমি দিয়ে দিলাম -এর বিবেচনা করে রায় দিয়ে দেয় যে, এটা হেবা হয়ে গেছে। মানুষের অন্তর সম্পর্কে তো তার কোনো ধারণা নেই।

কেউ যদি জবানের অনিষ্টতা ও চুগলখরি থেকে বাঁচার জন্য কাউকে অর্থ প্রদান করে, তাহলে এ অর্থ গ্রহণ করা হারাম।

এমনিভাবে এ পন্থতিতে যে অর্থই গ্রহণ করা হোক তা হারাম। হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনা বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাঁর ভুল ক্ষমা করে দিয়েছিলেন কিন্তু প্রতিপক্ষের বিষয়টি তখনও বাকি ছিলো। দাউদ (আ)

বললেন, হে প্রভু, আমার প্রতিপক্ষের বিষয়টি মীমাংসা কীভাবে হবে? আদেশ করা হলো, তার থেকে ভুল ক্ষমা করিয়ে নাও। ওই ব্যক্তি মৃত ছিলো। আদেশ এলো, বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথরকে সম্বোধন করে ডাক দাও। তিনি লোকটির নাম ধরে ডাকে দিলেন। তখন আওয়াজ এলো, হে আল্লাহর নবী! আমি হাজির। আপনি আমাকে জান্নাত থেকে ডেকেছেন, বলুন কী চান আপনি। নবী বললেন, আমি তোমার সাথে যে আচরণ করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও। লোকটি ক্ষমা করে দিলো। দাউদ (আ) ফিরে এলেন। জিবরাঈল (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তাকে বিস্তারিত সব খুলে বলেছেন? দাউদ (আ) না। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি পুনরায় তার কাছে গিয়ে বিস্তারিতভাবে বলুন। দাউদ (আ) আবার গিয়ে তাকে ডাকলেন, আমি তোমার সাথে এক অন্যায় করে ফেলেছি। লোকটি বললো, আমি তো এজন্য আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি তো আমাকে জিজ্ঞেস করোনি। আমার অন্যায়টা কী? লোকটি বললো, সে কী? তখন তিনি বিস্তারিভাবে সব খুলে বললেন এবং মহিলার কথাও বললেন, তখন লোকটি চুপ হয়ে গেলো, কোনো কথা বললো না, দাউদ (আ) বললেন, এখন কোনো উত্তর দিচ্ছো না যে? লোকটি বললো, হে আল্লাহর নবী! নবীগণ এমন কাজ করতে পারেন না।

এ বিষয়টি এখন আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হবে এবং এর ফায়সালা সেখানেই হবে। দাউদ (আ) খুব কান্নাকাটি করলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তার সাথে অঙ্গীকার করে বললেন, কেয়ামতের দিন তিনি মাফ করিয়ে নিবেন। (তাফসীরে তাবারী : ১২ : ১৭৯)

এ দ্বারা বোঝা গেলো যে, সন্তুষ্টি ছাড়া দানে কোনো ফায়দা নেই। আর মনের সন্তুষ্টি প্রকাশ করার মাধ্যমে জানা যায়। সুতরাং মহর মাফ করা ও হেবা করার ক্ষেত্রে মনের সন্তুষ্টি তখনই ধর্তব্য হবে যখন ইচ্ছাধিকারের সাথে সাথে তাকে একাকি ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তার নিজের পক্ষ থেকে হেবা (দান) ও মাফ করার প্রেরণা সৃষ্টি হবে। জোরপূর্বক অথবা কোনো কৌশলে প্রভাবিত হয়ে মাফ করা বা দান করায় সন্তুষ্টি ধর্তব্য হবে না। এমনিভাবে একটি ফিকহী কৌশল হলো, যখন সম্পদ এক বছর পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি হয় তখন স্বামী তার সম্পদ স্ত্রীকে দান করে দেয়। যেন যাকাত দিতে না হয়।

এমন ব্যক্তির ব্যাপারে ফকীহ বলে থাকেন, তার জিম্মায় যাকাত ওয়াজিব নয়। কারণ, সম্পদ তার মালিকানায় নেই। এ ব্যক্তি দুনিয়াবী বিধান থেকে বেঁচে গেলে; কিন্তু আখেরাতের বিধান থেকেও সে বেঁচে যাবে এটা ভুল ধারণা। যাকাত ফরয করার কারণ হলো, মানুষের অন্তর কৃপণতার কদর্যতা থেকে পরিষ্কার করা। কেননা, কৃপণতা এক ধ্বংসাত্মক রোগ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

(শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৭৩১)

সুতরাং যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানের ভয়ে স্ত্রীকে সম্পদ দিয়ে দেয় তার এ কাজ কৃপণতার অনুসরণের দৃষ্টান্ত। সে মনে করে, এ কাজের মাধ্যমে সে মুক্তি পেয়ে যাবে; কিন্তু আখেরাতের ধ্বংস থেকে সে মুক্তি পাবে না। আল্লাহ তার অন্তরের অবস্থান এবং সম্পদের প্রতি তার মোহ ও লিপ্সা সম্পর্কে অবগত আছেন।

সম্পদের প্রতি লোভের কারণে সে এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সে যাকাত না দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছে। অথচ এ কৌশলের কারণে তার নাজাতের পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

আর এটা হয়েছে তার অজ্ঞতা ও প্রবঞ্চনার কারণে।

ফকীহদের কৌশলের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহ তাআলা ফকীহ ও দীনের সেবকদের কল্যাণার্থে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ গ্রহণের বৈধতা দিয়েছেন। কিন্তু তারা প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির মাঝে কোনো পার্থক্য করে না। তারা নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার জন্য যাকে মাধ্যমে মনে করে তাকেই প্রয়োজন হিসেবে গণ্য করে। এরা প্রবহমান ছাড়া কিছুই নয়। দুনিয়া সৃষ্টির কারণ হলো, বান্দা যেন ইবাদত ও আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে তা থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং দীন ও ইবাদতের ক্ষেত্রে বান্দা যে বস্তুর সহযোগিতা নিবে, সেটাই তার জন্য প্রয়োজন, বাকি সব অতিরিক্ত ও প্রবৃত্তি।

মোটকথা, এই শেষ যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্তি গণনার বাইরে। নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটি বিভ্রান্তি উল্লেখ করা হলো।

১. সংসারবিরাগী ও ইবাদতকারীদের বিভ্রান্তি

তারাও বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। কেউ নামাযে, কেউ তিলাওয়াতে, কেউ হজে, কেউ জিহাদে এবং কেউ সংসার বিমুখতায় বিভ্রান্ত হয়। তবে জ্ঞানীরা কখনো বিভ্রান্ত হয় না। এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। এদের মধ্যে একশ্রেণির লোক ফরয ত্যাগ করে নফল ও মুস্তাহাব নিয়ে মশগুল থাকে। যেমন, কেউ ওযু করতে গেলে নানা ধরনের সংশয়বশত সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। এমনকি, শরীয়তের দৃষ্টিতে যে পানি পবিত্র, তাতেও তাদের সন্দেহ থাকে এবং অপবিত্রতার দূরবর্তী সম্ভাবনাকেও তারা নিকটবর্তী জ্ঞান করতে থাকে। অথচ হালাল খাবারের ব্যাপারে তারাই নিকটবর্তী সম্ভাবনাকে দূরবর্তী মনে করে; বরং মাঝে মধ্যে হারামও খেয়ে ফেলে। তারা যদি পানির সতর্কতাকে খাওয়ার মধ্যে ব্যবহার করতো, তবে এটা সাহাবায়ে কিরামের মতোই হতো। একবার হযরত উমর (রা) জনৈক খ্রিস্টান মহিলার কলস থেকে পানি নিয়ে উযু করে নেন। অথচ নাপাকির সম্ভাবনা প্রবল ছিল। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর এতদূর সতর্কতা ছিল যে, অনেক হালাল জিনিসও হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে পরিত্যাগ করতেন। এই গোমরাহদের অনেকেই অযু-গোসলে পানির অপচয় করে। অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত রয়েছে। কেউ কেউ এতই সন্দেহপ্রবণ যে, অযু করতে করতে জামাত শেষ হয়ে যায় অথবা নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। সময় থাকলেও নিঃসন্দেহে তারা গোমরাহ।

প্রকৃতপক্ষে শয়তান মানুষকে খুব উত্তম উপায়ে ইবাদত থেকে দূরে রাখে। এ ধরনের ধারণা সৃষ্টি করে, মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কারও কারও নামাযের নিয়ত করার সময় সন্দেহ সৃষ্টি হয়। শয়তান তাদেরকে নিয়ত ঠিক করে নেওয়ার সময় দেয় না; বরং এতটা ব্যস্ত রাখে যে, হয় জামাত শেষ হয়ে যায়, না হয় নামাযের সময় চলে যায়। তারা যদি তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বেঁধে নেয়, তাহলে নামায সঠিক হওয়ার সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। কখনো আল্লাহু আকবার বলার মধ্যে এত সন্দেহ করে যে, সতর্কতার আতিশয্যে তাকবীরের শব্দ পর্যন্ত পাল্টে যায়। নামাযের সূচনাতে এ অবস্থা হয়, এরপর পুরো নামাযে অমনোযোগী থাকে এবং মন উপস্থিত থাকে না। বিভ্রান্তির বেড়াজালে তারা ভাবে যে, এসব

কাণ্ড আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়। কিছু লোকের উপর আলহামদু ও অন্যান্য সকল ওযীফার মাখরাজসহ বিশুদ্ধ উচ্চারণের সন্দেহ থাকে। তারা সবসময়ই এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করে এবং একেই জরুরি মনে করে অন্যান্য বিষয়ে চিন্তাই করে না। তারা আয়াতের অর্থ, তার শিক্ষা ও রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার সাথে কোনো সম্পর্কই রাখে না। এটা বড় ভুল। কেননা, আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমনভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার আদেশ করেছেন, যেমন তারা দৈনন্দিন কথাবার্তা বলে। অতএব, এতে এ ধরনের বানোয়াট এল কোথা থেকে? তাদের উপমা এমন, যেমন কোনো লোককে বাদশার নিকট একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পাঠানো হলো। সে বাদশার দরবারে গিয়ে বার্তার শব্দগুলোর সঠিক উচ্চারণে পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট করল এবং প্রতিটি শব্দকে ঠিক করতে গিয়ে কয়েকবার উচ্চারণ করল। কিন্তু বার্তার বিষয়বস্তু কী ছিল এবং বাদশার দরবারের আদব কী কী ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলো না।

এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক ঘাস কাটার মতো কুরআন পাঠ করে। তারা মাঝে মধ্যে একদিনে এক খতম করে ফেলে। তারা মুখে কুরআন পাঠ করে; কিন্তু মনের আনন্দে নানা ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা চালাচালি করতে থাকে। অর্থের দিকে তো কোনো মনোযোগই থাকে না যে শাস্তিবাণী ও উপদেশবাণী দ্বারা অন্তর কিছুটা প্রভাবিত হবে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানবে। আয়াতের শিক্ষণীয় স্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এ ব্যক্তি এ কারণে প্রবঞ্চিত যে, সে মনে করে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হলো মুখে পড়তে থাকা। এর মর্ম বুঝে আসুক বা না আসুক।

এমন ব্যক্তি ওই গোলামের মতো, যাকে তার মনিব একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। যেখানে কিছু আদেশ নিষেধ বাক্য লেখা ছিলো। গোলাম চিঠি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আমল করার পরিবর্তে বাক্যগুলো মুখস্থ করে বারবার পড়তে লাগলো। এমন গোলামকে মনিবের নাফরমান বলাই স্বাভাবিক এবং সে শাস্তিযোগ্য হবে। সুতরাং কেউ যদি কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য শুধু মুখে পাঠ ও গুনগুন করে পড়া মনে করে তাহলে এটা ভুল ও প্রবঞ্চনা।

কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তা ভুলে না যাওয়া। স্মরণ রাখা। স্মরণ রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা আর অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার ওপর আমল করা এবং উপকার লাভ করা।

অনেক তেলাওয়াতকারীর কণ্ঠ খুব মধুর হয়ে থাকে। সে তেলাওয়াতে আনন্দ লাভ করে থাকে এবং প্রবঞ্চিত হয় এ ভেবে যে, এটা আল্লাহর মুনাজাত ও তাঁর কালাম শ্রবণের আনন্দ। মূলত এটা তার সুন্দর কণ্ঠের আনন্দ। যদি ওই কণ্ঠে কোনো কবিতা বা বানী পাঠ করা হয় তবু সে আনন্দিত হবে। এমন ব্যক্তি প্রবঞ্চিত।

কারণ, সে একথা ভেবে দেখেনি যে, তার এ আনন্দ কুরআনের শব্দ ও মর্মের কারণে না কি সুন্দর কণ্ঠের কারণ। (যদি সে এ বিষয়টি বুঝে নিত তাহলে প্রবঞ্চিত হতো না।)

কিছু মানুষ আছে যারা রোযা রাখতে পাগল থাকে। তারা সবসময় অথবা পবিত্র দিনগুলোতে রোযা রাখে। কিন্তু নিজের জিহ্বাকে গীবত থেকে, অন্তরকে লৌকিকতা থেকে, উদরকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখে না। সারাদিন অনর্থক বকবক করতে থাকে। তারপরও কিন্তু নিজেকে উত্তম মনে করে। যা ফরয তা করে না এবং নফল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাও আবার যেমনটা করা, তেমনটা করে না। এটা সরাসরি প্রতারণা।

কিছু লোক আছে যারা হজের কাজে ব্যস্তত্রস্ত। অথচ তারা অন্যের হক ও ঋণ আদায় না করে, পিতামাতার অনুমতি ছাড়া এবং হালাল পাথেয় সঙ্গে না নিয়েই হজ করতে চলে যায়। পথিমধ্যে নামায ও অন্যান্য ফরয কাজ বিনষ্ট করে কাপড় ও শরীরের পবিত্রতার প্রতি খেয়াল থাকে না। সফরের খরচের জন্য অন্যের দারস্ত হয়। পথিমধ্যে অশ্লীল কথাবার্তা ও ঝগড়া থেকে বিরত থাকে না। অনেকে হারাম টাকা সাথে নিয়ে যায় এবং সফরের সাথীদের জন্য খরচ করে। আর উদ্দেশ্য থাকে নাম-যশ লাভ করা। সে প্রথমত হারাম অর্জন করে আল্লাহর নাফরমানি করেছে। দ্বিতীয়ত লৌকিকতার উদ্দেশ্যে খরচ করে গুনাহ করেছে। এভাবে যখন বাড়ি ফিরে আসে, তখন অন্তরে কুস্বভাব ও বদস্বভাবের ভাণ্ডার থাকে। এরপরও তারা হজ করাকে ভালো মনে করে। আরেক দল আছে, যারা মানুষের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়ে তাদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে নিজেকে ভুলে যায়। কাউকে সৎকাজের আদেশের সময় কঠোরতা অবলম্বন করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে নিজের কর্তৃত্ব ও সম্মান প্রকাশ করা। আর নিজে যখন কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। তখন কেউ এর বিরোধিতা করলে সে রাগান্বিত হয়ে বলে, আমি তোমাদের

তত্ত্বাবধানে আছি, আমার বিরোধিতা তোমরা কীভাবে করতে পারো? তারা লোকদের মসজিদে একত্র করে, কেউ যদি দেরিতে আসে, তাকে কঠোর ভাষা শোনায়। তাদের উদ্দেশ্য থাকে নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করা।

কিছু লোক আছে, যারা মসজিদের সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়। এমনকি আযানও তারা দেয়। তারা মনে করে এ আযান তারা আল্লাহর জন্য দেয়; কিন্তু কেউ যদি তাদের অনুপস্থিতে আযান দেয় তাহলে তার ওপর চড়াও হয়। তাকে জিজ্ঞেস করে, কেন সে তার হক নষ্ট করেছে? কেন তার কাজে হস্তক্ষেপ করেছে? কখনো সে নিজেই ইমামতি করে, এ উদ্দেশ্যে যে, লোকে তাকে ইমাম বলবে, এ কারণে কেউ যদি তার চেয়ে আগে বেড়ে যায় তাহলে খুব অসন্তুষ্ট হয়। যদিও ওই ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক যোগ্য হয়ে থাকে।

কিছু লোক রয়েছে, যারা মক্কা-মদিনায় বসবাস করে এবং এ নিয়ে তারা প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। তারা নিজের অন্তরের পর্যবেক্ষণ করে না এবং নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তর পবিত্র রাখে না। বরং তারা নিজেদের ব্যাপারে লোকদের এই কথা শুনতে আগ্রহী যে, অমুক মক্কায় থাকে। অনেকে নিজ থেকেই এ কথা জনসম্মুখে প্রকাশ করে থাকে যে, আমি মক্কা-মদিনায় এত বছর থেকেছি। যদি এ প্রচারকে সে খারাপ মনে করে তাহলে তা থেকে বিরত থাকে; কিন্তু তার মন চায়, লোকেরা তার এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানুক।

কিছু লোক মক্কা-মদিনায় থেকেও লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকতে পারে না। তাদের দৃষ্টি থাকে মানুষের সম্পদের প্রতি। কোনোভাবে যদি কিছু সম্পদ হস্তগত হয়ে যায় তখন সে কৃপণতা শুরু করে। কোনো ফকিরকে সামান্য পরিমাণ দান করতেও তার মন চায় না। যদি কখনো দান করেও থাকে, সেটা লৌকিকতার উদ্দেশ্য। সুতরাং লৌকিকতা, লোভ, কৃপণতা ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক গুণ তাদের থেকে প্রকাশ পায়। এ কারণে যে, তারা পবিত্র স্থানে বসবাস করে। এ সকল স্থান থেকে দূরে থাকাই তাদের জন্য উত্তম। কিন্তু প্রশংসা ও সেখানের অধিবাসি হওয়ার গর্ব তাদের এ সকল নিকৃষ্ট গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও সেখানে থাকতে বাধ্য করে। সুতরাং মক্কা-মদিনার এ ধরনের অধিবাসিরা প্রবঞ্চিত।

মোটকথা, কোনো আমল ও ইবাদত বিপন্মুক্ত নয়। সে ব্যক্তি এ বিপদের সম্পর্কে অবগত নয় এবং এর ওপর ভরসা করে, সে প্রবঞ্চিত।

কিছু লোক রয়েছে, যারা সম্পদের ক্ষেত্রে বিমুখতা প্রকাশ করে এবং পোশাক ও আহার সামান্য কিছুতেই তৃপ্ত থাকে। তারা মসজিদকে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়। আর মনে করে, যুহদের উচ্চস্তর তারা লাভ করে ফেলেছে। অথচ তাদের অন্তর কর্তৃত্ব ও সম্মান অর্জনের প্রতি আকৃষ্ট। সম্মান-মর্যাদা যেভাবে ইলম ও ওয়াজের মাধ্যমে অর্জন হয় তেমনি যুহদের মাধ্যমেও অর্জন হয়। তারা সম্পদ ছেড়ে যুহদ গ্রহণ করেছে। যা সম্পদ থেকেও গুরুতর। যদি তারা যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) ছেড়ে সম্পদ গ্রহণ করতো তাহলে এটা তাদের নিরাপত্তার জন্য অধিক উত্তম হতো।

এ ধরনের লোক প্রবঞ্চিত। কেননা, তারা নিজেদেরকে দুনিয়া বিমুখ মনে করে। অথচ তারা দুনিয়ার অর্থই জানে না। তারা জানে না যে, কর্তৃত্বই হচ্ছে দুনিযার চূড়ান্ত আনন্দ। এর প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির জন্য মুনাফিক, হিংসুক, অহংকারী, লৌকিকতা ইত্যাদি নিকৃষ্ট গুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক।

কখনো তারা নেতৃত্ব ছেড়ে নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব গ্রহণ করে থাকে। এরপরও তারা ধোঁকায় পতিত হয়। কেননা ওই সময় তারা ধনীদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলে। তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে। তাদের ঘৃণা করে। আর নিজের ব্যাপারে সুধারণা রাখে এবং নিজের কাজে মুগ্ধ হয়। অথচ মনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মন্দ গুণ সে লালন করে থাকে। কেউ তাকে কিছু হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করে না। এই ভয়ে যে, লোকে বলবে, তার যুহদ নষ্ট হয়ে গেছে। যদি তাকে বলা হয়, এ অর্থ হালাল। আমার হিম্মত বৃদ্ধির জন্য প্রকাশ্যে তা গ্রহণ করুন।

এরপর গোপনে তা ফিরিয়ে দিয়েন; কিন্তু সে তা করে না। কারণ, তার মানুষের নিন্দার ভয় থাকে। এ সমস্ত লোক মানুষের প্রশংসা লাভের প্রতি আগ্রহী। আর এটাই দুনিয়ার আনন্দ। সে নিজেকে দুনিয়াবিমুখ মনে করে আর এটাই তার প্রবঞ্চনা। তাছাড়া যুহদ গ্রহণ করার পরও অনেকে ধনীদের সম্মান দেখিয়ে থাকে এবং তাদেরকে দরিদ্রদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নিজের মুরীদ ও প্রশংসাকারীদের ভালোবাসে আর যারা তার সামনে অন্য যাহেদের প্রশংসা করে তাদের অপছন্দ করে। এসব বিষয়ই এক প্রবঞ্চনা। শয়তানের ধোঁকা। আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।

অনেক ব্যক্তি এমন রয়েছে, যারা শারীরিক আমলে খুব কঠোর যেমন দিনে-রাতে এক হাজার রাকাত নামায পড়ে। কুরআন খতম করে; কিন্তু এ

সময়ের মধ্যে সে তার অন্তরকে পর্যবেক্ষণ করে না। তাকে রিয়া, অহংকার ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক দোষ থেকে রক্ষা করে না। এ সকল ব্যাধিকে ধ্বংসাত্মক মনে করে না। যদি কখনো মনে হয় তাহলে নিজেকে তা থেকে মুক্ত মনে করে। আর যদি মনে হয় তার মধ্যে এসব রয়েছে তাহলে সে ধারণা করে যে, আল্লাহ তার বাহ্যিক আমলের কারণে তাকে মাফ করে দিবেন। তাকে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে না। যদি জবাবদিহির বিষয়ে সংশয় হয় তাহলে সে এ ভেবে শান্ত হয় যে, তার নেকির পাল্লা ভারি হবে। এগুলো তাদের ভুল ধারণা। মূলত মুত্তাকী ব্যক্তির সামান্য পরিমাণ তাকওয়া এ সকল লোকদের পাহারসম শারীরিক আমলের চেয়ে উত্তম।

এ ধরনের প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে যখন বলা হয়, আপনি আল্লাহর অলি, তাঁর প্রিয় পাত্র তখন তার প্রবঞ্চনা আরও বেড়ে যায়। সে এতে খুশি হয়। তাদের কথা সত্য মনে করে। সে মানুষের প্রশংসায় প্রবঞ্চিত হয়ে নিজেকে আল্লাহর নৈকট্যশীল মনে করে। অথচ সে জানে না লোকেরা তার অভ্যন্তরীণ দোষ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই তার সম্পর্কে এমন কথা বলে থাকে।

এক দল লোক এমন রয়েছে, যারা ফরযের চেয়ে নফলকে গুরুত্ব দেয়। তারা চাশত, ইশরাক, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নফল নামাযে ফরযের চেয়ে বেশি আনন্দ পায়। তারা রাসূলের বাণী ভুলে গেছে। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে।

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ.

ফরয আদায়ের মাধ্যমে বান্দা যে পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয়, অন্য কিছুর মাধ্যমে তেমনটা হয় না। (সহিহ বুখারী : ৬৫০২)

নেক কর্মের ধারাবাহিকতা ছেড়ে দেওয়াও নিন্দনীয়। যেমন, কখনো কখনো এক ব্যক্তির ওপর ছোটো ফরয নির্ধারিত হয়। যার একটি ছুটে যায় আর অপরটি ছুটে যায় না। অথবা ছুটে নফল নির্ধারিত হয়।

যার একটি সময় সংকীর্ণ হয় আর অন্যটির সময় সংকীর্ণ হয় না। এখন যদি এ দুই ফরয ও নফলের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে তাহলে সে ধোঁকায় পতিত হবে।

এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। কেননা, গুনাহও স্পষ্ট এবং নেককাজও স্পষ্ট। অস্পষ্ট বিষয় হলো, নেক কাজসমূহের কোনটি আগে করা হবে

আর কোনটি পরে। যেমন ফরজসমূহকে নফলসমূহের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া। ফরযে আইনকে ফরযে কেফায়ার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া। কাযা হয়ে যাওয়া আমল কাযা হয়নি এমন আমলের পূর্বে আদায় করা। উদাহরণস্বরূপ মায়ের হক বাবার হকের পূর্বে আদায় করা। হাদিসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, কার সাথে আমি অধিক উত্তম আচরণ করবো? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার মায়ের সাথে। লোকটি বললো, তারপর কার সাথে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার মায়ের সাথে। লোকটি বললো, তারপর কার সাথে? রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় বললেন, তোমার মায়ের সাথে। লোকটি বললো, এরপর কার সাথে? এবার রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার বাবার সাথে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, এরপর কার সাথে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে তোমার বেশি নিকটবর্তী। (জামে তিরমিযী : ১৮৯৭)

সুতরাং কিছু দান করার ক্ষেত্রে প্রথমে নিকটবর্তী আত্মীয়দের থেকে শুরু করবে। যদি তারা দুজন হয় তাহলে অধিক প্রয়োজনগ্রস্তকে দিবে। যদি দুজনই প্রয়োজনগ্রস্ত হয় তাহলে যার তাকওয়া বেশি তাকে দিবে।

যে ব্যক্তি পিতামাতার জন্য খরচ করে না; কিন্তু হজ করে; সে প্রবঞ্চিত। তার উচিত হজের ওপর পিতামাতার হক আদায়কে প্রাধান্য দেওয়া। এ হলো দুটি ফরযের মধ্যে হতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরযকে প্রাধান্য দেওয়া।

এমনিভাবে কেউ যদি কারও সাথে সাক্ষাতের ওয়াদা করে, ঘটনাক্রমে প্রতিশ্রুত সময়টি জুমার সময়ে হয়ে যায় তাহলে জুমার নামাযকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, জুমা ছুটে যেতে পারে। এমন সময়ে প্রতিশ্রুতি পূরণ করা গুনাহ হবে। যদিও প্রতিশ্রুতি পূরণ করাও একটি ইবাদত।

২. সূফীগণের বিভ্রান্তি

সূফীগণের মধ্যেও অনেক প্রকার রয়েছে। এক প্রকার সূফীর নিয়ম হচ্ছে, তারা খাঁটি সূফীদের ন্যায় পোশাক, আকার-আকৃতি, ভাষা, আদবকায়দা, রীতিনীতি ও পরিভাষা তৈরি করে এবং বাহ্যিকভাবে তাদের মতো হয়ে থাকে যেমন– তারা রাগরাগিণী শুনে, ভাবে মজে নর্তন-কুর্দন করে, জায়নামাযে মাথাঠুকে, লম্বা লম্বা শ্বাস নেয় এবং মৃদুস্বরে কথা বলে। গোমরাহবশত এতেই তারা মনে করে যে, সূফী হয়ে গেছে। অথচ তারা

নিজেদেরকে কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত করে না এবং অন্তরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুনাহ থেকে পবিত্র করে না, যা খাঁটি সূফীগণের মধ্যে সাধারণ বিষয় বলে পরিগণিত হয়। এসব বিষয় কেউ আয়ত্ত করে নিলেও নিজেকে সূফী বলে সাব্যস্ত করতে পারে না এবং বড় বড় বুলি আওড়াতে পারে না। এমতাবস্থায় যারা হারাম ও সন্দেহযুক্ত ধন-সম্পদের বাছ-বিচার করে না, টাকাপয়সা দেখে লোভ সামলাতে পারে না, সামান্য বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে এবং কেউ একটু বিপরীত কথা বললেই তার ইজ্জতের উপর আঘাত হানে তারা কী করে সূফী হতে পারে? এদের উদাহরণ হলো ওই অক্ষম বৃদ্ধার মতো, যে শুনতে পেয়েছে, বীর যোদ্ধাদের নাম শাহী খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পুরস্কারস্বরূপ বাদশার পক্ষ থেকে জায়গা-জমি দেওয়া হয়। সেই বৃদ্ধা তখন এমন উপকার লাভের আশায় বর্ম পরিধান করে, মাথায় শিরস্ত্রান পরে। বীর সৈনিকদের কবিতা শেখে। কথাবার্তা, চাল চলন সব কিছুতেই সে বাহুদরদের মতো করার চেষ্টা করে। যখন সব সৈন্যকে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হলো তখন যাচাই বাছাই করার জন্য সবার বর্ম ও শিরস্ত্রাণ খোলা হলো এবং শক্তি পরিক্ষা করার জন্য একে অপরের সাথে কুস্তি করার আদেশ দেওয়া হলো। যখন ওই বৃদ্ধার বর্ম ও শিরস্ত্রাণ খোলা হলো তখন সবাই দেখতে পেলো এক দুর্বল বৃদ্ধা, যে তার বর্ম ও শিরস্ত্রাণই সামলাতে পারে না।

তখন তাকে বলা হলো, তুমি কি এখানে বাদশার সাথে ঠাট্টা করতে এসেছো নাকি উপস্থিত সৈন্যদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে এসেছো? অতঃপর তাকে হাতির পায়ে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হলো।

কিয়ামতের দিন যখন এই মেকি সূফীর দলকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে, যিনি বাহ্যিক আকৃতি নয়; বরং অন্তরের অবস্থা দেখেন, তখন তাদের দুর্দশা সীমা ছাড়াবে।

এছাড়া আরও এক ধরনের সূফী আছে যাদের সর্বসাধারণের পোশাক পরতে রুচিতে বাঁধে। কিন্তু সূফী হওয়ার খাহেশও বেশি। সূফীগণের পোশাক বাদে যেহেতু সূফী হওয়া যায় না, তাই তারা উন্নত কাপড়ের খন্ড খন্ড তালি দিয়ে বিচিত্র ধরনের পোশাক তৈরি করে, যা রেশমী পোশাকের চেয়েও বেশি মূল্যবান। তারা মনে করে যে, পোশাকে জোড়া তালি দিয়ে তারা সূফী হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী সূফীগণ তালিযুক্ত পোশাক পরিধান

করতেন। সেজন্য তারাও উৎকৃষ্ট বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে তালির ন্যায় করে নেয়। অথচ এটা বোঝা মুশকিল যে, মূল্যবান কাপড় টুকরা টুকরা করে কেটে সেলাই করে নিয়েই তারা পূর্ববর্তী সূফীগণের মতো হয়ে গেল কি? তাদের এই চাতুর্যতা সকল বিভ্রান্তিকে অতিক্রম করে গেছে। কেননা, তারা মূল্যবান পোশাক পরিধান করে, বাহারি খাবার খায়, জালিম লোকদের অর্থ দু'হাতে গ্রহণ করে এবং প্রকাশ্য গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকে না; অন্তরের পাপের কথা নাই বা বললাম। এরপরও তারা নিজেদেরকে উত্তম মনে করে। সাধারণ লোকের মধ্যেও তাদের ক্ষতি বিস্তার লাভ করে। কারণ, যারা তাদের অনুসরণ করে, তারা তাদের মতোই ধ্বংস হয়ে যায়।

আরেক প্রকার লোক আছে যারা নিজেদের সূফী দাবী করে। তারা বলে, আমরা সকল স্তর অতিক্রম করে ফেলেছি, সর্বদা হকের মুশাহাদা করি এবং আল্লাহর নৈকট্য পেয়ে গেছি। অথচ তারা শুধু এসব বিষয়ের নাম ও শব্দই শুনেছে— এগুলোর স্বরূপ, শর্ত, লক্ষণ ও বাধাবিপত্তি সম্পর্কে গোবর গনেশ। তারা মারেফতওয়ালাদের কিছু বিপরীতধর্মী কথাবার্তা শিখে নেয় এবং সেগুলোই আওড়ায় ও গেয়ে বেড়ায়। তাদের মতে এগুলো খুবই উচ্চস্তরের কথা। বরং তারা মনে করে, তাদের জ্ঞান পূর্ববর্তীদের চেয়েও উচুঁস্তরের। ফলে তারা ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও আলেমদের তুচ্ছ মনে করে।

তারা আবেদ ও আলেমদেরকে মোটেই উপযুক্ত মনে করে না। আবেদদের সম্পর্কে বলে, এরা পরিশ্রমী শ্রমিক। আর আলেমদের সম্পর্কে বলে, এরা আল্লাহ থেকে গোপন করে। অথচ আল্লাহ তাআলার নিকট এই ধরনের সূফীরাই মুনাফিক, পাপিষ্ঠ, নির্বোধ ও অজ্ঞ। এরা না শিক্ষা গ্রহণ করে, না চরিত্র কলুষমুক্ত করে এবং না অন্তরের হিফাযত করে। সুফিদের একটি দল এমন রয়েছে, সারা সব ধ্বংসের কাজকেই জায়েয মনে করে। তারা মূল শরিয়তকে গোলযোগের মধ্যে রেখে দিয়েছে। দীনের বিধিবিধান ত্যাগ করেছে। হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য দূর করেছে। তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহ আমাদের আমল থেকে নির্মুখাপেক্ষী। সুতরাং নিজেকে কষ্ট দেওয়ার কোনো অর্থ নেই।

আবার অনেকে বলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার মহব্বত থেকে অন্তরকে পবিত্র করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আর এটা অসম্ভব ব্যাপার। বান্দাকে অসম্ভব ব্যাপারের আদেশ করা হয়েছে এ কথার ধোকায় তো তারা পড়বে, যারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি। আর আমরা তো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আর বুঝতে পেরেছি যে, অন্তরের পরিশুদ্ধি অসম্ভব ব্যাপার।

এ নির্বোধেরা জানে না যে, বান্দাকে প্রবৃত্তি ও গযবকে মূল থেকে উৎপাটন করার আদেশ দেওয়া হয়নি; বরং এগুলোর উপকরণকে ধ্বংস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে করে প্রত্যেক মানুষ শরিয়তের অনুসারি হয়ে যায়।

অনেকে বলে, জাহিরী আমল গণ্য নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের সূফীবাদী অন্তর দেখেন। আমাদের অন্তর আল্লাহর মুহব্বতে পাগলপারা। দুনিয়াতে আমাদের দেহ পিঞ্জরে বন্দী আর অন্তর অসীমের আস্তানায় ঘুরছে। আমরা সর্বসাধারণের স্তর থেকে অনেক উপরে উঠে গেছি। সুতরাং দৈহিক আমল দ্বারা আত্মসংশোধনের দরকার নেই। কারণ আমরা মারেফাতে শক্তিশালী। তাই কামনা বাসনা ও খাহেশ আমাদেরকে আধ্যাত্মিক পথে বাধা দিতে পারে না। তাদের এসব কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় যে, তারা নবীদের স্তরও অতিক্রম করে ফেলেছে। তারা সামান্য ভুলের কারণে বছরের পর বছর ক্রন্দন করে।

সব কাজকে বৈধ মনে করে এমন সুফিদের প্রবঞ্চনা অসংখ্য। এগুলোর মূল ভিত্তি হচ্ছে শয়তানী চিন্তাধারা। কারণ তারা ইলমের পূর্বে মুজাহাদায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ইলম আমলে পূর্ণ ও অনুসরণযোগ্য কোনো শায়খের অনুসরণ করে না।

আরও কিছু লোক রয়েছে, যারা এই সুফিদেরও ছাড়িয়ে গেছে। তারা নেক আমল করে, হালাল অন্বেষণ করে, অন্তরকে পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজেদেরকে যুহদ, তাওয়াক্কুল, রেজা, ইত্যাদি মাকামের অধিকারী মনে করে অথচ তারা এসব মাকামের প্রকৃত স্বরূপ, শর্ত ও আলামত সম্পর্কে কিছুই জানে না।

অনেক সূফী বলেন, তারা আল্লাহর আশিক ও তাঁর ভালোবাসার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। হয়তো তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব ধ্যান-ধারণা পোষণ করেন, যেগুলো বিদআত কিংবা কুফর হওয়া স্বাভাবিক।

তারা মারিফাতের আগেই মহব্বতের দাবী করে। অথচ তারা এমন কাজ করে, যা আল্লাহর পছন্দ নয়। যেমন আল্লাহর কাজের উপর নিজের খাহেশকে প্রাধান্য দেওয়া, লোকলজ্জার কারণে কতক কাজ না করা ইত্যাদি। এগুলো যে মুহাব্বাতের বিপরীত, সেকথা তারা আদৌ জানে না। তাদের কেউ কেউ অল্পেতুষ্টি ও তাওয়াক্কুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে কোনো রসদপত্র ছাড়াই জঙ্গলে চলে যায়। যেন তার তাওয়াক্কুল দাবি সঠিক হয়। অথচ সে জানে না যে, এ ধরনের তাওয়াক্কুল বিদআত। সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীন থেকে এ প্রকার তাওয়াক্কুল প্রমাণিত নয়। অথচ তাঁরা তাওয়াক্কুল সম্পর্কে তাদের নিয়ে অধিক অবগত ছিলেন। তাঁদের নিকট জীবনকে বিপন্ন করা এবং পাথেয় বর্জন করা তাওয়াক্কুল নয়। তাঁরা পাথেয় গ্রহণ করতেন এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতেন।

আরেকদল এমন রয়েছে, যারা নিজেদেরকে শুধু খাদ্যের ব্যাপারে সংকীর্ণ রাখে। খালেস হালাল খাদ্য অন্বেষণে এমনভাবে ব্যস্ত থাকে যে, অন্তর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলের ব্যাপারে আর খেয়াল থাকে না।

কিছু লোক খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে হালালের চিন্তাও করে না, অন্যান্য ক্ষেত্রে হালালের জন্য যারপরনাই চেষ্টা করে। তারা জানে না যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি না শুধু হালাল খাদ্যের জন্য সন্তুষ্ট হবেন এবং না শুধু সকল আমল করে হালাল খাদ্য না খাওয়ার জন্য সন্তুষ্ট হবেন। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর নির্দেশিত হালাল খাদ্য খাওয়াসহ সকল ইবাদত করা জরুরি এবং সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। যে লোক মনে করে, সামান্য বিষয়েই মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, সে ভুলের সাগরে ডুবে আছে।

অন্য একদল আছে যারা উত্তম আচরণ, বিনয় ও বদন্যতার দাবী করে। সুফিদের পেছনে তারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। তাদের কয়েকজনকে নিজের কাছে রেখে তাদের খেদমত করতে থাকে।

এসব কিছুকে তারা নেতৃত্ব লাভ ও সম্পদ একত্রীকরণের পন্থা মনে করে। তারা বিনয়াবনত হয়ে সেবার মনোভাব প্রকাশ করে। কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে অহংকার প্রদর্শন করা।

তাদের উদ্দেশ্য হলো উপকার লাভ করা। তবে তারা উপকার করার ভান করে।

তাদের উদ্দেশ্য হলো অনুসারী বানানো। তারা প্রকাশ করে সেবামূলক ও আনসারীদের মতো আচরণ প্রকাশ করে।

তারপর তারা হারাম মাকরূহ সব ধরনের সম্পদ জমা করে এবং অনুসারী বানানোর জন্য সেসব অর্থ ব্যয় করে এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ড দ্বারা চারদিকে তার সুনাম ছড়িয়ে দিতে চায়।

অনেকে আছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ নিয়ে নিজের নাম করে দান করে। কতেক আছে বাইতুলমালের সম্পদ বিলি করার নাম দিয়ে সাধারণকে হজে পাঠায়। মনে হয় পুণ্য লাভ ও বিনয়বশত তারা এসব সম্পদ ব্যয় করছে। কিন্তু এসব কিছুর পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য থাকে লৌকিকতা প্রদর্শন ও সুনাম অর্জন।

এসব লোক যখন আল্লাহর আদেশ পালনে ঢিলেমি মনোভাব দেখায় এবং হারাম সম্পদ ব্যয় করতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না। এর দ্বারাই তার আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝে আসে।

আল্লাহর ঘর আবাদ করতে এসে কেউ যদি মসজিদ নোংরা করে ফেলে তার যে হালাত হবে, পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে হারাম সম্পদ দিয়ে হজ ওমরা করলেও একই অবস্থা হবে।

অন্য একদল আছে যারা সাধনা ও চরিত্র গঠনে ব্যস্ত থাকে। নফসকে দোষমুক্ত রাখতে সচেষ্ট থাকে। এ বিষয়ের গভীরে তারা অবগাহন করে। ফলে নফসের দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করাকে তারা ইলমের প্রকাশক ও পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। সর্বাবস্থায় তারা নফসের দোষত্রুটি অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে।

তারা এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিপদ আপদ খুঁজে খুঁজে বের করে। তারা বলে এটা নফসের দোষ। গাফলত মৌলিক দোষ। নযর মৌলিক দোষ। এভাবে তারা দোষের পর দোষ বলে যায়। ঘণ্টার পর ঘন্টা তারা এর পেছনে ব্যয় করে।

তাদের সারাটা জীবন কেটে যায় নফসের ত্রুটি ও তার প্রতিকার খুঁজে বের করতে করতে।

তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মতো। সারাটা জীবন যে হজের কষ্ট ও পথের বিপদাপদ নিয়ে ভাবতে থেকেছে। কিন্তু মক্কার যিয়ারত তার কোনোদিন নসিব হয়নি।

একদল লোক আছে যারা এসব কিছুর উর্ধে চলে যায়। তাঁরা সুলুক অর্জনে সচেষ্ট হয়। তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। মারেফাতের সামান্য ঘ্রাণও যদি তারা পায় অবাক হয়ে যায়। আনন্দিত হয়ে ওঠে। এর অভিনবত্ব তাদেরকে মুগ্ধ করে। ফলে তারা মারেফাতের মৌল বিধানের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। তারা সেসব রহস্যের দরজা উন্মুক্ত হওয়া ও অন্যের জন্য তা বন্ধ করার পন্থা নিয়ে ভাবতে থাকে।

এসব লোকেরা ধোঁকায় পড়ে আছে। কারণ আল্লাহর আশ্চর্য পথের কোনো সীমা নেই। সাধক ব্যক্তি যদি প্রতিটি আজব বিষয়েই সময় নিয়ে ভাবতে থাকে এবং সেখানেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে তাহলে তার পথ চলা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। মনযিলে মাকসুদে সে আর পৌঁছতে পারবে না। যেমন , এক ব্যক্তি বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে পথে বের হলো। সে রাজ প্রসাদের উদ্যানে এসে দেখলো নানা রঙের, নানান আকারের, নানা সুবাসের ফুল ফুটে আছে। চিত্তাকর্ষক আলোকসজ্জায় চারদিক আলোকিত হয়ে এলো। জীবনে এর চেয়ে সুন্দর ও মনোরম কোনো দৃশ্য সে দেখেনি। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব দেখতে লাগলো। আর ভুলে গেলো বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সে পথে বের হয়েছিলো।

আরেকদল লোক আছে যারা এসব কিছুকে ভুলে না। উদ্যানের শোভা কিংবা মনোরম আলোকসজ্জা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। বহুমূল্য পুরস্কারও তাদের পথ হারা করতে পারেনা। এসব বিষয়ে মন দিয়ে তারা বিপথগামী হতে চায় না। গন্তব্যে উপনীত হওয়ার সামান্য আগ পর্যন্ত তারা এক মনে চলতে থাকে। ফলে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সীমানায় পৌঁছে যায়। তারা প্রায় লাভ করাকে পূর্ণভাবে অর্জন করার সাথে গুলিয়ে ফেলে। তারা মনে করে আল্লাহকে তারা পেয়ে গেছে। ফলে থেমে যায় এবং ভুল করে—

কারণ আল্লাহর রয়েছে সত্তরটি নূরের পর্দা। সাধক ব্যক্তি এর একটা পর্দা উন্মোচনে সক্ষম হলে মনে করে, সে আল্লাহকে পেয়ে গেছে।

এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ইবরাহিম (আ) এর ঘটনা থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ.

অতঃপর যখন রাতের অন্ধকার তাঁকে আচ্ছন্ন করে নিলো তখন তিনি নক্ষত্র দেখে বললেন, এটাই আমার প্রতিপালক।' (সূরা আনআম : ৭৬)

এই আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, ইবরাহিম (আ) আলোকজ্জ্বল একটি তারকা দেখেছেন। কারণ আকাশের তারাতো শৈশব থেকেই তিনি দেখে আসছেন এবং জানতেন সেটা কখনোই তার প্রভু নয়। কারণ আকাশে এক নয় একাধিক ও অনেক তারকা থাকে। তাই গণ্ডমূর্খ ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা অসম্ভব নয় যে, তারকারাজি মানুষের ইলাহ নয়।

অন্য সাতজন মানুষের মতোই তারকা ইবরাহিম (আ) তারকার প্রভু হওয়ার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে যাননি। বরং তিনি আল্লাহর চারপাশকে আবরিত করে রাখা নূর দেখে আকর্ষিত হয়েছেন। আর এটাই হলো সাধকদের অনুসৃত পন্থা। এই স্তরে উপনীত না হয়ে কেউ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আর এটা নূরের আবরণ। কতক আবরণ কতকের চেয়ে কম। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র আলোক আবরণ হলো তারকা। সবচেয়ে বড় হলো সূর্য। আর এর মাঝে রয়েছে চন্দ্রের স্তর।

এভাবে পর্যায়ক্রমে আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম (আ)-কে আকাশ মন্ডলির রাজত্ব দর্শন করানো হয়েছিলো।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.

এভাবে আমি ইবরাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব দেখাই। (সূরা আনআম : ৭৫) তিনি নূরের এক স্তর অতিক্রম করে অন্য স্তরে গিয়েছেন। প্রতিটি স্তরেই তার মনে এই প্রবঞ্চনা এসেছে আমি আল্লাহর কাছে পৌঁছে গিয়েছি। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এটা খুবই রহস্যকৃত একটা বিষয়। তাই প্রতিটি ধাপে পা রেখে তিনি বলেছেন, আমি গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি। কিন্তু পরে আবার তার সামনে দ্বিতীয় একটি রহস্যের দরজা উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। তিনি আবার সেই অজানার পেছনে ছুটছেন। তার সমাধান বের করেছেনে। এভাবে আল্লাহর কাছে পৌঁছার একদম শেষ

ধাপে তিনি পদার্পণ করেন। তখন তার আর আল্লাহর মাঝখানে ছিলো একটি মাত্র আড়াল। তখন তিনি বলে উঠেছেন, এটা সবচেয়ে বড়।

কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় সবার চেয়ে বড় হলেও সে ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত নয়। তখন তিনি বললেন, অস্তগামী কোনো কিছুই আমার ভালো লাগে না। আমি মুখ ফেরাচ্ছি সেই সত্তার দিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান জমিন (মিশকাতুল আনওয়ার : ৫৫)

সুতরাং সাধক যখন এক পর্দা উন্মোচন করে সামান্য সময় সেখানে অবস্থান করে, তখন তার ধোঁকায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি থাকে। আল্লাহর কাছে বান্দার পৌঁছার পথে সর্বপ্রথম যে বাধা আসে তার নাম নফস। কারণ এটা খোদায়ী নির্দেশে পরিচালিত একটি বিষয়। আর এটা আল্লাহর নূরেরই একটা অংশ। অর্থাৎ নফস বলে মনের সেই গোপন অংশ বোঝানো উদ্দেশ্য যেখানে সব সত্য উপলব্ধ হয়। এমনকি নফস সমগ্র দুনিয়াকে আয়ত্ত করে নেয় এবং সেখানে সবকিছু চিত্রিত হয়।

এ অবস্থায় অন্তরের নূর ভীষণভাবে আলো ছড়াতে শুরু করে। সেখানে অস্তিত্বের যাবতীয় বিষয়াদি প্রকাশ পায়। প্রথম অবস্থায় তা আবরণের আড়ালে চাপা পড়ে থাকে। যখন আল্লাহর নূর আলোকদান করে নফসের নূর চমকাতে থাকে এবং অন্তরের সৌন্দর্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো কখনো ব্যক্তি নিজ অন্তরের দিকে তাকায়। তখন অপর সৌন্দর্য দেখে সে হয়রান হয়ে পড়ে। কখনো কখনো সেই সৌন্দর্যের হতবুদ্ধ ভাব তার মুখে চলে আসে। সে বলে, আনাল হক। আমিই মহাসত্য।

কিন্তু বিপদ তখনই হয় যখন সে নেপথ্যের বিষযটি অনুধাবণ করতে পারে না এবং সে ধোঁকা খায়। এখানেই থেমে থেমে সে ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে।

ইবরাহিম (আ)ও ছোটো একটা তারা দেখে মহামহিম প্রভুর আলোক বিচ্ছুরণ বলে মনে করেছিলেন। তারপর চাঁদকে দেখে একই কথা ভেবেছিলেন। শেষমেশ তিনি গিয়েছিলেন সূর্যের কাছে। সেটাকেও তিনি ঐশী আলোর বিচ্ছুরণ ভেবে নিয়ে ভুল করেন। কারণ তখন তিনি ছিলেন প্রবঞ্চিত দিশেহারা।

এই বিষয়টি সত্যিই অস্পষ্ট ও তালগোল পাকানো একটি বিষয়। কারণ বিচ্ছুরিত আলো বিচ্ছুরণ ঘটা আলোর পাত্রের সাথে মিশে থাকে। যেমনি

আয়নায় প্রতিবিম্বিত প্রতিটি বস্তুর রং আয়নার সাথে মিশে থাকে। দেখে মনে হয় রংটা যেনো আয়নারই। যেমনি কাঁচের বোতলে রাখা তরলকে বোতলের অংশ বলেই মনে হয়। যেমন কবিতার ভাষায়—

স্বচ্ছ কাঁচের পেয়ালার তরল মদিরা যেনো মিশে আছে এক আলোর সাথে। মনে হচ্ছে মদিরায় যেনো শুধু পেয়ালা কিংবা ওখানে শুধু মদিরাই আছে। আর আয়াতে বর্ণিত তারকা হলো আয়না বা স্বচ্ছ জলের মতো। তাই সেদিকে হাত বাড়ালে সবাইকে ধোঁকা খেতেই হবে।

আধ্যাত্ম পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে যত প্রকার বিভ্রান্তি হতে পারে, সেগুলো পুরোপুরি বর্ণনা করার জন্য বিরাট পুস্তক দরকার। ইলমে মুকাশাফার বিশদ বর্ণনা ছাড়া সবগুলো বিভ্রান্তি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। অথচ ইলমে মুকাশাফা বর্ণনা করার অনুমতি নেই।

এখানে আমি যে আলোচনা কতটা পরিমাণে করেছি তা না করাই উচিত ছিলো। কারণ যে সঠিক তার এ বিষয়গুলো অন্য কারো কাছ থেকে শোনার প্রয়োজন নেই।

এ বিষয়ে সে নিজেই অবগত রয়েছে আর যারা সাধনা করে না, তারা এসব শুনে কিছুই বুঝতে পারবে না, উপকারও পাবে না। উল্টো তার ক্ষতি হতে পারে। কারণ এসব কথা শুনলে তার মনে হতবুদ্ধিভাব তৈরি হবে। বিষয়টির মূলে সে যেতে পারবে না।

তবে এতে ফায়দা রয়েছে। সালেক ব্যক্তি আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। সে বুঝতে পারে। বিষয়টাকে যা সে মনে করেছিলো তার চেয়ে ও অনেক বড়। কখনো কখনো ব্যক্তি তার সংক্ষিপ্ত ভাবনা ও পরিমিত বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে। সে বিশ্বাস করে নেয় আউলিয়াদের বলা উর্ধ্বজগতের ঘটনাবলি।

এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় ধোঁকা হলো,

৩. ধনীদের বিভ্রান্তি

একদল ধনী লোক মসজিদ, মাদরাসা, সরাইখানা, পুল ইত্যাদি নির্মাণে সচেষ্ট থাকে। তারা এগুলোতে নিজেদের নাম পাথরে খোদাই করে লিখে দেয়, যাতে মৃত্যুর পরও তাদের কীর্তি অক্ষুণ্ন থাকে। এ কাজ করার পর

তারা মনে করে এর দ্বারা তারা মাগফিরাতের যোগ্য হয়ে গেছে। অথচ দু'কারণে তারা বিভ্রান্ত।

এক, তারা জুলুম, ঘুষ, সুদ ইত্যাদি হারাম উপায়ে অর্জিত টাকাপয়সা দিয়ে এগুলো তৈরি করে। সুতরাং হারাম খাওয়ার ফলে তারা শাস্তির উপযুক্ত।

দুই, তারা সুখ্যাতির জন্যে টাকাপয়সা খরচ করে। তাদের উচিত ছিল এই অর্থ উপার্জন না করা। উপার্জনের মাধ্যমে যখন তারা গুনাহগার হলো, তখন তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং যে টাকা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল, মালিক পাওয়া না গেলে তার উত্তরাধিকারীগণকে, না থাকলে মুসলমানদের প্রয়োজনে খরচ করা প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে গরিব মিসকিনদের মধ্যে ত্রাণ দেওয়াই অধিক জরুরি মনে হয়। কিন্তু ওইসব লোকদের মধ্যে বণ্টন না করে; বরং দালান-কোঠা নির্মাণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং জনকল্যাণ তাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং লোক দেখানো, সুখ্যাতি এবং প্রশংসা কুড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাদেরকে যদি বলা হয়, বিল্ডিং তৈরি করো, কিন্তু এতে নিজের নাম খোদাই করো না, তাহলে কখনও তারা মেনে নেবে না এবং বিল্ডিং নির্মাণের পরিকল্পনাই বাদ দিয়ে দেবে। উদ্দেশ্য যদি মানুষকে দেখানো না হতো এবং আল্লাহর জন্যই হতো, তাহলে নাম খোদাই করার কী দরকার ছিল?

অন্য এক প্রকার ধনী লোক আছে যারা হালাল পথে অর্থ উপার্জন করে মসজিদে দান করে দেয়। অথচ তার আশেপাশে ভুখানাঙ্গা, অভাবগ্রস্ত লোক আছে যারা বসাবাস করে, যাদেরকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা হুকুম জারি করেছেন, সেই হুকুম পালন করা হলো ফরজ। মসজিদে দেওয়া হলো তার পরের কাজ। কিন্তু তারা প্রথমেই দেয় মসজিদে। কারণ, এতে সুখ্যাতি হয়। এ ধরনের ধনী দাতা নিঃসন্দেহে ভুলের মাঝে নিমজ্জিত। এছাড়া মসজিদে কারুকার্য করা হারাম। নামাযীদের ধ্যান খেয়াল সেদিকে চলে যায়। অথচ নামাযের উদ্দেশ্য বিনয় ও অন্তরের উপস্থিতি। অন্তর কারুকার্যে ব্যস্ত থাকলে নেকি অর্জিত হবে না এবং এর শাস্তি যে কারুকার্য করে, তার উপর গিয়ে পড়বে। অথচ সে ধারণা করে থাকে যে, নেককাজ করেছে, যা ওসিলা হবে পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি

লাভের। বাস্তবে সে আল্লাহর ক্রোধের উপযোগী হবে। সে মনে করে, সে আল্লাহর অনুগত বান্দা ও আদেশ পালনকারী। অথচ মসজিদের এসব সজ্জা আল্লাহর বান্দাদের মনে বিক্ষিপ্তভাব নিয়ে আসে।

কখনো কখনো এর মাধ্যমে সে দুনিয়ার বিলাসিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ঘরকে তারা মসজিদের মতো করে সাজাতে চায়। সে চেষ্টাই তার মনকে ব্যস্ত করে রাখে। এর সব বিপদ তার ঘাড়ের উপরে এসে আপতিত হয়। কারণ মসজিদ হলো বিনয়াবনতা ও আল্লাহর সামনে বান্দার মস্তক অবনত করার স্থান।

মালেক ইবনে দিনার (র) বলেন, দুই লোক মসজিদে এলো। একজন ভেতরে প্রবেশ করলো, দ্বিতীয়জন বাইরে থেমে গেলো।

প্রথমজন : কী হলো তুমি ভেতরে আসবে না?

দ্বিতীয়জন : এতবার আল্লাহর অবাধ্যতা করে কী করে মসজিদে প্রবেশ করি। (অর্থাৎ, আমি আগে তাওবা করে পাক পবিত্র হয়েই মসজিদে প্রবেশ করবো।)

এই উক্তির কারণে আল্লাহর দরবারে সে সিদ্দিকের মর্যাদা লাভ করলো। (ইবনুল মুবারাক : কিতাবুয যুহদ : ৪৭৮)

আমাদের উচিত এভাবে মসজিদের সম্মান রক্ষা করে চলা। সবাই তো এটা বোঝে যে, মসজিদে নোংরা ছড়িয়ে রাখা অপরাধ। আর এটা তাদের বোধগম্য হয় না যে, হারাম ও দুনিয়ার সাজসজ্জা দিয়ে মসজিদ সাজিয়ে রাখা হলো আল্লাহর উপর করুণা করার নামান্তর।

হযরত ঈসা (আ)-এর সাথীবর্গ তাঁর খিদমতে একদিন নিবেদন করল, দেখুন, এই মসজিদটি কি সুন্দর! তিনি বললেন, হে আমার উম্মত! আমি সত্য বলছি, আল্লাহ তাআলা এই মসজিদের ইটের উপর ইট রাখবেন না। এই মসজিদ নির্মাণকারীদের পাপের কারণে সকলকে ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহর নিকট না সোনা-রূপার মূল্য আছে, না এসব ইটের, যেগুলোকে তোমরা সুন্দর বলছ। বরং তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তর, যা দিয়ে তিনি দুনিয়াকে আবাদ রাখেন। যখন সৎ অন্তর থাকবে না, তখন দুনিয়াকে শ্মশানে পরিণত করে দিবেন।

হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম (স) বলেন, তোমরা যখন মসজিদকে কারুকার্যময় করবে এবং কুরআনকে সোনা-রূপা পরাবে, তখন তোমাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে। হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল (স) যখন মদীনায় মসজিদে নববী তৈরি করার ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, সাত হাত উঁচু করবেন এবং কারুকার্য ও চিত্রাঙ্কন করবেন না। এতো হাদিস প্রমাণ করে যে, মসজিদ কারুকার্য করা উচিত নয়। তবুও ধনী লোকেরা এই মন্দ কাজকে ভালো মনে করে এবং তারই উপর নির্ভর করে। এটা তাদের ভুল ধারণা।

আরও এক ধরনের ধনী লোক আছে যারা টাকাপয়সা খরচ করে এবং ফকির-মিসকিনকে দান করে। কিন্তু এই দানের জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করে, যেখানে মানুষের সমাগম বেশি থাকে। এছাড়া এমন ফকির তালাশ করে, যে কৃতজ্ঞ হয় এবং জনসম্মুখে দাতার প্রশংসা করে। তারা গোপনে দান করাকে ভালো মনে করে না। কোনো ফকির তাদের নিকট থেকে কিছু নিয়ে গোপন করলে তাকে তারা দোষী ও অকৃতজ্ঞ মনে করে। তারা কখনো হজের পর হজ করে; কিন্তু দরিদ্র প্রতিবেশীকে ভুখা রাখে। এ কারণেই হযরত ইবনে মাসউদ (র) বলেন, শেষ যামানায় এমন লোক হবে, যারা অকারণেই হজ করবে। ধনী হওয়ায় তারা সফরকে কষ্টকর মনে করবে না। তারা মাহরুম অবস্থায় ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ, সওয়াব কিছুই পাবে না। নিজেরা আরামদায়ক যানবাহনে বসে সফর করবে, প্রতিবেশীর খোঁজও নেবে না।

আবু নছর (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত বিশর ইবনে হারিছের নিকট এসে বলল, আমি হজ করার নিয়ত করেছি। (অর্থাৎ নফল হজ) আপনার নিকট থেকে বিদায় নিতে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হজ করতে তোমার কাছে কি সেই পরিমাণ টাকা আছে? সে জবাব দিল, জ্বি, দু'হাজার দিরহাম আছে। বিশর জিজ্ঞেস করলেন, হজ করার দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী— দেশভ্রমণ, কাবাঘরের আগ্রহ, না আল্লাহর সন্তুষ্টি? লোকটি আরয করল, আল্লাহর সন্তুষ্টি। তিনি বললেন, যদি ঘরে বসে এ দু'হাজার দিরহাম খরচ করে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়ে যাও এবং সন্তুষ্টি প্রাপ্তির জন্য তোমার দৃঢ় বিশ্বাসও জন্মে তাহলে তুমি কী করবে? লোকটি বলল,

তাহলে এভাবেই সন্তুষ্টি হাসিল করব। তিনি বললেন, তাহলে যাও, এই দিরহামগুলো দশ জন মানুষকে দিয়ে দাও— ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দাও, যে তার ঋণ পরিশোধ করবে, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দাও, যে তার অভাব দূর করবে, অধিক সন্তানসন্ততি যার তাকে দাও যে তার সন্তানাদি লালন-পালন করবে, এতিম শিশুদের দেখাশোনাকারীকে দাও, যে তাদেরকে খুশি করবে। মনে চাইলে, এসব প্রকারের এক এক ব্যক্তিকে দাও। আমার এরকম বলার কারণ এই যে, কোনো মুসলমানের মন খুশি করা, মাযলুমের আহবানে সাড়া দেওয়া এবং দুর্বলের সাহায্য করা ফরয হজের পর একশ' হজ অপেক্ষাও উত্তম। কাজেই এখন যাও এবং আমি যা বললাম- তা গিয়ে করো। নতুবা মনের কথা বলে ফেলো। লোকটি বলল, আমার মন চায় আমি ভ্রমণ করি। অগত্যা হযরত বিশর মুচকি হেসে বললেন, টাকাপয়সা যখন সন্দেহমূলক পথে অর্জিত হয়ে যায়, তখন মন চায় কোনো সৎকাজ করতে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কসম করেছেন যে, তিনি মুত্তাকীদের আমল ব্যতীত অন্য কারও অমল কবুল করবেন না।

আরেক প্রকার লোক আছে যারা কৃপণতাসহ টাকাপয়সা জোগাড় করে এবং এমন সৎকর্ম ও ইবাদত করে, যাতে মোটেই অর্থ খরচ করতে হয় না। যেমন দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং রাতে জাগরণ করে কিংবা কুরআন খতম করে, এ সমস্ত লোকও বিভ্রান্ত। যেহেতু মারাত্মক কৃপণতা তাদের অন্তরকে ঘিরে রেখেছে। অর্থ খরচ করে প্রথমে এর মূলোৎপাটন করা উচিত ছিল। এর বদলে তারা যা করে, তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। যেমন কারও পরিধানের কাপড়ে সাপ ঢুকে গেছে। ফলে, সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। কিন্তু এদিকে লক্ষ না করে সে সর্দির ওষুধ তৈরিতে ব্যস্ত। বল, যাকে সাপে দংশন করবে, সর্দির ওষুধ দ্বারা তার কী ফায়দা হবে?

এ কারণেই হযরত বিশরের নিকট কেউ বলেন, অমুক বিত্তশালী নামায রোযা খুব করে। তিনি বললেন, তার অবস্থার সাথে যে কাজের মিল ছিল, তা তো সে ত্যাগ করেছে এবং যে কাজ অন্যের জন্য যোগ্য ছিল, তা অবলম্বন করেছে। তার উচিত ছিল নামায-রোযার পাশাপাশি অভুক্তকে খাবার দেওয়া এবং ফকির-মিসকিনকে দান সদকা করা। নিজে উপবাস থাকার চেয়ে দান-সদকা তার জন্য ভালো ছিল।

আরও কিছু লোক আছে যারা ধনী কিন্তু এতই কৃপণ যে, ধন-সম্পদ থেকে যাকাত ছাড়া অন্য কিছু দান করে না। যাকাত আদায় করতে এমন নিকৃষ্ট মাল দেয়, যা নিজের কাছে রাখতে ঘৃণা করে। তারা যাকাত দিতে গিয়ে এমন ফকির বেছে নেয়, যে তাদের সেবা করে অথবা ভবিষ্যতে যার নিকট থেকে সেবা আশা করে কিংবা যে কোনো বড় লোকের সুপারিশ নিয়ে আসে। তাকে দান করার উদ্দেশ্য থাকে সেই বিশিষ্ট লোকের প্রিয়ভাজন হওয়া। এসব বিষয় নিঃসন্দেহে খারাপ নিয়তের পরিচায়ক। যারা এমন করে, তারা বিভ্রান্ত। কেননা, এমন করেও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর অনুগত বলে দাবি করে; অথচ তারা পাপী, গুনাহগার। আল্লাহর ইবাদত করে অন্যের কাছে বিনিময় খুঁজে।

আরও এক প্রকার লোক আছে, যারা ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত থাকাকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করে। এই শ্রেণিতে ধনী গরীব সবই আছে। ওয়াজের মজলিসে যাওয়াকে তারা একটি প্রথা ও অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। তারা একান্ত বিশ্বাস করে, ওয়াজ শুনলেই সওয়াব পাওয়া যাবে এবং সে অনুযায়ী আমল করার দরকার নেই। এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, ওয়াজ মাহফিলের মাহাত্ম্য এ জন্যেই যে, এর মাধ্যমে সৎকাজের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আগ্রহ ভালো। প্রশংসাযোগ্য। কারণ এতে করে কর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু কর্মের আগ্রহ যদি ধরে রাখা না যায় তাহলে তাতে কোনো কল্যাণ নেই।

অন্যের ভালোর জন্য যে কাজ করা হয় সে কাজের ভালোটাই যদি তাদের কাছে না পৌঁছে তাহলে কাজের উদ্দেশ্যই বৃথা।

কখনো কখনো ওয়াজের মজলিসে বক্তাদের কথা শুনে তাদের মুখ থেকে ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার ফযিলত, কান্নার ফযিলত শুনে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কখনো কখনো তাদের মন মহিলাদের মতো নরম হয়ে যায়। ফলে তারা কান্না ধরে রাখতে পারে না। ভয়ের কোনো কথা শুনে তারা হাতের আড়ালে মুখ লুকিয়ে খোদা! খোদা! বলে ডাকাতে থাকে। এতটুকুইতেই তারা মনে করে, একাই বুঝি সব ভালোকাজ সে করে ফেললো। এটা নিছক ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়।

তদের অবস্থা হলো এমন রুগীর মতো যে চিকিৎসকদের সভায় গিয়ে তাদের আলোচনা শোনে। কিংবা সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো যে সুস্বাধু সব

খাবারের রন্ধনালী শিখেই ফিরে আসে। এসব কাজ না রোগ সারায়। না ক্ষুধার জ্বালা নিবরাণ করে।

এমনই হলো ওয়ায়েজদের মুখ থেকে আমলের কথা শুনে সে অনুযায়ী আমল না করা। এসব ওয়াজ আখেরাতে তাদের কোনো কাজে আসবে না।

ওয়াজ যদি তোমার আমলের মধ্যে পরিবর্তন না করে, তাকে আল্লাহ মুখি ও দুনিয়া বিমুখ না করে তাহলে সে এই ওয়াজ তার কোনো কাজে আসবে না। একে নাজাতের উসিলা মনে করলে সে চরম ভুল করবে এবং প্রবঞ্চিত হবে।

এখন প্রশ্ন হয় যে, উপরে যে সকল বিভ্রান্তি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো থেকে কেউই মুক্ত নয় এবং এ সকল বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষাও অসম্ভব। সুতরাং বিভ্রান্তির এ বর্ণনা থেকে মানুষের মধ্যে এক প্রকার নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়, যার ফলস্বরূপ সে আমল করতে উৎসাহ পায় না এবং হাত গুটিয়ে বসে থাকে। এর জওয়াব এই যে, মানুষ যখন সাহস হারিয়ে ফেলে, তখন সে নিরাশ হয় এবং সম্ভবপর কাজকেও অসম্ভব মনে করতে থাকে। কিন্তু যখন সে সত্যিকার সাহস ও ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়, তখন অভীষ্ট পর্যন্ত পৌঁছার জন্য স্বীয় সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে গোপন পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। উদাহরণত উড়ন্ত পাখিকে ইচ্ছা করলে দূরত্ব সত্ত্বেও নিচে নামিয়ে আনা যায় অথবা গভীর সমুদ্রে অবস্থানকারী মৎস্যকে উপরে তুলে আনতে চাইলে আনা যায় অথবা পাথরে রক্ষিত সোনা ও রূপা আহরণ করতে চাইলে পাহাড় খনন করে আহরণ করা যায় অথবা বনের স্বাধীন ও মুক্ত হাতীকে ধরে পোষ মানাতে চাইলে মানানো যায়, বিষধর সাপ ও অজগরকে ধরে খেলা দেখাতে চাইলে দেখানো যায়। যদি কেউ গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জানতে চায়, তবে জ্যামিতি শাস্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে দাঁড়িয়েই তা জানতে পারে। মোটকথা, মানুষ দুঃসাধ্য কর্মসমূহের উপায় বের করার ব্যাপারে উস্তাদ। সে প্রত্যেক পদ্ধতি ও তার সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এসব উপায় ও পদ্ধতি মানুষ কেবল পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আবিষ্কার করে। কেউ যদি পারলৌকিক জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় এবং তার সামনে একটি মাত্র কাজ থাকে তথা অন্তরকে সোজা করা, তবে এ কাজে সে অক্ষম হবে কেন এবং এটা অসম্ভব হবে কেন? না, মানুষের হিম্মত ও

সাহসের সামনে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণ তো এ কাজে অক্ষম হননি। যারা তাদের উত্তমরূপে অনুসরণ করেছে, তারাও এ কাজে হার মানেনি। এখনও যে ব্যক্তি সত্যিকার ইচ্ছা ও অদম্য আগ্রহের অধিকারী হবে, সে কখনও অপারগ হবে না; বরং পার্থিব উপায়সমূহ আবিষ্কার করার কাজে যে পরিমাণ অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে হয়, তার এক দশমাংশও এতে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।

বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্যে তিনটি বিষয় মানুষের মধ্যে থাকা উচিত— বুদ্ধি, শিক্ষা ও মারেফাত। বুদ্ধি এমন একটি মৌলিক নূর বা আলো যা জন্মগতভাবে প্রাপ্ত যা দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে সক্ষম। মানুষের মূল সৃষ্টিতে বুদ্ধিমত্তাও থাকে এবং বোকামিও থাকে। নির্বোধ ব্যক্তি বিভ্রান্তির মধ্যে ব্যবধান করতে পারে না। তাই মূল সৃষ্টিতেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা থাকা চাই। জন্মগতভাবে এরকম না হলে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে মূল বুদ্ধিমত্তা বর্তমান থাকলে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দ্বারা তাকে শাণিত করা যায়। এ থেকে বোঝা গেল, বুদ্ধিমত্তা সৌভাগ্যের সোপান। তাই হাদিসে বলা হয়েছে–

تَبَارَكَ الَّذِىْ قَسَّمَ الْعَقْلَ بَيْنَ عِبَادِهٖ اَشْتَاتًا اِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَسْتَوِىْ عَمَلُهُمَا وَبِرُّهُمَا وَصَوْمُهُمَا وَصَلٰوتُهُمَا وَلٰكِنَّهُمَا يَتَفَاوَتَانِ فِى الْعَقْلِ كَالذَّرَّةِ فِىْ جَنْبِ اَحدٍ مَاقَسَّمَ اللّٰهُ بِخَلْقِهٖ حظًّا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَالْيَقِيْنِ.

অর্থাৎ, মহামহিম সেই আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিমত্তা বণ্টন করেছেন। নিশ্চয় দু'ব্যক্তির আমল তথা নামায, রোযা ইত্যাদি বরাবর হয়। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা একটি বিন্দুতেও উহুদ পর্বতসম পার্থক্য থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে বুদ্ধিমত্তার চেয়ে উত্তম বস্তু প্রদান করেননি। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ৩৬১)

হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করল— যদি কেউ দিনে রোযা রাখে, রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, হজ ও ওমরা করে এবং দান-খয়রাত, জিহাদ ইত্যাদি কল্যাণমূলক কর্ম যথারীতি পালন করে, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট তার কী মর্যাদা হবে? তিনি উত্তর দিলেন, সে বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী নেকি পাবে।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এক লোকের প্রশংসা করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার বুদ্ধিমত্তা কেমন? লোকেরা বলল, আমরা ইবাদত, চরিত্র ও গুণ-গরিমার কথা বলছি। তিনি বললেন, আগে বল তার বুদ্ধিমত্তা কেমন? কেননা, নির্বোধ লোক তো বোকামির কারণে ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক ভুল করে বসে। কিয়ামতের দিন মানুষ বুদ্ধি পরিমাণেই আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হবে। আবুদ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যখন কোনো ব্যক্তির খুব বেশি ইবাদতগুজার হওয়ার সংবাদ আসতো তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তার বুদ্ধি কেমন? ভালো বলা হলে তিনি বলতেন, এর বিষয়ে তোমরা আশা রাখতে পারো। অন্য কোনো উত্তর দেওয়া হলে তিনি বলতেন, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

অন্য একদিন আরেক ব্যক্তির খুব বেশি ইবাদতগুজার হওয়ার বিষয়টি তার সামনে আলোচনা করা হলো। তিনি এবারও জানতে চাইলেন তার বুদ্ধিমত্তা কেমন? সাহাবিগণ উত্তর দিলেন, সে একেবারেই মেধা শূন্য।

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা যা ধারণা করছো লোকটা সেখানে পৌঁছতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। মেধা ও সুস্থ বুদ্ধি হলো মানুষের স্বভাবের ভেতরে আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এই নিয়ামত যদি তোমার বোকামি ও অজ্ঞতার কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কোনোদিন আর তা ফিরে পাবে না।

গোমরাহি থেকে আত্মরক্ষার দ্বিতীয় বিষয় মারেফাত তথা আল্লাহর পরিচয় লাভ। মারেফাত চারটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার নাম। প্রথমত, নিজের ব্যাপারে জানতে হবে যে, এই জগতে সে একজন পরিচয়হীন মুসাফির এবং আল্লাহর মারেফাত ও দীদারই তার জন্যে যথোপযুক্ত। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ সম্পর্কে মৌলিক ইলম থাকতে হবে। তৃতীয়ত, দুনিয়া সম্পর্কে জানতে হবে। চতুর্থত, পরকাল সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সে নিজেকে চিনবে দাসত্ব ও বিনায়াবনত হওয়ার মাধ্যমে। সে নিজেকে এই পৃথিবীতে ভিনদেশি এক লোক মনে করবে। চারদিকে প্রবৃত্তির ভয়াল থাবার সাথে তার যেনো কোনো পরিচয়ই নেই। পৃথিবীতে সে শুধু আল্লাহকে চিনবে এবং তার সাথে সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় সে থাকবে। এটা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব, যে আল্লাহকে চেনার সাথে সাথে নিজেকে ও যে চিনতে পেরেছে।

এই আলোচনার সাথে সাথে কিতাবুল মাহাব্বাহ, কিতাবু শারহি আজাইবলি কলব, কিতাবুত তাফাককুর ও কিতাবুশ শুকরে যে আলোচনা করেছি তা মিলিয়ে পড়তে হবে। কারণ, এতে ইঙ্গিতসমূহ রয়েছে নফসের গুণাগুণ ও মহান আল্লাহর প্রতাপের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। এতে করে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে। সম্পূর্ণ মারেফাত বা পরিচয় জানা এর পরে। কারণ এটি ইলমুল মুকাশাফার অন্তর্ভুক্ত আর আমরা এ পর্বে কেবল ইলমুল মুআমালা বিষয়েই আলোকপাত করতে চেয়েছি।

দুনিয়া ও আখেরাতের পরিচয় লাভের জন্য দুনিয়ার নিন্দা পর্বে ও মৃত্যুর আলোচনা পর্বে পড়তে হবে। যাতে তার সামনে একথা স্পষ্ট হয়, দুনিয়ার সঙ্গে আখেরাতের কোনো সম্পর্ক নেই।

যখন সে আত্মপরিচয় ও প্রভুর পরিচয় অর্জন করবে এবং দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে অবগত হবে, তার অন্তরে আল্লাহর মারেফাতের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা জেগে উঠবে, আখেরাতের পরিচয় জানার মাধ্যমে তার প্রতি কঠিন ভালোবাসা তৈরি হবে। দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞাত হলে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হবে। ওই অবস্থায় তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, কীভাবে সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছবে, কী করলে সে আখেরাতে উপকৃত হবে।

তার অন্তরে যখন এ ইচ্ছা প্রবল হয়, সব কাজেই তার নিয়ত পরিশুদ্ধ হবে। আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে বান্দার অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। পরকালের জ্ঞান অর্জিত হলে এর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। দুনিয়া সম্পর্কে জানা হলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও বিমুখতা সৃষ্টি হবে এবং তার নিকট সর্বাধিক জরুরি কাজ তাই হবে, যা পরকালে উপকারী। পরকালের কাজ করার ইচ্ছা যখন প্রবল হবে, তখন সকল বিষয়ে তার নিয়ত সঠিক হবে। ফলে, বিভ্রান্তি দূর হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি সে আহার করে অথবা কোনো প্রয়োজন পূরণে আত্মনিয়োগ করে, সে ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও নিয়ত থাকে আখেরাতের পথে বিচরণের জন্য সাহায্য গ্রহণ, তার নিয়ত পরিশুদ্ধ হয়ে যায় আর তা থেকে সর্ব প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা দূর হয়ে যায়। সে আত্মপ্রবঞ্চনা মূল উৎপত্তি বিবিধ প্রকার উদ্দেশ্য হাসিলের প্রতি আগ্রহ ও দুনিয়া ও সহায়-সম্পত্তির মোহ। কারণ, এ আত্মপ্রবঞ্চনাই নিয়ত বিনষ্টকারী অবস্থায়

দুনিয়া তার কাছে আখেরাতের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে প্রবৃত্তির চাওয়া অধিক প্রিয় হয়ে পড়ে।

আল্লাহর মারেফত ও নিজের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ফলস্বরূপ যখন আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রবল হবে, তখন তৃতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন হবে; অর্থাৎ আল্লাহর পথ কীভাবে অতিক্রম করা উচিত, কোন কোন কাজ আল্লাহর নিকটবর্তী করে, কোন কোন কাজ আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এছাড়া পথের বিপদাপদ ও বিনাশকারী বাধাসমূহ জানা। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা এসব বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যেমন প্রথম খণ্ডে ইবাদতের শর্ত ও বাধাবিপত্তি লিপিবদ্ধ করেছি। এসব শর্তের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে এবং বাধাবিপত্তিগুলো অতিক্রম করতে হবে। মূল কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে পারস্পরিক আদান-প্রদানের রহস্য এবং যেসব আদান-প্রদান অপরিহার্য, সেগুলো বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শরিয়তের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী আমল করতে হবে। আলোচ্য খণ্ডে আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ বিধৃত হয়েছে অর্থাৎ, নিন্দনীয় স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং নিন্দনীয় স্বভাবগুলো জানতে হবে এবং প্রতিকারের পন্থাও আয়ত্ত করতে হবে। এসব বিষয় জেনে নিলে বর্ণিত সকল প্রকার বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হবে।

রুবয়ে মুনজিয়াতের আলোচনাগুলো থেকে প্রশংসিত গুণাবলি সম্পর্কে জানা যায় যেগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এ বিষয়টিও জানা যাবে যে, নিন্দনীয় গুনাসমূহ পরিহার করে সেগুলোর স্থলে প্রশংসিত গুণ ধারণ করতে হবে।

এ বিষয়গুলো সম্পূর্ণ অর্জিত হলে তার পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনার বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে।

এসব কিছুর মূল হচ্ছে, অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা প্রবল হওয়া এবং অন্তর থেকে দুনিয়াপ্রীতি দূর হওয়া। এমনকি এর মাধ্যমে ইচ্ছা দৃঢ় এবং নিয়ত পরিশুদ্ধ হয়। আমরা যে মারেফতের কথা উল্লেখ করেছি তা ছাড়া এটি অর্জন করা হয় না।

যদি প্রশ্ন করেন, কোনো ব্যক্তি এসবগুলো কাজ করলে তার ব্যাপারে কীসের ভয় থাকতে পারে? আমি বলব; তার ব্যাপারে এ ভয় আছে যে,

শয়তান তাকে ধোঁকায় ফেলবে, তাকে মানুষকে উপদেশ প্রদান ও ইলমের প্রসারে মগ্ন হওয়ার প্রতি আহ্বান করবে এবং আল্লাহর দীন সম্পর্কে সে যে মারেফাত হাসিল করেছে, মানুষকে তার প্রতি আহ্বানে উদ্ধুদ্ধ করবে। কারণ, মুখলিস মুরীদ যখন আত্ম ও চরিত্র সংশোধন সম্পন্ন করে, কলবকে পর্যবেক্ষন করে, সকল আবর্জনা থেকে পরিচ্ছন্ন করে, সীরাতে মুস্তাকিমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তার চোখে দুনিয়া হীন হওয়ার কারণে সে তা বর্জন করে, সৃষ্টি থেকে তার লোভ সরে যাওয়ার ফলে তার প্রতি সে ভ্রুক্ষেপ করে না, তার অন্তরে কেবল একটি চিন্তাই বিদ্যমান থাকে।

আর তা হলো আল্লাহ তাআলা, তার জিকির ও মুনাজাত, তার সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ এবং শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে অক্ষম হওয়া।

এ অবস্থায় শয়তান তাকে দুনিয়া ও প্রবৃত্তিগত বিষয়াবলি দিয়ে পথভ্রষ্ট করতে চাইলে সে তার আনুগত্য করে না। তাই তাকে গোমরা করার জন্য দীনের দিক থেকে আসে, তাকে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়ার আহ্বান করে, তাদের দীনের প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ তাদের উপদেশ প্রদান ও আল্লাহর দিকে ডাকতে আহ্বান করে।

ফলে বান্দা দয়ার চোখে অন্য বান্দাদের দিকে দেখে। তার চোখে লোকজনকে নিজেদের কাজ সম্পর্কে অস্থির ও দীনের ব্যাপারে বধির ও অন্ধ মনে হয়। তারা রোগাক্রান্ত কিন্তু রোগ অনুধাবনে অক্ষম। রোগ নিরাময়ের জন্য কোনো ডাক্তার তারা খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে তার মনে তাদের প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। তার কাছে এ হাকিকী মারেফাত আছে যে, কীভাবে সে তাদের পথ প্রদর্শন করবে, তাদের পথ ভ্রষ্টতা স্পষ্ট করবে, সৌভাগ্যের দিকে তাদের পথ প্রদর্শন করবে। কোনো কষ্ট স্বীকার, ব্যায়, বেতন ধার্য করা ছাড়াই সে এসব করতে সক্ষম।

তার উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যে বড় কোনো রোগে আক্রান্ত। যার ব্যথা সে সহ্য করতে পারবে না। এ অসুস্থতার জন্য তার রাতে ঘুম হতো না। দিনে যন্ত্রনায় অস্থির থাকতো। ব্যথার আতিশয্যে তার পক্ষে পানাহার, হাঁটা-চলাফেরা সম্ভব হতো না। এক পর্যায়ে সে কোনো মূল্য ও কষ্ট ছাড়াই চমৎকার ও সুস্থকর একটি পথ্য পেয়ে গেলা। এই পথ্য বা ওষুধ খেতেও তিতা নয়। এ পথ্য ব্যবহার করে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো।

অনেকগুলো রাত নির্ঘুম কাটানোর পর তার রাতের ঘুম সুখকর হলো। দিনের বেলায়ও সে একজন সুস্থ মানুষ। একটি কষ্টকর জীবণের পর এখন সে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন কাটাচ্ছে। দীর্ঘ অসুস্থতার পর এখন সে সুস্থতার স্বাদ পাচ্ছে।

অতঃপর সে দেখলো, আরো অনেক মুসলিম এ রোগে আক্রান্ত। তারাও রাতে ঘুমাতে পারছে না। তাদের অস্থিরতা কঠিন হচ্ছে। অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে তারা আল্লাহর কাছে দুআ করছে। এ দেখে তার মনে হলো, তার কাছে এ রোগের পথ্য আছে। সে খুব সহজেই দ্রুত সময়ে তাদের সুস্থ করতে সক্ষম। তার দয়া ও অনুগ্রহ হলো। সে কোনোভাবেই তাদের চিকিৎসায় বিলম্ব করতে প্রস্তুত নয়। এমনিভাবেই একজন মুখলিস বান্দা নিজে হেদায়েত লাভের পর এবং সর্বপ্রকার মৌন রোগ থেকে সুস্থ হওয়ার পর তার কাছে মনে হয়, সমস্ত মানুষের অন্তর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তারা কোনো প্রতিকার পাচ্ছেনা, তারা ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যের নিকটবর্তি এবং তার পক্ষে তাদের সুস্থ করে তোলা সম্ভব। ফলে তার অন্তরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জন্মালো যে, যে তাদের উপদেশ প্রদানে নিমগ্ন হবে। শয়তান তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে সে ফিতনার একটি সুযোগ পেয়ে যায়।

অতঃপর সে যখন এ কাজে নিমগ্ন হয়, শয়তান ফিতনার সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে তাকে খুব গোপনে নেতৃত্বের দিকে ডাকতে শুরু করে, এতটা গোপনে যে, তা পিঁপড়ার হাটার শব্দ থেকেও কম শব্দ হয়, ওই ব্যক্তির পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। শয়তানের মন্ত্রণা তার অন্তরে স্থান পেয়ে যায় এবং তাকে ধীরে মানুষের সামনে শব্দ, সুর, চালচলন কথাবার্তা ও পোশাক-আশাকে সাজসজ্জা অবলম্বনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

অতঃপর মানুষ তাকে রাজা-বাদশাহর চেয়েও বেশি সম্মান করতে শুরু করে। কারণ, তাদের চোখে তিনি এমন ব্যক্তি, যিনি কোনো বিনিময় ব্যতীত কেবল অনুগ্রহপূর্বক তাদের রোগসমূহ থেকে সুস্থকারী। ফলে তাদের কাছে সে তাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন থেকে প্রিয়। তাই তারা তাকে নিজেদের শরীর ও সম্পদে প্রাধান্য দেয়, তারা চাকর বাকরের মতো হয়ে যায়। তারা খিদমত করে, তাকে মাহফিলসমূহে এগিয়ে দেয়। তাকে রাজা-বাদশাহ থেকেও বড় শাসক বানিয়ে দেয়।

এতে তার মেজায বিকৃত হয়, মন প্রফুল্ল হয় এবং কম অক্ষম এক স্বাদ পেয়ে বসে। দুনিয়ার এমন এক কাম্য বস্তু পেয়ে বসে, যার সামনে দুনিয়ার অন্যসব কামনা-বাসনা তুচ্ছ। ফলে সে দুনিয়া বর্জন করে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ভোগে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ সময় শয়তান একটি সুযোগ পেয়ে বসে এবং তার অন্তরে হাত প্রসারিত করে।

মেজায বিকৃত হওয়া এবং শয়তানের দিকে তার অন্তর ঝুঁকে যাওয়ার আলামত হলো, সে কোনো ভুল করার পর লোকজনের সামনে তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া হলে সে ক্রোধান্বিত হয়। যদি তার মন ক্রোধ গ্রহণ না করে শয়তান তার অন্তরে এই কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয় যে এ ক্রোধ আল্লাহর জন্য। কারণ, এরকম না করলে তার সম্পর্কে মুরীদের বিশ্বাস পাল্টে যাবে এবং তারা আল্লাহর পথ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে সে আত্মপ্রবঞ্চনা ও অহমিকায় পড়ে যায়। কখনো এমন হয়, যে তার ভুল ধরে সে তাকে আক্রমণ করতে উদ্ধত হয়। এ করতে গিয়ে হালাল বর্জনের পর নিষিদ্ধ গীবতে লিপ্ত হয় এবং অহংকারে পতিত হয়। যা স্পষ্ট সত্য থেকে সরে যাওয়া এবং সত্য পাওয়ার ওপর শোকর আদায় না করা। অথচ সে এ জাতীয় বিপদের পথগুলো থেকে বেঁচে থাকতো।

এমনিভাবে যদি লোকসম্মুখে তার হাসি চলে আসে অথবা কোনো আমল বা অজীফা ছুটে যায় তাহলে সে এ ভেবে খুব উৎকণ্ঠিত হয় যে মুরীদরা তা জেনে যাবে এবং তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে। এটি ঠিক রাখার জন্য সে উক্ত কাজে আসতাগফিরুল্লাহ বলতে থাকে এবং বড় বড় নিশ্বাস ছাড়ে। কখনো মুরীদদের কারণে আমল বাড়িয়ে দেয়। শয়তান তার অন্তরে এ মন্ত্রণা ঢালে, তুমি এ কাজ করবে এমন ভাবে যে, যাতে মানুষ আল্লাহর পথ থেকে সরে না যায় এবং তা বর্জনের কারণে মানুষ আল্লাহর পথ বর্জন না করে।

তার একাজ ধোঁকা, প্রবঞ্চনা ও অহমিকা ছাড়া কিছু নয়। বরং এটা নেতৃত্ব হারানোর ভয় থেকে উদ্ভুত এক প্রকার উৎকণ্ঠা।

বরং অন্যদের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটলে সে খুশি হয়। যদি এমন কারও ক্ষেত্রে ঘটে মানুষের কাছে যার গ্রহণযোগ্যতা বেশি এবং তার কথায় চেয়ে ওই ব্যক্তির কথা বেশি গ্রহণীয় হয়, তার জন্য একটি কষ্টের কারণ হয়ে

দাঁড়ায়। যদি তার প্রবৃত্তি খুশি না হতো, এবং নেতৃত্বের স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী না হতো, সে এটিকে গনিমত মনে করতো।

এর উদাহরণ হচ্ছে, এক ব্যক্তি তার একদল ভাইকে দেখলো, তারা কূপে পতিত হয়েছে আর কূপের বড় পাথরে ঢেকে গেছে। পাথরের কারণে তারা কূপ থেকে উঠতে পারছিলো না। এ সময় ওই ব্যক্তির মনে তার ভাইদের জন্য দয়ার উদ্রেক হলো। তাই সে পাথরটি সরাতে এলো। কিন্তু পাথর সরানো তার জন্য কঠিন হলো। এ সময় তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ একজন এগিয়ে এলো। অথবা সে নিজেই তা সরিয়ে দিতে সক্ষম হলো। নিশ্চয় এতে সে মহা আনন্দিত হবে। কারণ, তার উদ্দেশ্য কূপে পড়া ভাইদের বাঁচানো।

সুতরাং কল্যাণকামীর উদ্দেশ্য যদি মুসলমান ভাইদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হয় তাহলে এমন কোনো ব্যক্তির প্রকাশ ঘটলে যে তাকে সাহায্য করবে অথবা সে ওই কাজ করতে সক্ষম তাহলে তার পক্ষে তা ভারি মনে না হওয়া উচিত। ধরুন, যদি তারা যদি সকলেই নিজে থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হতো, তবে তার জন্য কি তা কষ্টকর হওয়া উচিত হতো, যদি তার মূল উদ্দেশ্য হেদায়াতই হয়? তাহলে তারা অন্য একজনের মাধ্যমে হেদায়াত পেলে তা তার জন্য কষ্টকর হবে কেন? তার অন্তরে এমন কিছু যখনই আসবে, শয়তান তাকে অন্তরের কবিরা গুনাহসমূহ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অশ্লীল কাজসমূহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে ধ্বংস করে। আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় চাচ্ছি, হেদায়াত লাভের পর পুনরায় যেন অন্তর বক্র হয়ে না যায় এবং প্রবৃত্তির সোজা হওয়ার পর যেন বেঁকে না যায়।

যদি বলেন, তবে তার জন্য কখন মানুষকে উপদেশ প্রদানে মগ্ন হওয়া বৈধ?

আমি বলবো, যখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে, শুধুই লোকদের আল্লাহর পথে হেদায়াত করা। তারা পছন্দ করবে, এ কাজে যেন কেউ তার সহযোগী থাকে অথবা লোকজন নিজে থেকে হেদায়াত পেয়ে যাবে। সে সম্পূর্ণরূপে তাদের প্রশংসা ও সম্পদের লোভ থেকে মুক্ত থাকবে। তার কাছে লোকজনের প্রশংসা ও নিন্দা সমান মনে হবে। যদি আল্লাহর কাছে প্রশংসাযোগ্য হয়, মানুষের নিন্দাকে ভয় করবে না। আল্লাহর হামদের তথা প্রশংসার সঙ্গে না মিলিয়ে প্রশংসা করলে তাতে খুশি হবে না। তাদের

দিকে এমনভাবে তাকাবে যেমন তাকায় নেতৃস্থানীয় লোকজন ও প্রাণিদের দিকে। নেতাদের দিকে তাকানোর মতো তাকাবে এ জন্য যে, এতে সে তাদের ওপর অহংকার করবে না। সকলকে তার চেয়ে উত্তম মনে হবে। কারণ, সে অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়।

প্রাণিদের দিকে যেমন তাকায় তেমন তাকাবে এজন্য যে, এতে করে তার মনে তাদের অন্তরে স্থান পাওয়ার যে লিপ্সা আছে তা থাকবে না। কারণ সে এ ভ্রুক্ষেপ করে না যে লোকজন তার দিকে কীভাবে তাকাচ্ছে। প্রাণিদের জন্য সে সাজসজ্জা অবলম্বন অথবা কৃত্রিমতা অবলম্বন করবে না। বরং ছাগলের রাখালের উদ্দেশ্য থাকে শুধু ছাগল চরানো এবং বাঘ থেকে ছাগলকে রক্ষা করা। ছাগল তাকে কীভাবে দেখছে তার প্রতি তার ভ্রুক্ষেপ থাকে না। এমন প্রশ্ন হলো, যদি সে লোকজনের দিকে প্রাণীর মতো না দেখে তাদের তাকানোর দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না বা পরওয়া করবে না তাহলে কি মানুষের সংশোধনে মগ্ন হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে না।

উত্তর হলো, হ্যাঁ, কখনো কখনো সে তাদের সংশোধনে সক্ষম হবে। তবে তাদের সংশোধন করতে গিয়ে নিজে ফাসাদের স্বীকার হবে। ফলে সে তখন ওই মোমবাতির মতো যা নিজেকে আগুনে জ্বেলে অন্যদের আলো দেয়।

এখন আপনি যদি বলেন, ওয়ায়েজ যদি ওয়াজ করা ছেড়ে দেয়, কেবল এ নিয়ত হলে ওয়াজ করে তবে তো দুনিয়াতে কোনো ওয়াজই বাকী থাকবে না এবং মানুষের অন্তরসমূহ খারাপ হয়ে যাবে।

আমি বলব, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দুনিয়ার ভালোবাসা সব গুনাহের মূল।

যদি মানুষ দুনিয়াকে ভালো না বাসে তাহলে তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, জীবনযাত্রা থেমে যাবে, অন্তর ও শরীর সবই হালাক হয়ে যাবে। তবে রাসূলুল্লাহ (স) জানতেন, দুনিয়ার ভালোবাসা ধ্বংসকারী। তাকে ধ্বংসকারী বললে অধিকাংশের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর হয়ে যাবে না।

খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষের অন্তর থেকেও চলে যাবে না যারা দুনিয়া বর্জন করলে দুনিয়া বিরান হয়ে যাবে না। তাই রাসূলুল্লাহ (স) এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান বর্জন করেননি বরং দুনিয়ার ভালোবাসার ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করেছেন। দুনিয়া বর্জন করা হবে এ ভয়ে তার ভয়াবহতার আলোচনা

ছেড়ে যাননি। তিনি জানতেন, মহান আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে যে সকল কামনা-বাসনা দিয়েছেন সেগুলো মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। যেমনটি মহান আল্লাহ কুরআনে কারীম বলেছেন,

وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়াত দিতে পারতাম। কিন্তু আমার এ কথা স্থিরীকৃত যে, আমি নিশ্চয় জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সাজদা : ১৩)

এমনিভাবে যারা ওয়াজ-নসিহত করে, তারা সর্বদা নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য আগ্রহী থাকে। যারা বলেন, নেতৃত্বের ভালোবাসায় ওয়াজ করা হারাম। তাদের কথার কারণে তারা ওয়াজ ছেড়ে দেয় না। যেমনিভাবে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এ গুনাহগুলো মদপান, জিনা, চুরি, সুদ, জুলুম ইত্যাদিকে হারাম বললেও মানুষ এগুলো বর্জন করে না।

সুতরাং তুমি নিজের কথা ভাবো। মানুষ কী বলেছে তা থেকে মন খালি করো। কারণ, মহান আল্লাহ একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে ধ্বংস করার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে সংশোধন করেন।

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ.

আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দল দিয়ে অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন, পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেতো। (সূরা বাকারা : ২৫২)

وَإِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ.

মহান আল্লাহ এ দীন ও ইসলামকে এমন কতিপয় মানুষ দ্বারা শক্তিশালী করবেন, (পরকালে) যাদের কোনো অংশ নেই।

আপনি যদি বলেন, শয়তানের এ ধোঁকা সম্পর্কে জেনে মুরীদ যদি কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ওয়াজ-নসিহত না করে, অথবা সত্য ও ইখলাসের সঙ্গে নসিহত করে তবে তো তার বিষয়ে কোনো আশঙ্কা নেই? তার সামনে আর কী কী বিপদ ও প্রতারণার বাকি আছে?

জেনো রাখো, তার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ রয়ে গেছে। তা হলো, শয়তান তাকে বলে, তুমিতো আমাকে অক্ষম করে দিয়েছো। তোমার

মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে আমার থেকে মুক্তি পেয়েছ। আমি বড় বড় অলি ও বুজুর্গদের ওপর সক্ষম হয়েছি। কিন্তু তোমার ওপর সক্ষম হইনি। তুমি কতইনা ধৈর্যশীল। আল্লাহর কাছে তোমার মর্যাদা ও অবস্থান কতইনা উঁচু। কারণ, তিনি তোমাকে আমার ক্রোধের চেয়েও বেশি শক্তি দিয়েছেন। আমার প্রবঞ্চনা প্রবেশের যতগুলো পথ আছে, সবগুলো সম্পর্কে তোমাকে জানার সুযোগ দিয়েছেন।

শয়তানের এ প্রবঞ্চনা তারা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং তাকে সত্যায়ন করে। অতঃপর অহমিকা ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে সর্বাত্মকভাবে পলায়নের কারণে মনে মনে খুশি হয়। তার এই আত্মতুষ্টিই হয়ে ওঠে চূড়ান্ত অহমিকা ও প্রবঞ্চনা।

আর অহমিকাই বড় ধ্বংসকারী। আত্মতুষ্টি সব গুনাহ থেকে মারাত্মক। শয়তান বলে, হে আদম সন্তান, যখন তুমি ধারণা করো, তোমার ইলম ও জ্ঞান দিয়ে তুমি আমার থেকে মুক্তি পেয়ে গেছো। তবে তুমি তোমার অজ্ঞতা দিয়ে আমার ফাঁদে পড়েছো। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৯ : ৩১৭)

আপনি যদি বলেন, সে তো আত্মতুষ্টিতে ভুগতেই পারে। কারণ, সে বুঝেছে, পার্থিব কামনা বাসনার এ শক্তি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে, তার নিজের শক্তিতে হয়নি। তার মতো কেউ একজন কেবল আল্লাহর তাওফিক ও সাহায্যেই শয়তান প্রতিরোধে শক্তি অর্জন করতে পারে। আর যে ব্যক্তি কমপক্ষে তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা বুজতে পারে, সে যখন এ মহান বিষয় বুঝতে সক্ষম, সে এ-ও জানে যে, সে তার নফসের ওপর ক্ষমতাবান নয়। বরং আল্লাহর সাহায্যেই এমনটি করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং আত্মতুষ্টি না থাকলে তার ব্যাপারে কীসের আশঙ্কা করা যায়?

আমি বলবো, তার ব্যাপারে এ ভয় করা যায় যে, সে অনুগ্রহ পাওয়ার অহমিকায় পড়বে। সে এ পর্যন্ত মনে করে বসতে পারে, ভবিষ্যতে সে এ অবস্থা থেকে সরে যাবে না। অবস্থার পরিবর্তনকে সে ভয় করবে না। তার অবস্থা হবে, সে মনে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে। আল্লাহর পরীক্ষায় পড়ে যাওয়ার ভয় সে পাবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পরীক্ষা থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত।

বরং তার পথ হচ্ছে, সর্বাবস্থায় সে মনে করবে, সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর নিজের ব্যাপারে এ ভয় করবে যে, অন্তরের কোনো একটি গুণ হয়তো তার মধ্যে নেই।

হতে পারে, তার অন্তরে এখনো দুনিয়ার মোহ, রিয়ার আগে অন্য কোনো অসচ্চরিত্র রয়ে গেছে, যে সম্পর্কে সে অবগত নয়। এমন ভয় মনে থাকতে হবে যে, তার অবস্থা এক পলকের মধ্যেই হারিয়ে যেতে পারে। সে আল্লাহর পরীক্ষা থেকে নিরাপদ নয়। অন্তিম পরিণতির বিপদ থেকে সে উদাসীন নয়।

এ এমন এক শঙ্কা যা থেকে নিষ্কৃতি নেই, এমন ভয় যা থেকে মুক্তি নেই। কেবল আখেরাতের পথ সহজে ভালোভাবে পাড়ি দিলে তবেই নিজেকে সব কিছু থেকে মুক্ত মনে করা যাবে।

এজন্যই কোনো এক বুজুর্গের কাছে তাঁর মৃত্যুর সময় এক নিশ্বাস বাকি থাকতে শয়তান উপস্থিত হয়ে বললো, হে অমুক, আপনি তো আমার থেকে মুক্তি পেয়ে গেছেন। বুজুর্গ বললেন, এখনো পাইনি। আরও সময় আছে।

এজন্যই বলা হয়,

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَلْكَى إِلَّا الْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَلْكَى إِلَّا الْعَامِلُونَ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَلْكَى إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ.

সকল মানুষ ধ্বংসশীল কেবল আলেমগণ ব্যতীত। সকল আলেম ধ্বংসশীল, কেবল আমলকারীগণ ব্যতীত। সকল আমলকারী ধ্বংসশীল, কেবল মুখলিসরা ব্যতীত। আর মুখলিসগণ মহা শঙ্কায় পতিত।

[দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত]

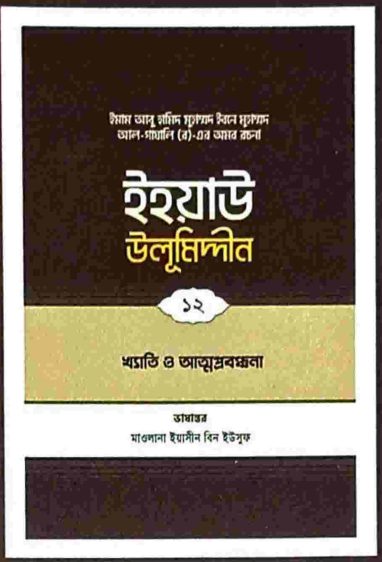

ISBN : 978-984-558-027-4

দারুত তাকবীর
কর্পোরেট অফিস : ৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা) ভি আই পি রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ০৯৬১০৬৬৬০০৬, ০১৯৯১-১৮১২০৪
বিক্রয় : বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৯৩৮-৮৫৫৯৯২, ০১৯৩৮-৮৫৫৯৭৯, ০১৯৩৯-৯১৯৩২১
ই- মেইল : info@daruttakbeer.com

1011401295014020 6-7735

পরিবেশক : বাংলাপ্রকাশ
৩৮/২-খ, তাজমহল মার্কেট (নিচ তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
অনলাইনে পরিবেশক : BOIBAZAR.com
Hotline No. 09611262020
লেকচার BOOKS
রকমারি.com